,রন পরিচ্ছদে বিভূষিতা, পরম রূপশালিনী জুলেখার কমনীয় সৌন্দর্য্যে সেই কক্ষ

উৎসর্গ-পত্র।

যিনি এখন পুণ্যালোক-বিভাসিত সমুজ্জ্বল
পিতৃলোকে, এ মর্ত্ত্য-ভূমি হইতে
অতিদূরে বাস করিতেছেন,
যিনি মর্ত্ত্যে আমার প্রত্যক্ষ দেবতা ছিলেন,
যাঁহার অপরিমেয় স্নেহরাশির
কণামাত্রেরও পরিশোধ, এ ক্ষুদ্রজীবনে
অসম্ভব, আমার সেই মর্ত্ত্যের
আরাধ্য-দেবতা
পিতৃদেবের স্মরণার্থে,
এই গ্রন্থ তাঁহার পবিত্র নামে উৎসর্গ
করিলাম।

"ঐ গুর্জ্জরের তটভূমি ?"—১ পৃঃ

The Emerald Ptg. Works.
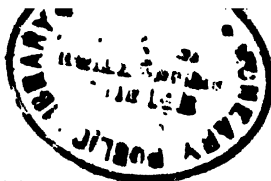
রূপের মূল্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"রোস্তম!"

"জনাব?"

"এই সেই স্থান?"

"এই সেই স্থান!"

"সুলতান আমাদের এখানেই নামিতে আদেশ করিয়াছেন? কেমন?"

"জনাবালি যাহা অনুমান করিতেছেন, তাহাই ঠিক।"

"সমুদ্রের তরঙ্গ ক্রমশঃ ভীষণ হইতেছে—নৌকা যে আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না।"

"আর একরশি গেলেই আমরা যথাস্থানে পৌঁছিব। সম্মুখে ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ ছায়ার মত একটা অংশ দেখিতেছেন, উহাই গুর্জ্জরের তটভূমি।"

"ঐ গুর্জ্জরের তটভূমি?"

"হাঁ জনাব—"

"সমুদ্র-মেখলা গিরিকিরীটিনী গুর্জ্জরভূমির ?"

"হুজুরালি যা ভাবিতেছেন, তাই ঠিক।"

"যে দেশের ধ্বংসসাধন সংকল্প করিয়া, আমরা ছদ্মবেশে এ বন্দরে আসিয়াছি, এই সেই সোনার দেশ ?"

"হাঁ জনাবালি—এই সেই সোনার দেশ।"

"কি সুন্দর পাহাড় এ দেশের! কেমন গর্ব্বিতভাবে তাহারা গগন-নীলিমা স্পর্শ করিতে উদ্যত! তৃণশষ্প-গুল্মাবৃত জঙ্গলরাশির মধ্যেও কেমন একটা বিচিত্র সৌন্দর্য্য! কি সুন্দর চন্দ্ররশ্মি এ দেশের! চন্দ্রের জ্যোতিঃ কত উজ্জ্বল, কত স্নিগ্ধ! কি সঞ্জীবনীশক্তিময় মলয়প্রবাহ এ দেশের! এ দেশ দেখিয়া, চিরতুষারময় আফ্‌গানিস্থান যেন জাহান্নম্ বলিয়া বোধ হইতেছে।"

নৌকা ধীরে ধীরে বন্দরের ঘাটে আসিয়া লাগিল। নৌকার মাঝিরা হিন্দু। কিন্তু আরোহিগণ হিন্দুবেশী মুসলমান। আরোহিগণ বলিলাম, কেননা, দুই জনের বিবরণ পাঠক এখনই পাইলেন। আরও কয়েক জন সেই নৌকার মধ্যেই ছিল। যাঁহারা মৃদুস্বরে কথোপকথনে ব্যস্ত, তাঁহারা বাহিরে বসিয়া মুক্ত বায়ু সেবন করিতেছিলেন।

ইঁহাদের মুসলমানের মত বেশভূষা ছিল না। পোষাক-পরিচ্ছদ কাশ্মিরী হিন্দুদের মত। গায়ে জাফ্‌রাণরঙ্গের ঢিলা চাপকান। সুন্দর বাবরিকাটা চুল। মাথায় সাঁচ্চার সরু কাজ করা পাগড়ি। হেনারাগসিক্ত গুম্ফ ও শ্মশ্রুরাজি। আর বক্ষাস্তরণে লুকায়িত, ক্ষুদ্র ক্ষুরধার তরবারি ও ইস্পাহানী ছোরা।

নৌকাচালকেরা গুর্জ্জরের মাঝি। তাহারা নীচশ্রেণীর দরিদ্র হিন্দু। তাহাদের আরোহিগণ মুসলমান এ কথা জানিতে পারিলে, কখনই তাহারা সওয়ারি পার করিয়া দিত না।

জাতিভেদগত কোন বিদ্বেষের জন্য যে তাহারা এরূপ করিত, তাহা নহে। সমুদ্রমেখল গুর্জ্জরের শান্তিময় বক্ষে যাহাতে কোন মুসলমানই প্রবেশ না করিতে পারে, সেই জন্য গুর্জ্জরের অধিপতি এ সম্বন্ধে একটা কঠোর রাজাদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

গুর্জ্জরপতির আদেশ ছিল, "যে কোন মাঝি, জ্ঞাতসারে মুসলমানকে গুর্জ্জরে আনিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।" আর স্থলপথে কাহারও সেদিকে আসিবার সম্ভাবনা নাই—কারণ চারি পাঁচটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ গুর্জ্জরের চারি পার্শ্বে সতর্কভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি—সেই সময়ে গজনীপতি সুলতান মামুদ, উপর্য্যুপরি কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। গুর্জ্জরের সোমনাথপত্তনেই—সোমনাথের মন্দির। মন্দিরের মালিক গুর্জ্জরপ্রদেশাধিপতি। বহুদিন হইতে সুলতান, গুর্জ্জর-রাজ্যের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। কতবার তিনি গুর্জ্জরের ভিতরের অবস্থা জানিবার জন্য স্থলপথে দূত পাঠাইয়াছেন, কিন্তু কোন দূতই ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিতে পারে নাই। মামুদের মনের ধারণা এই—গুর্জ্জরাধিপের সতর্ক গুপ্তচরগণ তাহাদের হত্যা করিয়াছে।

সেই জন্য মামুদ এবার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাল খাঁ ও প্রধান সেনাপতি রোস্তম খাঁকে, ছদ্মবেশে হিন্দুর পরিচ্ছদে গুর্জ্জরে পাঠাইয়াছেন।

জামাল খাঁ ও রোস্তম আলি খাঁ, কাশ্মিরী হিন্দু-ব্যবসায়ীর বেশে সিন্ধুদেশ হইতে জলপথে যাত্রা করেন। দুই দিন তাঁহাদের সমুদ্রপথে কাটিয়াছে। তৃতীয় দিনে তাঁহারা গুর্জ্জরের খাড়ীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

এই খাড়ীমুখেই তাঁহারা গুর্জ্জরের নৌকায় উঠিয়াছেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা সমুদ্রতীরস্থ সোমনাথ-বন্দরে উপস্থিত হইলেন।

রোস্তম খাঁ, সুলতান মামুদের পার্শ্বচররূপে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের অনেক স্থানে কাটাইয়াছেন। অনেক দেশের ভাষা তিনি শিখিয়াছিলেন। কাজেই গুর্জ্জরে নামিয়া তদ্দেশের ভাষানভিজ্ঞতার জন্ত তাঁহাকে বিশেষ কষ্টে পড়িতে হয় নাই।

রোস্তম, জামাল খাঁকে অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"এখন আর কোন কথায় কাজ নাই। চলুন নামিয়া যাই।"

রোস্তমের ইঙ্গিতে তাঁহার সঙ্গিগণ, নৌকার মধ্য হইতে বাহিরে আসিল। রোস্তম দুইটী স্বর্ণ-মুদ্রা মাঝিকে পুরস্কার দিলেন। এ স্বর্ণ-মুদ্রা গুর্জ্জরের—পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত। তাঁহারা সকলেই নৌকা হইতে তীরে নামিয়া আসিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার সেদিন গভীর হইতে পারে নাই, কেননা একাদশীর চন্দ্র আকাশমণ্ডলের বরাঙ্গ শোভিত করিয়া হাস্য করিতেছিল। সেই সুবিমল চন্দ্ররশ্মি, গুর্জ্জরবক্ষঃস্থিত, সোমনাথদেবের রত্নখচিত, স্বর্ণমণ্ডিত, সমুচ্চ চূড়ার উপর পড়িয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। আর অদূরস্থ, সঘন শব্দায়মান সমুদ্রের শুভ্র ফেনমাখা তরঙ্গরাজির উপর, সেই রজতরেখা শতধারে বিস্ফুরিত হইয়া, স্বপ্নরাজ্যের মনোহর দৃশ্য বিকাশ করিতেছিল।

অদূরেই সোমনাথ-মন্দির। সন্ধ্যার সময় মন্দির-মধ্যে দেবতার আরতি হইতেছে। দামামাধ্বনির সহিত ঘণ্টানিনাদ মিশিয়া, এক গুরু-গম্ভীর নাদের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই গম্ভীরনাদ, বায়ুপথে চালিত হইয়া সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জনের সহিত মিশিয়া, মহাদম্ভে শব্দহীন ব্যোমপথকে বিচলিত করিতেছে।

শঙ্খঘণ্টার শব্দ, দামামার কঠোর শব্দ, জনসঙ্ঘের কোলাহল-শব্দ, ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হইল। তাহার পর সুমধুর নহবৎ আরম্ভ হইল।

প্রতিদিনই আরতির পর এইভাবে নহবৎ বাজিয়া থাকে। প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইলেই, নগরদ্বার বন্ধ হইয়া যায়। ইহাই গুর্জ্জরের ব্যবস্থা। কাজে কাজেই সেই দিনও চিরপ্রথামত পূরবী-ইমনের মধুর আলাপে, চন্দ্রালোক-প্লাবিত দিগ্‌বালাগণ পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

এই দলের অগ্রবর্ত্তী দুই জন সমুদ্রতীরাবস্থিত, এক সুবৃহৎ পাষাণ-খণ্ডের উপর বসিলেন। দূরশ্রুতবীণাধ্বনিবৎ সেই নহবৎধ্বনি, তাঁহাদের চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তাঁহাদের পথশ্রমকাতর অবসন্ন দেহ ও প্রাণ, যেন সেই মধুরধ্বনিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। শ্রম, ক্লান্তি, অবসাদ সবই চলিয়া গেল। তাঁহারা কি করিতে কোথায় আসিয়াছেন—তাহা ভুলিয়া গেলেন।

স্থানটি বড় নির্জ্জন। এইটীই সহরের শেষ প্রান্ত। সন্ধ্যার পর লোকজন বড় একটা থাকে না। সমুদ্রতীরে রাত্রে কাহারও আসিবার প্রয়োজন হয় না।

রোস্তম খাঁ বলিলেন,—"এখন জনাবের কি মর্জ্জি? চলুন, সহরের মধ্যে কোন মুসাফেরখানায় প্রবেশ করি। একটা আশ্রয়-স্থান ত চাই। আমাদের জন্য বলিতেছি না, আপনার যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, তাহা দেখিবার জন্য আমরা সুলতান কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি।"

এই কথায় জামাল খাঁ বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"চুপ্! চুপ্ রোস্তম! অনুচ্চস্বরে কথা কও। সুলতানের নামোল্লেখের কোন প্রয়োজনই নাই। গুর্জ্জরপতি অতি সতর্ক। হয় ত তাঁহার গুপ্ত প্রণিধিগণ আমাদের অতি নিকটেই অবস্থান করিতেছে।"

রোস্তম, জামাল খাঁর আজ্ঞাধীন—তাঁবেদার। কাজেই সে চুপ করিল। জামাল খাঁ দেখিলেন, রোস্তম তাঁহারই হিতের জন্য দুকথা

বলিতে গিয়া তিরস্কৃত হইয়াছে। কাজেই তিনি অনেকটা প্রসন্নভাবে বলিলেন,—"আমার জন্য ভাবিও না রোস্তম !"

রোস্তম, জনাবের প্রসন্নমুখ দেখিয়া একটু সাহস পাইল। বলিল,—"বিশ্রামের ত একটা স্থান চাই। দুই দিন সমুদ্রবক্ষে কাটাইয়াছি, এ কষ্ট আমাদের সহিতে পারে ; কিন্তু আপনার—"

এই কথায় জামাল খাঁ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"কেন, আমি কি সৈনিক নই ? তোমরা যে কষ্ট সহিতে পার, আমি তা পারিব না ? এই সমুদ্রোপকূলে পাষাণবক্ষে শয্যা রচনা করিব। সঙ্গে আহার্য্য যথেষ্ট আছে। তোমরা শ্রান্তি দূর কর।"

"জনাবালি অন্যায় আদেশ করিতেছেন।"

"চুপ—আবার জনাবালি ! ঐ দেখ রোস্তম, সুনীল আকাশের নীচে কত নীল, পীত, সবুজ, শ্বেত তারকা, পুঞ্জীকৃত হইয়া জ্বলিতেছে। এ দেশে তারকারও এত বর্ণ-বৈচিত্র্য !"

"জনাব ! আপনার ভ্রম হইয়াছে। ঐ উজ্জ্বল পদার্থগুলি, তারকা নয়। খোদা, তারকাকে সমুজ্জ্বল শ্বেতবর্ণই দিয়াছেন। ওগুলি সোমনাথমন্দিরের চূড়ায় সংলগ্ন ত্রিশূলের উজ্জ্বল মণিপ্রস্তররাজি। উহার নীচে আলো দেওয়া আছে বলিয়া উহা ঐরূপ ভাবে জ্বলিতেছে।"

"সোমনাথের ঐশ্বর্য্য এত ! সোমনাথের হীরা মণিমুক্তা এত যে তাহা মন্দিরের চূড়ায় রক্ষিত ? না জানি ভিতরে কি আছে ! কিন্তু রোস্তম ! কি সুন্দর ! উপরে সুনীল ব্যোমগাত্রে বিমল চন্দ্রজ্যোতিঃ, আর সেই চন্দ্র-জ্যোতিপ্লাবিত শূন্যস্তরে, মন্দিরচূড়ায় বহুমূল্য রত্ন-জ্যোতিঃ ! আর হেমকান্তি ত্রিশূলের উপর শুভ্র চাঁদের আলো। কি সুন্দর ! রোস্তম, কি সুন্দর !"

রোস্তম খাঁ মনে মনে ভাবিল, শাহজাদার এ ভাববিপর্য্যয়, চিত্ত-বিকার, তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনের অনুকূল নহে। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ-সম্পৎ-পরিভাষিত, নীলাম্বুবারিধিমেখল, তরঙ্গভঙ্গান্দোলিত, ভূধর-মণ্ডিত গুর্জ্জরের অফুরন্ত নৈসর্গিক শোভা তাঁহার কবিত্বময় চিত্তকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। কাজেই সে কথাটা অন্যভাবে ঘুরাইয়া বলিল,—"জনাব! সোমনাথের ঐশ্বর্য্য বিশ্ব-বিশ্রুত। শুনিয়াছি, হিন্দুর এ দেবতা শূন্যগর্ভ। সেই শূন্যগর্ভের মধ্যে অসংখ্য বহুমূল্য রত্নরাজি লুকান আছে। যুগযুগান্ত হইতে সঞ্চিত হইয়া, সেই রত্নরাজি মন্দির-মধ্যে রক্ষিত; সেই রত্নরাজি হস্তগত করিবার জন্যই আপনার খুল্লতাত, মহাপরাক্রান্ত গজনীর সুলতান, ভারতবিজয়ী মামুদ আপনাকে ছদ্মবেশে গুর্জ্জরের অবস্থা জানিতে পাঠাইয়াছেন।"

জামাল খাঁ তাঁহার হেনারঞ্জিত সুকোমল শ্মশ্রুরাজির মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া, সেগুলি মৃদুভাবে আকর্ষণ করিতে করিতে চিন্তিতভাবে বলিলেন,—"রোস্তম খাঁ?"

"অনুমতি করুন হুজুরালি!"

"এই সুন্দর দেশ আমাদের ধ্বংস করিতে হইবে? ইহার বিনাশের উপলক্ষ্য হইতে হইবে? হাস্যময়ী ধরার অপ্সরোত্থান অগ্নিদগ্ধ করিয়া, তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া শ্মশান করিতে হইবে? খোদা যে দেশকে এত মনের মত শোভাসম্পদ্ দিয়া সাজাইয়াছেন, সেই শান্তিময় দেশকে শোণিতাক্ত করিতে হইবে? না—না—আমি পারিব না। আমার দ্বারা এ ঘৃণিত কাজ হইবে না।"

রোস্তম খাঁ ঘোর হিন্দুদ্বেষী। সুলতান মামুদের উপযুক্ত অনুচর। শাহজাদার কথার ভঙ্গীতে সে বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহার কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই, সে অধীন কর্ম্মচারী মাত্র।

সুলতান মামুদের ভ্রাতুষ্পুত্র, বিশাল গজনীর ভবিষ্যৎ অধীশ্বর, যাঁহার উপর সুলতানের অপরিমেয় স্নেহ, অগাধ বিশ্বাস, তাঁহার কথার উপর কথা কহিবে—এমন সাহস তাহার নাই। লুণ্ঠন, যুদ্ধ, সেনানীর সুনাম ও সুযশ হিন্দুরাজ্যের ধ্বংসসাধন, তাহার প্রাণের কামনা বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, সে শাহজাদার আজ্ঞার অধীন। এ জন্য কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, রোস্তম বলিল, "এখন জনাবালির অভিপ্রায় কি?"

জামাল খাঁ বলিলেন, "পূর্ব্বেই ত আমি বলিয়াছি, রোস্তম! আমার সংকল্প পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। এই গুর্জ্জরকে দেখিয়া অবধি, আমার বড়ই স্নেহ জন্মিয়াছে। কে কোথায় কবে স্নেহের জিনিসকে ধ্বংস করিতে পারিয়াছে? যে বিজয়-বাসনা আমার খুল্লতাতকে বিচলিত করিয়াছে, যাহার উত্তেজনা-চালিত হইয়া তিনি ভারতের হিন্দুরাজ্যগুলির বার বার ধ্বংসসাধন করিয়াছেন, খোদার শান্তিময় রাজ্যে শোণিতপ্রবাহ বহাইয়াছেন, ভারতের লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্যে গজনীকে অলকাতুল্য করিয়া তুলিয়াছেন, সে দুর্দ্দমনীয় বাসনা আমার প্রাণে নাই। জানি, আমি তাঁর সিংহাসনের অধিকারী। কিন্তু আফ্‌গান-স্থানে প্রকৃতির প্রদত্ত বহুমূল্য উপহার যাহা আছে, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব। পার্ব্বত্য-ক্ষেত্রে উৎপন্ন গোধূম, উপত্যকায় উৎপন্ন সুরসাল আঙ্গুর আনার—আমার রাজভোগ। সূর্য্যকরোজ্জ্বল, তুষার-কিরীট পর্ব্বতরাজির উজ্জ্বল দীপ্তিতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি কোন মতেই এ রাজ্যের ধ্বংসসাধনের কারণ হইতে পারিব না। আমার বিবেক—কর্ত্তব্যজ্ঞান ইহাই বলিয়া দিতেছে।"

রোস্তম খাঁ এইবার নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িল। সে ভাবিল, যে কোন কারণেই হউক, একটা অস্থায়ী উন্মত্ততা শাহজাদার মস্তিষ্কে

আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। • তবুও সে বলিল, "তাহা হইলে এখন করিতে চান কি ?"

জামাল খাঁ প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—"যাহা করিতে চাই, তাহা ত এখনই বলিলাম রোস্তম !"

রোস্তম এবার রুষ্টভাবে বলিল—"সুলতান বিদায়দানকালে, আপনাকে যে গৌরবসূচক তরবারি দান করিয়াছেন, যে তরবারি-স্পর্শে শপথ করিয়া আপনি এ দেশে আসিয়াছেন, সেই তরবারির মর্য্যাদা কি এই রূপেই রক্ষা করিবেন ?"

জামাল খাঁ বিষণ্ণমুখে, বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"স্বাধীন আফ্‌গানক্ষেত্রে, এক স্বাধীন নরাধিপের স্নেহময় ক্রোড়ে আজন্ম পালিত হইয়াছি। দেহ বিক্রয় করিয়াছি বটে, কিন্তু চিত্ত বিক্রয় করি নাই। এ প্রাণের উপর সুলতানের পূর্ণ আধিপত্য থাকিতে পারে, তিনি হত্যা করিয়া এ প্রাণ লইতে পারেন। আমার বিগত-প্রাণ দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া, কাবুলের বড় বড় কুত্তার ক্ষুন্নিবৃত্তির বন্দোবস্ত করিতে পারেন—কিন্তু আমার চিত্তের স্বাধীনতার উপর,—বিবেকের উপর তাঁহার কোন আধিপত্য নাই। এই নাও রোস্তম ! সেই পবিত্র তরবারি, যাহা সুলতান মামুদ আমাকে গৌরবের চিহ্ন-স্বরূপ—বিশ্বাসের চিহ্নস্বরূপ দিয়াছেন। ইহা তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া আমার নাম করিয়া বলিও,—"আর আমি আফ্‌গানিস্থানে ফিরিব না। সুলতানের উত্তরাধিকারিরূপে আর আমি রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করি না। আমি এখন মুক্ত ও স্বাধীন। তিনি যেন পূর্ব্ব-বাৎসল্যের অনুরোধে আমার এ অপরাধ ও অবাধ্যতা মার্জ্জনা করেন।"

প্রাণের আবেগে, চিত্তের উত্তেজনায়, সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র

শাহজাদা জামাল খাঁ কাঁদিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন,—"রোস্তম! চুপ করিয়া রহিলে যে? তুমি কি মনে ব্যথা পাইলে? তুমিও একজন বীরশ্রেষ্ঠ—স্বাধীনতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত, তেজস্বী আফ্‌গান। হায় রোস্তম! কোথায় তোমার সে বীরত্ব-গৌরব! মনে পড়ে না কি রোস্তম, একদিন তোমার ঐ মাংসপেশী-বহুল সুদৃঢ় হস্তের শক্তিতে ব্যাঘ্রের দংষ্ট্রা বিদীর্ণ করিয়া, তাহাকে বধ করিয়াছিলে? নিজের অসমসাহসিকতায় সুলতানের জীবন রক্ষা করিয়াছিলে? জীবনরক্ষায় কৃতজ্ঞতাবিমুগ্ধ সুলতান, তোমায় অর্থদানে পুরস্কৃত করিতে চাহিলে, বলিয়াছিলে,—"আফ্‌গানেশ্বর! এ বান্দা আপনার প্রজা! প্রজার কর্ত্তব্য রাজাকে রক্ষা করা। পুরস্কারের কোন প্রয়োজন নাই।" রোস্তম! কোথায় তোমার সে প্রাণের তেজ? এখন তুচ্ছ লুণ্ঠনলব্ধ অর্থের আশায়, তুমি সুলতানের এ মহা অন্যায়-কার্য্যের সমর্থন করিতেছ! দরিদ্র রোস্তম একদিন দর্পভরে প্রাণের যে মহত্ব দেখাইয়াছিল, আজ ধনী রোস্তম তাহা দেখাইতে পারিতেছে না! হায়! কি পরিতাপ, রোস্তম!

রোস্তম, শাহজাদার এই তেজোগর্ভ বাক্যে বড়ই দমিয়া গেল। তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা পূর্ণ সত্য—তিলমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। তাঁহার কথাগুলা রোস্তমের পাষাণবৎ সুদৃঢ় বক্ষের উপর বড়ই সজোরে আঘাত করিল। সে এই আঘাতে বড়ই বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িল। সে বুঝিল, মহত্ত্বের ও ন্যায়নিষ্ঠার দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে, সত্যই তাহার অধঃপতন ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার যে গত্যন্তর নাই। সে যে কোরাণ স্পর্শ করিয়া সুলতানের সমক্ষে শপথ করিয়াছে। সে একবার মনে ভাবিল, শাহজাদা যাহা বলিতেছেন, তাহাই ঠিক। সে একবার সংকল্প করিল—"না, আফ্‌গানিস্থানে আর ফিরিব না!—শাহ-

জাদার সঙ্গেই থাকিব।" কিন্তু তাহা কি সম্ভব? বিশ্বাসঘাতকতা—প্রভুদ্রোহিতা—অধর্ম্মাচরণ! এত পাপ কি তাহার সহিবে? সে যে ছায়ার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে সুলতানের আজ্ঞানুসারী হইবে। সহসা তাহার মনে পড়িল—সুলতানের প্রাসাদের মধ্যে তাহার প্রিয়তমা, প্রাণাধিকা বনিতা রুখিয়া বিবি, আর তাহার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের শোণিত, একমাত্র শিশুপুত্র জিন্নত আলি তাঁহার বিশ্বাসময় কর্ত্তব্যের প্রতিভূরূপে অবস্থান করিতেছে। সুলতান মামুদ, খোদার সৃষ্টিতে অতি ভয়ানক লোক। তাঁহাকে প্রাণের স্বাধীনতা দেখাইবার কোন উপায়ই নাই। হায়! হায়! তাহা হইলে সুলতানের শাণিত তরবারিমুখে যে তাহার স্ত্রী ও পুত্র তখনই নিহত হইবে।

এই সমস্ত মস্তিষ্কবিপ্লবকারী চিন্তায়, রোস্তমের প্রাণে একটা মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। সে অনিচ্ছায় তাহার প্রাণের মহত্ব, প্রিয়তমা পত্নী ও পুত্রের জীবনের জন্য, অকাতরে বিসর্জ্জন করিল। বহুক্ষণ চিন্তার পর কঠোরস্বরে বলিল,—"তাহা হইলে কি আপনার অভিপ্রায় যে আমরা অনাহারে পথে পথে ভিক্ষা করিব বা গুর্জ্জরপতির গুপ্ত প্রণিধির হাতে পড়িয়া, এই অপরিচিত দেশে ঘাতকহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিব?"

জামাল খাঁ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"পথে পথে ভিক্ষা করিব কেন? গুর্জ্জরের হিন্দুদের মধ্যে কি দয়া ও আতিথেয়তার এতই অভাব! জাননা কি রোস্তম! ধর্ম্মপথে থাকিলে দিনান্তেও অন্ন মিলে! গুর্জ্জর-পতির নিকট আমাদের কথা অকপটে ব্যক্ত করিলে, তিনি কখনই আমাদের অনিষ্ট করিবেন না। শুনিয়াছি, হিন্দুবীর শত্রুকে কখনই নিঃসহায় অবস্থায় নিপীড়িত করেন না। তবে কিসের ভয় রোস্তম?"

বাত্যাতাড়িত সমুদ্রবক্ষঃসম্ভূত চঞ্চল উর্ম্মিমালার ন্যায়, বহুবিধ চিন্তা তাহার মনে উঠিল। রোস্তম নানা কথা ভাবিল। তাহার প্রাণের চিন্তা সেই সুদূর আফ্‌গান দেশে,* গজনী সহরের প্রস্তরময় রাজ-প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল। মনশ্চক্ষে বিকৃত কল্পনাবলে সে যেন দেখিল, সুলতান তাহার এ অবাধ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া,তাহার স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে কারানিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সে আরও দেখিল, যেন তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রকে, ক্ষুধিত কুক্কুরমুখে ফেলিয়া দিবার আদেশ হইয়াছে। স্নেহময়ী পত্নীকে পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সর্প-বৃশ্চিকপূর্ণ এক অন্ধকারময় গহ্বরে রাখা হইয়াছে। সে গহ্বরে বায়ু প্রবাহমাত্র নাই। রোস্তম এ দৃশ্য দেখিয়া একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। সে আর দেখিতে পারিল না। বাস্তবরাজ্যে থাকিয়া কল্পনার বিভীষিকাময় লাঞ্ছনা আর সহিতে পারিল না। উন্মত্তের ন্যায় ভ্রূকুটী-ভঙ্গী করিয়া বলিল,—"শাহজাদা! আমায় মার্জ্জনা করুন। আপনি বিশ্বাসঘাতক হইতে পারেন, আমি পারিব না।"

"বিশ্বাসঘাতক!" অধীন সেনাপতির মুখে এই অপমানকর শ্লেষ-বাক্য! তিনি না সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র! পর্ব্বতমেখল গজনীর ভবিষ্যৎ অধীশ্বর! রোস্তমের এ ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া, শাহ মহম্মদ জামাল, বক্ষাবরণ হইতে ক্ষুরধার ছুরিকা আকর্ষণ করিয়া, ব্যাঘ্রবৎ ভীষণ-গর্জ্জনে বলিলেন,—"শয়তান নফর! তোর এত স্পর্দ্ধা! সুলতানের একটা অন্যায় কার্য্য সমর্থন করিলাম্ না বলিয়া, আমি বিশ্বাসঘাতক?"

সেই অত্যুজ্জ্বল পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে, জামালের সেই শাণিত অস্ত্রফলক যেন স্থিরা সৌদামিনীর মত চক্‌মক্ করিতে লাগিল। আর

শাহাজাদার হাতের মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিল। —১৩ পৃঃ

The Emerald Ptg. Works

একটু হইলে হয় ত একটা মহা রক্তারক্তি ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত; কিন্তু দৈব-প্রেরিত এক অদ্ভুত কারণবশে তাহা হইতে পারিল না।

সেই রজতধারাময়ী ধরণীর বুকে, শুভ্রবসন-পরিহিতা, অতুলনীয়া রূপশালিনী, এক তন্বঙ্গী যুবতীর পদচিহ্ন অঙ্কিত হইল। সে সহসা পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া, সবলে শাহজাদার হাতের মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিল। শাহজাদার হস্ত শক্তিহীন, তিনি অতীব বিস্ময়বিমুগ্ধ। হস্তস্থিত ছুরিকা, সেই চাপনে ভূতলে পড়িয়া গেল। শাহজামাল রুষ্টস্বরে বলিলেন,—"কে তুমি—আমার এ সংকল্পে বাধা দিলে?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই কথা বলিয়া জামাল খাঁ মুখ তুলিয়া একবার সেই কান্তিময়ী রমণীর, জ্যোৎস্নাবিধৌত মুখের দিকে চাহিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইলেন। এ গুর্জ্জরে রমণীর এত শক্তি! এত সাহস! বাহুতে এত বল! রূপ এত অফুরন্ত—এত উপমাবিহীন! এ রূপের যে মূল্য নাই!

সেই পরমাসুন্দরী রমণী, অসঙ্কুচিতভাবে, চিরপরিচিতার ন্যায়, তিরস্কার-ব্যঞ্জকস্বরে বলিল,—"আত্মবিবাদ কোন কারণেই শ্রেয়ঃ নয়। আপনারা বিবাদ করিতেছিলেন কেন?"

শাহজামাল, এত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আর কখনও শোনেন নাই। দূরশ্রুত বীণাধ্বনির ন্যায়, বাসন্তীসমীর-বিতাড়িত কোকিল-কাকলীর ন্যায়, সে স্বর অতি মধুর। কর্ণের মধ্য দিয়া, মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া, তাহা যেন তাঁহার উত্তেজিত প্রাণকে এক মোহময় শক্তিতে সঞ্জীবিত করিল।

শাহজামাল প্রাণের আশা মিটাইয়া, নয়ন ভরিয়া, সেই রূপ দেখিলেন। দেখিলেন, সে মুখ সম্পূর্ণরূপে অবগুণ্ঠনমুক্ত। সেই আকর্ণবিশ্রান্ত, নীলোৎপলতুল্য চক্ষুর অতি পবিত্র স্নিগ্ধজ্যোতিঃ, চন্দ্র-কিরণের সহিত মিশিয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছে। বান্ধুলীলাঞ্ছিত রক্তোৎফুল্ল সুকোমল ওষ্ঠাধর মৃদু হাস্যবিকম্পিত। সেই সুন্দর সমুন্নত দেহযষ্টিবেষ্টনকারী, বহুমূল্য কৌষেয়-বাসের চিকনের কাজের উপর চন্দ্রকিরণ পড়িয়া, অতি সুন্দর দেখাইতেছে।

সেই রমণী আবার বীণানিন্দিতকণ্ঠে বলিল,—"এই শান্তিময় গুজরাটের পবিত্র ভূমি যাহাতে বিদেশীর শোণিতে অযথা রঞ্জিত না হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা। তাই আমি পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া, আপনার হস্তকে অসিচ্যুত করিয়াছি।"

শাহজামাল বিস্মিতভাবে বলিলেন,—"আমরা বিদেশী—তোমাকে কে এ কথা বলিল?"

"তাহা আপনাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এ গুর্জ্জরের সকল অধিবাসীই এরূপ এক পবিত্রমন্ত্রে দীক্ষিত যে, তাহারা সহস্র কারণ ঘটিলেও আত্মবিবাদ করিবে না। আত্মবিগ্রহ-জাত শোণিতধারায় সোমনাথের অধিষ্ঠানক্ষেত্র কলুষিত করিবে না।"

শাহজামাল এ কথায় চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "রমণি! কে তুমি?"

"আমি ভগবান্ সোমনাথের সেবিকা।"

"এ রাত্রে একা এদিকে আসিয়াছিলে কি করিতে?"

"সোমনাথ-মন্দিরে প্রতিদিন শিবস্তোত্র গান হয়। গান শুনিয়া আমি এই পথে বাটীতে ফিরিতেছিলাম। এই সমুদ্রতীরস্থ পথ দিয়াই আমাকে বাটী যাইতে হয়।"

"তুমি আমাদের সকল কথাই শুনিয়াছ ?"

"নিশ্চয়ই—"

"বলিতে পার আমরা কে ?"

"এই শান্তিময় দেবভূমির মহাশত্রু।"

শাহজামাল হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া মনোভাব গোপনের চেষ্টা করিলেন ; পরে দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"সুন্দরি ! তোমার মহা ভ্রম হইয়াছে ! আমরা কাশ্মিরী-হিন্দু—বস্ত্রব্যবসায়ী।"

"না সাহেব ! আপনি সত্য গোপন করিতেছেন। আপনি বস্ত্র-ব্যবসায়ী নন। তবে শস্ত্রব্যবসায়ী বটে। আপনি হিন্দু নন—মুসল-মান। যে সে মুসলমান নন—হিন্দুস্থানের প্রধান শত্রু সুলতান মামুদের ভ্রাতুষ্পুত্র।"

শাহজামাল, এ কথায় চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল মলিনভাব ধারণ করিল। তীক্ষ্ণ-কটাক্ষশালিনী সেই রমণী, চন্দ্রালোক-বিধৌত রজনীতে সে পরিবর্ত্তিত ভাব লক্ষ্য করিল।

জামাল ত্রস্তস্বরে সেই রমণীকে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আর কে আছে ?"

"কেহই না—আমি একাকিনী।"

"দেখিতেছি, তুমি রূপবতী যুবতী। এ রাত্রে নির্জ্জন পথে একা-কিনী গৃহে ফিরিতেছ, আশ্চর্য্য কথা বটে !"

"কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে। গুজরাট এখনও স্বাধীন। গুর্জ্জর-রাজ্য এখনও সুশাসিত। গুজরাট এখনও খাঁটি হিন্দুতে পূর্ণ। এ দেশে পরস্ত্রীকে, পরকন্যাকে, সকলেই মাতৃভাবে দেখে। এ মহা-শক্তির লীলাক্ষেত্র। সাহেব ! এদেশে রমণীর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।"

"বুঝিলাম; কিন্তু আমি তোমার পূর্ণ পরিচয় চাহি।"

"যাহা দিয়াছি তাহাই যথেষ্ট। আর দিব না।"

শাহজামাল এই দর্পিতা রমণীর তেজোগর্ভ বাক্য শুনিয়া, তাহাকে মনে মনে অনেক প্রশংসা করিলেন। তৎপরে কঠোরস্বরে বলিলেন, "রমণি! সত্য পরিচয় না দিলে তোমার বিপদ্ ঘটিবে।"

"কে বিপদ্ ঘটাইবে?"

"আমি ও আমার সঙ্গিগণ।"

"আপনার কয়জন সঙ্গী আছে?"

"আরও চারিজন।"

"তাহাদের সকলেই কি আপনার মত শক্তিমান্? স্বাধীনতার লীলাভূমি আফগানস্থানের বীরেরা, কি রমণীর উপর অত্যাচার করিতে শিক্ষিত?"

সুন্দরীর এ তীব্র বিদ্রূপে রোস্তমের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার তরবারি কোষমুক্ত করিল। সেই সুন্দরী তখনই ক্ষিপ্রবেগে সবলে রোস্তমের দক্ষিণ হস্তের কব্জি চাপিয়া ধরিলেন। রোস্তম সে তীব্র শক্তিময় স্পর্শের প্রভাব মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল। মহা-শক্তির শক্তির কাছে, বীরত্বের অতি দর্প যে একান্ত নিষ্ফল, রোস্তম তাহা বেশ বুঝিল। তাহার হস্ত হইতে অসি স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

রোস্তম সবিস্ময়ে বলিল, "কে তুমি দেবী?"

সেই রমণী বীণানিন্দিতকণ্ঠে বলিল;—"পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, আমি ভগবান্ সোমনাথের সেবিকা।"

"গুজরাটের সকল রমণীই কি তোমার মত শক্তিশালিনী?"

"শক্তির অবতার মহাকাল-ভৈরব সোমনাথ যেখানে মহারুদ্ররূপে

বিরাজিত, সংগ্রামেশ্বরী যেখানে মহাশক্তিরূপে বিরাজিতা, সে দেশের অধিকাংশ রমণীই এইরূপই বটে।"

শাহ জামাল এতক্ষণ নিস্তব্ধভাবে সেই রমণীর কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তিনি স্নেহময় স্বরে বলিলেন, "রোস্তম! এই রমণীকে ধন্যবাদ দাও যে, তোমার ও আমার শোণিতে এই সমুদ্রবারিবিধৌত বেলাভূমি কলঙ্কিত হয় নাই। বুঝিলাম, এ যাত্রা আমাদের কার্য্য নিষ্ফল হইয়াছে। চল, আমরা ফিরিয়া যাই।"

সেই রমণী গম্ভীরভাবে বলিল,—"ফিরিয়া যাইবেন, কোথায়? আফগানিস্থানে—না, সিন্ধুদেশে?"

"আপাততঃ সিন্ধুদেশেই যাইব।"

"এ রাত্রে ত সাহেব, নৌকা পাইবেন না! আর এক কথা, গুর্জ্জরের অতিথি হইয়া আপনারা যে বিনা পরিচর্য্যায় গন্তব্যস্থানে ফিরিয়া যাইবেন, তাহা হইতে দিব না।"

"তবে তুমি কি করিতে চাও?"

"আপনারা আমার দেশের শত্রু হইলেও আমার অতিথি। আমার সঙ্গে আমার বাটীতে আসুন।"

"তোমাকে বিশ্বাস কি?"

"বিশ্বাস—আমার মুখের কথা। গুর্জ্জর-রমণী আশ্রিত অতিথির অনিষ্ট কখনই করে না। আপনাদের অনিষ্ট করিবার বাসনা হইলে, আমি ত অনায়াসে তাহা করিতে পারি।"

"কি করিয়া অনিষ্ট করিবে সুন্দরি? তুমি ত একা—"

"আমার কোন শক্তি নাই। ভগবান্ সোমনাথ, নিজের শক্তিতেই গুর্জ্জরের শত্রুর মনোবাসনা বিফল করিয়া দেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনারা এইমাত্র দেখিলেন। এখন আমার সঙ্গে আসুন।"

"তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে আমরা প্রস্তুত নই !"

"অতিথি অভুক্ত অবস্থায়, গুজরাট হইতে চলিয়া গিয়াছে, এ কলঙ্ক সহ্য করিতে আমিও প্রস্তুত নহি।"

"যদি আমরা তোমার অনুরোধ রক্ষা না করি—আতিথ্য-স্বীকার না করি ?"

"আমি জোর করিয়া আপনাদের বাধ্য করাইব।"

এই বলিয়া সেই যুবতী, মুহূর্ত্তমধ্যে বক্ষোবস্ত্র হইতে একটি ক্ষুদ্র শঙ্খ বাহির করিয়া তাহাতে ফুৎকার প্রদান করিলেন। সেই ক্ষুদ্র শম্বুকগর্ভ হইতে এক ভীম ভৈরবনাদ মহাতেজে জাগিয়া উঠিল। সেই চন্দ্রকিরণ-প্লাবিত, পুণ্য বেলাভূমি সে গম্ভীরনাদে কাঁপিয়া উঠিল। সে শব্দ যেন রুদ্রাণীর ভীমভৈরব হুঙ্কার। গভীর নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই শঙ্খনাদ দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইল।

এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, করিয়া, প্রায় পঞ্চাশৎ জন গৈরিক-বস্ত্র-পরিহিত, রুদ্রাক্ষ-শোভিত, অসিধারী সৈন্য—সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের এমন শিক্ষা-দীক্ষা যে, অত লোক পঙ্গপালের মত চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহাদের গতি অতি সাবধানতাপূর্ণ—শব্দমাত্র-বিহীন।

তাহাদের মধ্যে যে প্রবীণ, সে সেই সুন্দরীর সম্মুখে অসি অবনত করিয়া বলিল, "সন্তানদের ডাকিয়াছ কেন মা ?"

রমণী সহাস্যে বলিলেন, "একবার দেখিবার সাধ হইয়াছিল—বাবা ! যাও, তোমরা স্বস্থানে ফিরিয়া যাও।"

যেন মায়াবলে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই পঞ্চাশজন সৈনিক জ্যোৎস্নালোকে মিশিয়া গেল ! সেই রমণী তেমনই নির্ভীক-হৃদয়া উদ্বেগপরিশূন্যা ও হাস্যময়ী। সে স্ফুরিতাধর যেন একটা গর্ব্বমাখা হাস্যে পরিপূর্ণ।

জামাল ও রোস্তম অর্থপূর্ণ কটাক্ষ বিনিময় করিলেন। রমণী তাহা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না।

শাহ জামাল বলিলেন, "সুন্দরি! তোমার মনের ভাব বুঝিয়াছি। তুমি আমাদের শক্তিতে বাধ্য করিয়া আতিথ্য-স্বীকার করাইতে চাও। বুঝিলাম, ঘটনাচক্র এখন আমাদের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছে। চল, আমরা তোমার সঙ্গে যাইতেছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা কর—"

"কি প্রতিজ্ঞা বলুন ?"

"আমাদের সহিত কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না!"

"ভগবান্ সোমনাথ যেন আমায় সেরূপ প্রবৃত্তি না দেন।"

"আমাদের প্রকৃত পরিচয় কাহাকেও দিবে না!"

"তাহাও স্বীকার করিতেছি।"

"আর কল্য সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে আমাদের বিনা বাধায় বিদায় দিবে। আমাদের জন্য একখানি নৌকাও ঠিক করিয়া দিবে।"

"তাহাতেও অস্বীকৃতা নহি। আপনারা নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হউন।"

শাহ জামাল বলিলেন, "আর এক কথা, আমার কয়জন সঙ্গীও আমার কাছে থাকিবে।"

"তাহাতেও আমার কোন আপত্তি নাই।"

রোস্তম, শাহ জামালের ইঙ্গিতে সহসা বংশীধ্বনি করিলেন। যে কয়েকজন সৈনিক, ছদ্মবেশে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছিল, তাহারা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

শাহ জামাল তখন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "চল বিবি! আমরা বড়ই শ্রান্ত হইয়াছি।"

চুম্বকে যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, এই মহিমময়ী

রমণী সেইরূপ শাহ জামাল ও রোস্তমকে পশ্চাতে রাখিয়া নিজে অগ্রবর্ত্তিনী হইল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর, সেই রমণী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনারা আমার অগ্রে চলুন।"

শাহ জামাল ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন, "কেন সুন্দরি! তোমার ভয় হইতেছে?"

সেই যুবতীও সহাস্যমুখে বলিল, "ভয় কাহাকে বলে, তাহা জানিলে আপনাদের সম্মুখীন হইতাম না। তবে মুসলমানকে বিশ্বাস নাই। যাহারা বীরত্বাভিমানী হইয়াও এক শান্তিময় নগরের সর্ব্বনাশ-কল্পনায় ছদ্মবেশে আসিতে পারে, তাহাদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই।"

এ তীব্র তিরস্কারে শাহ জামাল বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। সেই রমণী তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "এখন আর পথ দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া আমি পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইতেছি; ভয়ে নহে! আর এক কথা এই, স্বল্পপরিসর পথে তিন জন লোক পাশাপাশি যাওয়াও অসম্ভব ব্যাপার! আমার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইবার ইহাও একটি কারণ। এই পথ যেখানে শেষ হইয়াছে, সেই স্থানই আমাদের গন্তব্যস্থান।"

স্থানটি, সমুদ্র পার্শ্ববর্ত্তী শৈলমালাবেষ্টিত, সমুচ্চ উপত্যকার একাংশ। পথটি সরল, অপ্রশস্ত এবং একটী অট্টালিকার দ্বারমুখেই সমাপ্ত।

গুর্জ্জররাজ, তাঁহার কন্যার সমুদ্র-দর্শন-বাসনা তৃপ্তির জন্য এই ক্ষুদ্র প্রাসাদটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রাজকুমারী সকল সময়ে এ প্রাসাদে না থাকিলেও ইহার চারিদিক্ সর্ব্বদাই প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত থাকিত।

বিমল চন্দ্রালোকে সেই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-পথ সমুজ্জ্বলিত বটে, কিন্তু দুইধারে বৃক্ষশ্রেণী থাকায় এক এক স্থান বড়ই অন্ধকারময় হইয়াছিল। চন্দ্রকর গায়ে মাখিয়া সমগ্র প্রকৃতি পরিসুপ্ত। নিসর্গবক্ষে যেন একটা বিরাট গাম্ভীর্য্যের ছায়াপাত হইয়াছে। পর্ব্বতের শীর্ষদেশস্থ বৃক্ষাদির শ্যামল পল্লবের উপর উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছে। বন্ধুর পার্ব্বত্য-ভূমির বক্ষোভেদকারী ক্ষুদ্র গিরিনদীর পবিত্র সলিলের উপর প্রস্ফুট শশী-কিরণ-সম্পাতে এক নূতন শোভা বিকশিত হইয়াছে।

সকলেই সেই ক্ষুদ্র প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেই প্রাসাদের দ্বার লৌহশৃঙ্খলিত, ভিতর হইতে আবদ্ধ। তবুও সেই দ্বারে দুইজন প্রহরী উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে দণ্ডায়মান।

রমণী এই দ্বারসন্নিহিতা হইয়াই তাঁহার বক্ষোদেশ হইতে সেই ক্ষুদ্র শঙ্খটী বাহির করিয়া, তাহাতে ফুৎকার প্রদান করিলেন। নৈশ-প্রকৃতির সেই বিরাট্ গাম্ভীর্য্য যেন সেই শঙ্খনাদে কাঁপিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী সমুন্নত শৈলশ্রেণীর কন্দরে কন্দরে যেন সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে সেই শৃঙ্খলিত দ্বারও উন্মোচিত হইল।

রমণী সহসা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া, শাহ জামালকে বলিলেন, "শাহজাদা! রাজপুত কখনও অতিথির অবমাননা করে না। মহাশত্রুও যদি অতিথি হয়, তাহা হইলেও সে দেবতার ন্যায় পূজনীয়। এ ক্ষুদ্র প্রাসাদমধ্যে নিঃশঙ্কে প্রবেশ করুন।"

যে প্রহরী ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, সে অবনতমস্তকে বলিল, "ইহারা কে মা?"

রমণী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ভৈরব! ইঁহারা আমাদের অতিথি।

অন্য পরিচয়ে কোন প্রয়োজন নাই। ' আমি এখনই বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতেছি। ইঁহাদের পরিচর্য্যার সুবন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

ভৈরব আর কোন কথা না বলিয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে সেই লৌহদ্বার পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলিত করিল। তৎপরে শাহজামালকে বলিল, "মহাশয়! আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হউন।"

শাহ জামাল ও রোস্তম উভয়েই নির্ব্বাক্! উভয়েই বিস্ময়-বিপ্লুত। তাঁহারা আর যাহা বুঝিতে পারুন বা নাই পারুন, এটুকু বুঝিলেন যে, সেই শক্তিময়ী রমণী যেন দুর্ভেদ্য মায়াবলে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভৈরব অতিথি দুই জনকে লইয়া একটী সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ পার হইল। প্রাঙ্গণের পরই আর একটী প্রবেশদ্বার। সেই প্রবেশদ্বারটীও সে পূর্ব্বের মত শৃঙ্খলবিমুক্ত ও তৎপরে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল।

ইহার পর আর একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণের পরই একটী প্রস্তরময় অধিরোহণী। অধিরোহণী উত্তীর্ণ হইলেই কয়েকটী সজ্জিত প্রকোষ্ঠ।

প্রকোষ্ঠগুলি আলোকজ্জ্বল এবং তাহাদের তলদেশ, ভিত্তিগাত্র মর্ম্মরমণ্ডিত। ভিত্তিগাত্রে, রজত-দীপাধারে, স্থানে স্থানে উজ্জ্বল দীপাবলী।

কক্ষের সজ্জা রাজোচিত। সেই কক্ষের মধ্যে যাহা কিছু সজ্জা ছিল, তাহার সবই বহুমূল্য। গৃহগাত্রে উজ্জ্বল মুকুর। সেই কলঙ্ক-

"প্রফুল্ল ! ব্যাপার কি বুঝিতে পারিতেছ কি ?"—৩৩ পৃঃ।

হীন মুকুরগাত্রে দীপরেখা পড়ায়াতে, যেন লক্ষ লক্ষ হীরক-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে। কক্ষের নানাস্থানে রৌপ্যপাত্রে সযত্নে রক্ষিত পুষ্পস্তবক। কোন স্থানে বা অগুরু ও চন্দনকাষ্ঠচূর্ণ, অগ্নিদগ্ধ হইয়া স্বর্গীয় সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে।

ভৈরব সেই কক্ষগুলির মধ্যে একটীতে প্রবেশ করিয়া, শাহ-জামালকে বলিল, "এই কক্ষ ও ইহার পার্শ্বের কক্ষটী আপনাদের অবস্থান-স্থান। আমি এখনি ভৃত্যদের পাঠাইয়া দিতেছি। আপনারা একটু শ্রান্তি দূর করুন।"

ভৈরব আর কোন কিছু না বলিয়া, সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। শাহ জামাল, তাঁহার সঙ্গী কয়জনকে পার্শ্বের কক্ষে যাইতে আদেশ করিলেন। সেই কক্ষে রহিলেন, কেবল শাহ জামাল আর রোস্তম।

শাহ জামাল বিমর্ষভাবে বলিলেন, "রোস্তম! ব্যাপার কি বুঝিতে পারিতেছ কি?"

"কিছুই না, জনাব!"

"ইহাদের উদ্দেশ্য কি? আতিথেয়তার ছলনায়, আমাদের বন্দী করিবে না ত?"

"বন্দী হইবার আর বাকি কি? দুইটি দ্বার ত ইতঃপূর্ব্বেই শৃঙ্খলিত হইয়াছে।"

"এই রমণী বোধ হয় কোন যাদু জানে।"

"এ কথা বলিতেছেন কেন?"

"যে শাহ জামাল একটু আগে মহাশক্তিশালী সুলতান মামুদের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইয়াছিল, সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই অপরিচিতা রমণীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে! অবনতমস্তকে তাহার আদেশ পালন করিতেছে।"

আর কথা হইল না। ভৈরব পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে চারিজন ভৃত্য। ভৃত্যদের পশ্চাতে চারিজন সুন্দরী দাসী। দাসীদের হস্তে রৌপ্যপাত্রে আহার্য্য-দ্রব্য, আর ভৃত্যগণ, ছয়টী নূতন পোষাক লইয়া আসিয়াছে।

ভৈরব বলিল, "আমাদের মাতাজীর অনুরোধ, আপনারা এখন বেশপরিবর্ত্তন করিয়া ইচ্ছামত আহারাদি করুন। এই গুর্জ্জরের পার্ব্বত্য-প্রদেশে যাহা কিছু সহজপ্রাপ্য, তাহাই সংগ্রহ করা হইয়াছে। ফলমূল, মিষ্টান্ন, পিষ্টক ও দুগ্ধ ব্যতীত আর কিছুই নাই। আজ স্বচ্ছন্দে এই স্থানে নিদ্রা যান। কল্য প্রাতে মাতাজীর সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে।"

ভৈরব আর কিছু না বলিয়া, সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। অতিথিগণ সত্যসত্যই ক্ষুধার জ্বালায় বড়ই কাতর হইয়াছিলেন। ভৈরব যাহা কিছু আনিয়াছিল, সবই দেবভোগ্য আহার্য্য।

আহারান্তে রোস্তম শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গী কয়জন অন্য গৃহে চলিয়া গেল। জাগিয়া রহিলেন, কেবল শাহজাদা শাহ জামাল।

শাহ জামালের চক্ষে নিদ্রা নাই। তাঁহার চিত্তক্ষেত্র ব্যাপিয়া একটা চিন্তার ঝটিকা উঠিয়াছে। তিনি অনুভবেও জানিতে পারিতেছিলেন না যে, এ অদ্ভুত রমণী কে? তাঁহার পাষাণ হৃদয় এ পর্য্যন্ত রমণীর রূপে মুগ্ধ হয় নাই—সে পাষাণ ভেদ করিয়া একটুও স্নেহবারিধারা বহে নাই; কিন্তু আজ তিনি দেখিলেন, তাঁহার সে পাষাণ প্রাণ শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তাহার মধ্য হইতে অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে।

দর্শনে মোহ, মোহে আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্তি, আর সেই

অতৃপ্তিতে হৃদয়ের একটা দারুণ ব্যাকুলতা ও চিত্তের অশান্তি উপস্থিত হয়। শাহ জামালের অদৃষ্টে এ সকলই ঘটিয়াছিল। সুলতান মামুদের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবীর শাহ জামাল, গুজরাটে পদার্পণমাত্রেই একবার প্রকৃতি-সুন্দরীর মোহিনীরূপ দেখিয়া মজিয়াছেন, জড়প্রকৃতি তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তারপর প্রাণময়ী প্রকৃতির বিমলরূপচ্ছায়া তাঁহার হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য বিচলিত, প্রাণ রূপ-মোহের অধীন। তিনি জয় করিতে আসিয়া বিজিত হইয়াছেন, ধরিতে আসিয়া ধরা দিয়াছেন। হায় হায়! কেন তিনি এ মায়াভূমি গুর্জ্জরে পদার্পণ করিয়াছিলেন?

কে এই রমণী! যার দেহে এত রূপ! বাহুতে এত শক্তি! বাক্যে এত মধুরতা! কে সে রমণী—যে মুহূর্ত্তমধ্যে কথার ছলে, বাহুর বলে তাঁহার ও রোস্তমের মত বীরদ্বয়কে অভিভূত করিল।

শাহ জামাল শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। রুদ্ধ বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিয়া দেখিলেন—তখনও প্রকৃতি চন্দ্রকিরণে মধুর হাস্যময়ী। তবে চাঁদ পশ্চিম গগনে ঈষৎ ঢলিয়া পড়িয়াছেন। রজনী প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। শাহ জামাল নিরুপায় হইয়া আবার শয্যা আশ্রয় করিলেন; কিন্তু সেই সুরচিত, শুভ্র, সুখশয্যায় অঙ্গ ঢালিবামাত্র যেন বোধ হইল, কে তাহাতে অনলকণা বিছাইয়া দিয়াছে।

শাহ জামাল মনে মনে ভাবিলেন,—"সুলতানের অন্তঃপুরে রূপসী রমণীর অভাব নাই। এই হিন্দুস্থান হইতেই তিনি অনেক হিন্দু-কন্যাকে জোর করিয়া লইয়া গিয়া গজনীর হারেম রূপপ্রভাময় করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু আজ যাহাকে দেখিলাম, তার মত ত কেহই নয়।"

"কেন আমার এ মতিচ্ছন্ন অবস্থা ঘটিল! কোথায় আমার সে

বীরদর্প! কোথায় আমার সে মন্ত্রপূত অসির গর্ব্ব! কোথায় আমার সে দম্ভ, তেজঃ, অভিমান! আমি না ভারতজয়ী সুলতান মামুদের ভ্রাতুষ্পুত্র! পর্ব্বত-দুর্গ-বেষ্টিত সমস্ত আফ্‌গান-রাজ্যের ভবিষ্যৎ অধিপতি! এত লঘু আমার মন! চিত্ত আমার এত শক্তিহীন! খোদা—মেহেরবান্‌! আমার মন হইতে এ রূপের মোহ দূর করিয়া দাও! আমায় আবার শাহ জামাল করিয়া দাও। আমায় এ মহা প্রলোভন হইতে মুক্ত কর।"

চিন্তা দীর্ঘ সময়কে সংক্ষেপ করিয়া দেয়। সময় প্রকৃত পক্ষে মাপে কম হয় না বটে, কিন্তু যে চিন্তা করে সে অন্ততঃ সেইরূপই ভাবে। কাজেই চিন্তামগ্ন শাহ জামালও সেই রূপ না ভাবিবেন কেন?

নিশা চলিয়া গিয়াছে—উষা আসিয়াছে। পাখী ঘুমাইয়াছিল কিন্তু দিঙ্মণ্ডল সমুজ্জ্বল দেখিয়া, মধুর কাকলীতে প্রকৃতিবক্ষঃ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। নিশাকর অস্ত গিয়াছেন। দিবাকর পূর্ণজ্যোতিতে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছেন। তারকাহারবিভূষিতা প্রকৃতি সুন্দরী, যেন দিবাকরের আবাহনের জন্য বিচিত্র স্বর্ণখচিত বসন পরিশোভিতা হইয়াছেন। অদূরস্থ অনন্ত সলিলসম্পদ্‌ময় সুনীল সমুদ্রের অশ্রান্ত ঊর্ম্মিরাজির উপর, স্বর্ণরাগময় বালার্ককিরণ পড়িয়া তাহা অতি সুন্দর দেখাইতেছে। প্রকৃতির এ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন কিন্তু শাহ জামালের মনে তিলমাত্র আনন্দোৎপাদন করিতে পারিতেছিল না। সুখ মনে—নয়নে নয়।

শাহ জামাল শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন। রোস্তমের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন, সে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে তাঁহার যে কয়জন অনুচর ছিল, তাহাদের মধ্যে যে প্রধান, সে আসিয়া বলিল, "জনাব! খোদা আপনার

মঙ্গল করুন। আপনার প্রাতঃকৃত্যের জন্য ভৃত্যগণ সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া হুকুমের অপেক্ষা করিতেছে।"

এই কথা শেষ না হইতে হইতে ভৈরব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সসম্ভ্রমে মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিল, "রাণীজী জানিতে চাহিতেছেন—রাত্রে কোনরূপে আপনাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় নাই ত?"

শাহ জামাল চমকিতভাবে বলিলেন, "রাণীজী! রাণীজী কে? গুর্জ্জর-রাজকন্যা?"

"হাঁ—গুর্জ্জর-রাজকন্যা।"

"তিনিই কি কাল আমাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন?"

"আশ্রয় কে কাকে দেয় জনাব! আশ্রয় ভগবান্ সোমনাথের। তবে তিনি উপলক্ষ্য-মাত্র বটে।"

"তাহা হইলে গতরাত্রে যিনি আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনিই গুর্জ্জর-রাজকন্যা? তিনিই ভারত-বিশ্রুত সৌন্দর্য্যশালিনী রাজকন্যা কমলাবতী?"

"যার নাম সন্তানে ধরে না—হাঁ, তিনিই সেই।"

"তাঁহাকে আমার সম্মানপূর্ণ অভিবাদন জানাইয়া বল গিয়া, আমরা তাঁহার আতিথ্যে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন আমরা বিদায় চাহিতেছি।"

"তিনি গতরাত্রে আপনাদের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিবার জন্যই আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। অগ্রে আপনারা প্রাতঃকৃত্য সারিয়া প্রাতরাশ শেষ করুন। সমস্তই পাশের ঘরে প্রস্তুত। আমি সৈন্যদের সজ্জিত হইতে বলি।"

"সৈন্যের কি প্রয়োজন!"

"রাণীজীর ইচ্ছা, গুজরাটের সীমান্ত পর্য্যন্ত কয়েকজন সৈন্য আপনাদের সঙ্গে যাইবে।"

"কারণ কি?"

"পাছে পথে আপনাদের কোন বিপদ্ ঘটে।"

"রাণীজীকে এজন্য ধন্যবাদ করিতেছি। আমরা তাঁহার মহত্ত্বে বাধিত হইলাম।"

"রাণীজী বলেন, যদি আপনাদের কোন বাসনা থাকে, তাহাও তিনি পূর্ণ করিতে প্রস্তুত।"

শাহ জামাল এতক্ষণ অন্ধকারময় পথে চলিতেছিলেন। মোহাবিষ্ট জীবের ন্যায় কেবল প্রশ্নের উত্তর করিয়া যাইতেছিলেন। ভৈরবের কথায় যেন তাঁহার চক্ষু খুলিল। তিনি মনে মনে কি ভাবিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, "গুর্জ্জরের আতিথেয়তাকে ধন্যবাদ করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থানের পূর্ব্বে, আমি আপনাদের রাণীজীর নিকট একটি অনুগ্রহের প্রার্থী।"

ভৈরব এ অদ্ভুত প্রস্তাবে একটু প্রমাদ গণিল। যখন কথাটা বলিতে এত বাধ-বাধ ভাব, তখন বক্তার মনের উদ্দেশ্য বোধ হয় ভাল নয়। তবুও সে মনোভাব চাপিয়া রাখিয়া বলিল, "বলুন,—আপনার অভিলাষ কি? আমি রাণীজীকে তাহা জানাইব।"

"আমার ইচ্ছা—আমাদের প্রস্থানের পূর্ব্বে, যদি তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের বিদায় দেন!"

"তাহা অসম্ভব।"

"কেন? তিনি ত গত রাত্রে আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন!"

"সেটা কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে।"

"আমরা অতিথি হইলেও আমন্ত্রিত। আমরা মুসলমান। আমা-

"গুর্জ্জরের রাণী আমন্ত্রিত অতিথির সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন না"—২৯ পৃঃ

The Emerald Ptg. Works.

দের দেশে আমন্ত্রিত অতিথিদের আমরা সাধারণ অতিথির অপেক্ষা অধিক সম্মান দেখাইয়া থাকি। দেখিতেছি গুর্জ্জররাজকুমারী, শিষ্টাচারের আদর্শ নন। বুঝিলাম শ্রেষ্ঠ অতিথিকেও তিনি অপমান করিতেও অভ্যস্ত।"

ভৈরবের মুখ এ কথায় লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। তাহার ধমনীমধ্যে প্রবলবেগে শোণিতস্রোত বহিতে লাগিল। তাহার দক্ষিণ হস্ত অসিকোষ স্পর্শ করিল।

এই সময়ে আর এক অদ্ভুত কাণ্ড! কে যেন পশ্চাৎ হইতে ভৈরবের এ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, দ্রুতপদে তাহার নিকটে আসিয়া তাহার গা টিপিয়া কি ইঙ্গিত করিল। পরে মৃদুস্বরে বলিল, "স্থির হও ভৈরব! এখন ক্রোধের সময় নয়।"

ভৈরব মুখ ফিরাইয়া দেখিল—তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাহার জননী। গুর্জ্জরবাসীর ইষ্টদেবী—রাজকন্যা কমলাবতী। কমলাবতীর মুখমণ্ডল ঈষৎ অবগুণ্ঠনে আবৃত।

কমলাবতী বলিলেন, "জনাব! আপনি গুর্জ্জরের আতিথ্য ধর্ম্মে কলঙ্ক অর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাই আমি আসিয়াছি। মনে রাখিবেন—গুর্জ্জরের রাণী আমন্ত্রিত অতিথির সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন না।"

শাহ জামাল, মেঘাবৃত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, সেই অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিলেন। সেই সুন্দর মুখখানি সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু সেই সুন্দর দেহের চারিদিক্ হইতে যে সমুজ্জ্বল রূপপ্রভা বাহির হইতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

কমলাবতী দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"আমি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না। আমার পূজার সময় নিকটবর্ত্তী। যদি আম্মাদের

কোনরূপ ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা হইলে মার্জ্জনা করুন। কিন্তু আর কখনও ছদ্মবেশে এরূপভাবে গুর্জ্জরে প্রবেশ করিবেন না। করিলে আপনাদের সমূহ বিপদ্ উপস্থিত হইবে।”

এই কথা বলিয়া কমলাবতী দ্রুতপদে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। যেন একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সেখান হইতে সহসা সরিয়া গেল। শাহ জামাল মন্ত্রমুগ্ধ।

রোস্তম বলিল, “শাহজাদা! বৃথা বিলম্ব করিতেছেন কেন?”

শাহ জামাল চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, “চল—চল রোস্তম!”

তাঁহারা দুইজনে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। ভৈরব তাঁহাদের পশ্চাতে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

“কাজটা কি ভাল হইল মা?”

“মন্দই বা হইল কি ভৈরব?”

“মুসলমান আমাদের চির-শত্রু। বিশেষতঃ যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা বাজে লোক নয়।”

“হউক, কিন্তু তাহারা ত আমাদের অতিথি!”

“বোধ হয়, শীঘ্র একটা বিভ্রাট ঘটিবে।

“কিসে জানিলে?”

“শাহ জামাল নিজে গুজরাট আক্রমণ করিবে।”

“কিসে বুঝিলে?”

“তাহাদের কথোপকথনে বুঝিয়াছি।”

"গুর্জ্জরবাসীও হীনবল নহে। সেনাপতি কুমারসিংহের বাহু শক্তি-হীন নহে। ভৈরব! গুর্জ্জরের কোন অনিষ্টই হইবে না।"

এমন সময়ে কে একজন পশ্চাদিক্ হইতে বলিয়া উঠিল, "সত্যই কমলা, গুর্জ্জর শক্তিহীন নহে, গুর্জ্জরের কোন অনিষ্টই হইবে না।"

কমলা মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্দৃষ্টি করিল। দেখিল—পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কুমারসিংহ তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

কমলার স্বভাবলোহিত সুকোমল গণ্ডস্থল কুমারসিংহকে দেখিয়া গভীর আরক্তবর্ণ ধারণ করিল। কমলা বলিল, "কুমার! আমাদের যে বড়ই বিপদ্ উপস্থিত!"

ভৈরব তখন সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। কুমার ও কমলা দুইজনে সেই কক্ষে। কুমার বলিল, "হউক না বিপদ! সুলতান মামুদ জীবিত থাকিতে বিপদের ত অভাব হইবে না কমলে? কিন্তু জানিও আমি এরূপ বিপদ্ই খুঁজিয়াই বেড়াইতেছি।"

কমলা বিস্ময়বশে মুখ তুলিয়া কুমারসিংহের দিকে বিলোলদৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কেন?"

কুমার বলিল, "মনে কি নাই কমলা? সোমনাথের মন্দিরে দাঁড়াইয়া কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি! তুমিও কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ! বিপদ্ উপস্থিত না হইলে ত কুমারসিংহের বাহুর শক্তি কেহ দেখিতে পাইবে না। আর তাহা না হইলে গুর্জ্জররাজকন্যা কমলাবতী—"

"এখন ও সব সুখকল্পনার সময় নয়—কুমারসিংহ! মনে রাখিও, তুমি গুর্জ্জরের অভিষিক্ত সেনাপতি। বৃদ্ধ পিতা, তোমার উপরই সমস্ত নির্ভর করিয়াছেন।"

"স্থির জানিও কমলা! এ জীবন থাকিতে ন্যস্ত-কর্ত্তব্যের অপ-ব্যবহার হইবে না; কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি?"

"আমার কাছে তোমারও কোন সঙ্কোচই নাই। স্বচ্ছন্দে বলিতে পার।"

"এই যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যু হয়?"

"পরলোক আছে ত কুমার! সেখানে গিয়া তোমার সহিত মিলিব।"

"শুনিয়া সুখী হইলাম! আর একটা কথা।"

"কি?"

"তোমার জন্যই বোধ হয় মামুদ গুর্জ্জর আক্রমণ করিবেন?"

"কিসে জানিলে?"

"তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জামালখাঁ নিশ্চয়ই সেনাপতি হইয়া আসিবে। জামালখাঁ তোমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রূপ দেখিয়া উন্মত্ত। অদ্য প্রভাতে সে অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তোমার রূপজ্যোতিঃ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছে।"

"তুমি কি করিয়া এ কথা জানিলে?"

"ভৈরব আমায় বলিয়াছে! ভৈরব তাহাদের সঙ্গে অনেক দুর গিয়াছিল। তাহাদের কথোপকথনের মধ্যে, বহুবার তোমার নামোচ্চারিত হইয়াছিল।"

কথাটা শুনিয়া কমলাবতীর মনে একটা আতঙ্ক হইল। তাহার ছার রূপের মূল্য কি এত বেশী যে, তাহার জন্য তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জন্মভূমি গুর্জ্জরের সর্ব্বনাশ হইবে?

কমলাবতী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল, "কুমার! সে জন্য ভয় করি না। রাজপুত-কন্যা আমি! প্রয়োজন হইলে, আমরা চিতাগ্নিকে চন্দন-প্রলেপের ন্যায় স্নিগ্ধ জ্ঞান করি।"

কুমারসিংহ এ কথা শুনিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল। সে তাহার ইন্দীবর-নেত্রে দুই বিন্দু অশ্রু লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

কমলাবতী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে, ঊর্দ্ধমুখে, সজলনেত্রে কম্পিতহৃদয়ে বলিল, "হে স্বয়ম্ভূ! হে সোমনাথ! সহস্র কমলাবতী যদি গুর্জ্জরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কালস্রোতে ভাসিয়া যায় যাউক, তাহাতে কোন ক্ষতিই নাই! কিন্তু দেখিও প্রভু! কুমারসিংহ যেন গুর্জ্জরের সম্মানরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সিন্ধুদেশে, সমুদ্রতীর হইতে দশক্রোশ দূরে সুলতান মামুদ এক ক্ষুদ্র নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান করাচি-বন্দর হইতে আট ক্রোশের মধ্যে, এখনও একটী স্থান "মামুদবাদ" বলিয়া পরিচিত। এই মামুদাবাদেই, সুলতান মামুদ একটি অস্থায়ী রাজপুরী, গঞ্জ, বাজার ও একটি ক্ষুদ্র রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করা, সুলতান মামুদের আন্তরিক উদ্দেশ্য ছিল না। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ভারতকে লুণ্ঠন করিয়া, ধনরত্ন সংগ্রহ করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতের ঐশ্বর্য্য-প্রবাদ, বহুদিন হইতেই তাঁহার চিত্তে একটা মহা বিপ্লব ও দুষ্ট আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া, তিনি প্রচুর ধনসঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহার রাজধানী গজনী, ভারতেরই ঐশ্বর্য্যে অলকাপুরীর মত শোভা ধারণ করিয়াছে; কিন্তু তখনও তাঁহার লুণ্ঠনাশা চরিতার্থ হয় নাই।

সোমনাথের ঐশ্বর্য্য-প্রবাদ বহুদিন হইতেই তিনি শুনিয়া আসিতে-ছিলেন; কিন্তু সোমনাথ-লুণ্ঠনের কোন সুযোগই তিনি এ পর্য্যন্ত পান

নাই। সোমনাথ, গুর্জ্জর-রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। গুর্জ্জরপতি—মহা-পরাক্রান্ত। যাহাতে একটীও মুসলমান তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য তিনি সতর্কতা অবলম্বনের কোন ত্রুটিই করেন নাই। তাঁহার সেনাপতি কুমারসিংহের বাহুবলেই গুর্জ্জর তখনও সুরক্ষিত। গুর্জ্জররাজের পুত্রাদি হয় নাই, কেবল একমাত্র কন্যা এই কমলাবতী। কমলাবতী রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, শক্তিতে—আদ্যা সতী। কুমারসিংহ তুমার-বংশীয় উচ্চকুলোদ্ভূত রাজপুত। সমরে কুমারসিংহ—চিরদিনই অজেয়। বৃদ্ধ গুর্জ্জররাজের মনের বাসনা এই, কুমারসিংহকে জামাতা করিয়া এই গুর্জ্জর-রাজ্য তাহাকেই সমর্পণ করিবেন। কিন্তু বহিঃশত্রু তখন গুর্জ্জরের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে—এজন্য গুর্জ্জর-রক্ষাই তাঁহার প্রথম চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল।

গুর্জ্জরের স্বাধীনতা লোপ করিতে পারিলে, সোমনাথ অতি সহজেই তাঁহার করায়ত্ত হইবে ভাবিয়া, সুলতান দুই দুই বার গভীর বনপথের মধ্য দিয়া, গুর্জ্জরের সেনাবল ও আভ্যন্তরিণ শক্তি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য-সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা আর তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসে নাই। ইহাতে সুলতান সিদ্ধান্ত করিলেন—নিশ্চয়ই তাহারা গুর্জ্জরবাসীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে!

এই জন্যই তিনি মামুদাবাদ প্রাসাদ হইতে সমুদ্রপথে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রও এবং দক্ষিণ বাহু, তাঁহার সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অধিকারী, শাহজাদা শাহ জামালকে, গুর্জ্জরে পাঠাইয়া দেন। শাহ জামালের সঙ্গে তাঁহার অন্যতম সেনাপতি, রোস্তম খাঁও প্রেরিত হন। তাঁহারা হিন্দু-বণিকের ছদ্মবেশে, বিনা বাধায় গুর্জ্জরে প্রবেশ করেন। ইহার পর যাহা কিছু হইয়াছে, পাঠক তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছেন।

কমলাবতীর আদেশে, ভৈরব তাঁহাদিগকে এক নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া গুর্জ্জরে ফিরিয়া আসিয়াছে। পথিমধ্যে, সে শাহ জামাল ও রোস্তমের কথোপকথন-প্রসঙ্গে, বহুবার 'কমলাবতী'র নামোল্লেখ হইতে শুনিয়াছিল। তাহারা পুস্তভাষায় কথোপকথন করিতেছিল—কাজেই সে তাহার কোন মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে নাই।

যে কমলাবতী, গুর্জ্জরের জাগ্রত শক্তি, প্রত্যক্ষ দেবী, যে কমলাবতী তাহার মা—তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জন্মভূমি গুর্জ্জরের মা—তাঁহার পবিত্র নাম এই শয়তানদের মুখে বহুবার উচ্চারিত হইতে শুনিয়া, ভৈরব মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইল! সে একবার মনে ভাবিল, যে মাঝিদিগকে ইহাদের পরিচয় দিয়া নৌকাখানি সমুদ্রে ডুবাইয়া দিই। গুর্জ্জরের দুইটি প্রবল শত্রুর জীবন্ত-সমাধি হউক। কিন্তু তাহার হৃদয়মধ্যে তখনও সেই মাতৃ-আজ্ঞা মৃদু প্রতিধ্বনি করিতেছিল,—"দেখিও ভৈরব! ইঁহাদের যেন কোন অনিষ্ট না হয়। ইঁহারা গুর্জ্জরের শত্রু হইলেও আমার অতিথি।"

এই জন্যই ভৈরব মনের জ্বালা মনেই মিটাইল। সে নির্ব্বাক্ভাবে তাহাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া, প্রতিবিধিৎসাবৃত্তিকে দমন করিয়া, নিরাশ চিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু সে মনে মনে বুঝিল, শীঘ্রই একটা আগুন ধরিবে। সে আগুন ধরিবার অব্যবহিত কারণ, সোমনাথের লোক-বিশ্রুত ঐশ্বর্য্য নহে—কমলাবতীর অতুলনীয় রূপ রাশি। শাহ জামাল বুকের ভিতর তীব্র অগ্নিকণা পূরিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই স্ফুলিঙ্গ একটু বলসঞ্চয় করিলেই, একদিন ভীষণ অনর্থ উপস্থিত হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রোস্তমের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; কিন্তু তাহার শরীরে এখনও যুবার শক্তি বর্ত্তমান। শাহ জামালকে সে বাল্যকালে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে। সে আগে সুলতানের পুরীরক্ষক ছিল, এখন সেনাপতি হইয়াছে। ভারতে সে বহুবার সুলতানের বাহিনী-সমূহের অধিনায়ক হইয়া আসিয়াছিল। সে হাতে-কলমে হিন্দুর বাহুর শক্তির প্রমাণ পাইয়া গিয়াছে। সুলতান মামুদ, তাহাকে একান্ত বিশ্বাস করেন। শাহ জামাল ভবিষৎ সুলতান, এজন্য সে তাহাকে সুলতানের মতই সম্মান করে।

শাহ জামাল, মনে মনে বুঝিলেন, রোস্তমের সহিত বিবাদ করিয়া তিনি কাজটা ভাল করেন নাই। একটা মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ত ফিরাইবার উপায় নাই। পথিমধ্যে, নানাবিধ মিষ্ট কথায় তিনি রোস্তমকে প্রসন্ন করিলেন। রোস্তম, শাহ জামালকে আন্তরিক স্নেহ করিত। তবে দুই জনেই পাঠান; দুইজনের ধমনীতে উষ্ণ শোণিতস্রোত প্রবাহমান। এইজন্য রোস্তমকে প্রসন্ন করিবার জন্য, শাহ জামালকে একটু বেশী কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ইহার একটা বিশেষ কারণও ছিল।

মামুদাবাদের এক নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া, রোস্তম ও শাহ জামাল নিবিষ্টচিত্তে কথোপকথন করিতেছিল। তাহারা রাজপুরীতে পৌছিয়াই শুনিল—সুলতান মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। কাজেই তাহারা তাঁহার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় রহিল।

শাহ জামাল বলিল,—"রোস্তম সাহেব! আমার বেয়াদবি মার্জ্জনা করিয়াছ ত?"

রোস্তম বলিল,—"জনাবের এখনও ছেলেমানুষি যায় নাই; তাই ওরূপ একটা বাজে ব্যাপার ঘটিয়া গেল। যাক্—আমি কিন্তু সেটা মন হইতে একাবারে মুছিয়া ফেলিয়াছি। হুজুরালি আমার বুকে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিলেও আমি জনাবকে মার্জ্জনা করিতাম।"

শাহ জামাল বলিলেন,—"তুমি আমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর রোস্তম, আমাদের মধ্যে যে বিবাদ হইয়াছিল সে কথা সুলতানকে বলিবে না।"

রোস্তম।—জীবনে কখনও মিথ্যা বলি নাই; কিন্তু আপনার জন্য তাহাও করিব। অথচ এ সব কথা শুনিলে সুলতান আপনার [illegible] বড়ই ক্রুদ্ধ হইবেন, তাঁহার ক্রোধে জনাবালির বিপদও ঘটিতে পারে।"

শাহ জামাল। রোস্তম! সুলতানের আদেশ পালন করিতে এখন আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ!

রোস্তম। তাহা হইলে গুর্জ্জর আক্রমণ করিবেন নাকি?

শাহ জামাল। নিশ্চয়ই!

রোস্তম। জনাব! দুই দিন আগে যে আপনি গুর্জ্জরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন! সুলতানের আদেশের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন!

শাহ জামাল। এখন আর আমার সে অবস্থা নাই।

রোস্তম। কেন শাহজাদা! কমলাবতীর জন্য?

শাহ। সত্যই তাই রোস্তম!

রোস্তম। কিন্তু গুর্জ্জরকে একবারে ধ্বংস না করিলে ত কমলাবেগমকে পাইবেন না। একজনও গুর্জ্জরী যতক্ষণ জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ ত আপনি নিরাপদ নহেন।

শাহ। গুর্জ্জরকে একেবারেই শ্মশান করিব! একদিন যে

গুর্জ্জরের নয়নমোহন সৌন্দর্য্য দেখিয়া, সেই স্বর্গোপম ভূমিকে প্রাণের সহিত পূজা করিয়াছিলাম—এবার তাহাকে ভীষণ প্রেতভূমিতে পরিণত করিব।

রোস্তম। কমলা বেগম কি এতই সুন্দরী?

শাহ। তুমি অসিব্রতধারী রুক্ষপ্রকৃতির সৈনিক। তুমি সে রূপের মূল্য কি বুঝিবে রোস্তম?"

রোস্তম। কিন্তু হিন্দুর মেয়ে কি সহজে ধরা দেয় সাহেব?

শাহ। যে উপায়ে পারি, তাহাকে ধরিব। তাহাকে আপনার করিব।

রোস্তম। অসার কল্পনা! ইন্দ্রিয়ের ঘোর বিকার! মোহের প্রবল অভিব্যক্তি! কিন্তু বোধ হয়, আপনি গুর্জ্জরজয় করিতে পারিবেন না!

শাহ। কেন?

রোস্তম। বিক্রমশালী কুমারসিংহ যে গুর্জ্জরের সেনাপতি!

শাহ। তুমি তাহাকে চেন না কি?

রোস্তম তাহার আচ্‌কান খুলিয়া শাহ জামালকে তাহার বাহুমূলস্থ একটি শুষ্ক ক্ষতস্থান দেখাইয়া বলিল—"এই কুমারসিংহ, গুর্জ্জর-রাজকর্তৃক এক সময়ে সেনাপতিরূপে উজ্জয়িনীতে প্রেরিত হয়। এই যে আঘাতের চিহ্ন দেখিতেছেন, তাহা কুমারসিংহের অসিবলেই হইয়াছে। সে আঘাত এত শক্তিময়, এত অব্যর্থ, যে তাহা আমাকে বড়ই অধীর করিয়াছিল।"

শাহ। আর আমি যে কেবলমাত্র এক খানি ক্ষুদ্র তরবারির সহায়তায় একটা ক্ষিপ্ত, জীবন্ত ব্যাঘ্রের উদর বিদীর্ণ করিয়াছিলাম—সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ রোস্তম?

রোস্তম কি একটা বলিতে যাইতেছিল। এমন সময়ে সুলতান মামুদ সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রোস্তম ও শাহ জামালের মুখ শুকাইল। তাহারা সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সুলতানকে কুর্ণীশ করিল।

সুলতান বলিলেন, "শাহজাদা! গুর্জ্জরের সংবাদ কি?"

জামাল আর একটি কুর্ণীশ করিয়া বলিল, "জাঁহাপনা! সংবাদ অতি শুভ।"

"গুর্জ্জরপতির সেনাবল কত?"

"আমাদের তুলনায় অতি কম।"

"গুর্জ্জর ধ্বংস করিতে তুমি কত সেনা চাও?"

"দশ হাজার।"

"দশ হাজার! অসম্ভব! তোমাকে দশহাজার, আর রোস্তমকে পাঁচ হাজার সেনা দিলে, আমার বাহুবল শিথিল হইবে।"

"গুর্জ্জরী সেনা অতি সুশিক্ষিত।"

"শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, সে আফগান সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নায়ক এখনও তাঁহার পাঠান সেনাদের শক্তিতে অবিশ্বাসী।"

"সম্রাট্! আপনার এ তিরস্কার নীরবে সহ্য করিলাম! আমি পাঁচ হাজার সেনা লইয়াই একাকী যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে প্রস্তুত।"

"কিন্তু পরাজয় ও অযথা সেনানাশের দণ্ড কি তা কি জান?"

বোধ হয় খোদার আশীর্ব্বাদে, আমায় সে দণ্ডভোগ করিতে হইবে না। মৃত্যু-পণ করিয়া, গুর্জ্জর আক্রমণ করিব। বাঁচি—জয়মাল্য গলায় পরিয়া ফিরিয়া আসিয়া, সুলতানের চরণে প্রণত হইব। না পারি, সেই শৈলমালাবেষ্টিত গুর্জ্জরেই আমার নির্জ্জন সমাধি রচিত হইবে।"

শাহ জামালকে সুলতান পুত্রাধিক স্নেহে পালন করিয়াছেন! কাজেই এ কথা শুনিয়া তিনি একটু মর্ম্মপীড়িত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন,—"শাহ জামাল! আমি তোমাকে দশ হাজার সেনাই দিব! কিন্তু রোস্তম ইহার মধ্য হইতে দুই হাজার সেনা লইয়া তোমার পার্শ্ব রক্ষা করিবে।"

"জাঁহাপনার হুকুম শিরোধার্য্য।"

"তাহা হইলে কালই যুদ্ধযাত্রা কর।"

"তাহাই করিব।"

"আর একটা কথা—গুর্জ্জরপতিকে বন্দী করিয়া আমার নিকট পাঠাইবে। জীবিত না ধরিতে পার—সেই বৃদ্ধ শয়তানের ছিন্ন মুণ্ড যেন মামুদাবাদে আসে।"

"সাধ্যমতে জাঁহাপনার আদেশ পালিত হইবে।"

"আর এক কথা—"

"অনুমতি করুন।

"শুনিয়াছি, গুর্জ্জরের রাজকন্যা কমলাবতী শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। আমি তাহাকে বেগম করিতে চাই। প্রহরিবেষ্টিত করিয়া, সুলতানের পত্নীর সমযোগ্য সমাদরে, তাঁহাকে এখানে পাঠাইবে! গুর্জ্জররাজকোষ লুণ্ঠিত করিয়া, একটি কপর্দ্দকও না পাও, তাহাতে কোন ক্ষতিই নাই, কিন্তু এ রমণীরত্নকে আমি চাই।"

শাহ জামালের মাথায় যেন সহসা বজ্রাঘাত হইল! তাহার প্রাণের মধ্যে সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের যাতনা উপস্থিত হইল! সুলতানের মুখে একি সর্ব্বনেশে কথা।

কিন্তু ফিরিবার পথ আর ত নাই। কাজেই, মনের ভিতর যে

একটা প্রবল ঝড় উঠিতেছিল, তাহার শক্তি সংযত করিয়া শাহ জামাল বলিল,—

"এ বান্দা সুলতানের আদেশপালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।"

সুলতান আর কিছু না বলিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। শাহ জামাল ঘোর চিন্তামগ্ন। একটু পূর্ব্বে তাঁহার চিত্ত যে একটা অতি উজ্জ্বল আশার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সে আশা তখন অন্ধকারময় নিরাশায় পরিণত! তাঁহার সাধের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। গুর্জ্জর-জয়ে ইতোপূর্ব্বে তাঁহার প্রাণে যে একটা সাহস, উদ্দীপনা আসিয়াছিল, তাহা যেন ছায়াবাজির ছায়ার মত সরিয়া গেল।

শাহ জামাল মলিনমুখে নিরাশাব্যঞ্জক স্বরে ডাকিলেন,— "রোস্তম!"

রোস্তমও সুলতানের মুখে এই সব কথা শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছিল। কাজেই রোস্তম বিষণ্ণমুখে বলিল,—"হুকুম জনাবালি?"

শাহ জামাল। তাহা হইলে আমি কমলাবতীকে পাইব না!

রোস্তম। স্বয়ং সুলতান মামুদ যার রূপের জন্য লালায়িত, তার রূপের মূল্য কত বেশী, জনাব তাহা কি অনুমানেও বুঝিতেছেন না।"

শাহ জামাল মনে মনে কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। তৎপরে বলিলেন, "প্রস্তুত হও গে রোস্তম! আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক, আমি সুলতানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুপ্তপ্রণিধি ভৈরব, দ্রুতপদে হাঁফাইতে হাঁফাইতে, কমলাবতীর কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া বিকৃতকণ্ঠে ডাকিল,—"মা! মা!"

কক্ষদ্বার আবদ্ধ ছিল। কমলা ত্বরিতপদে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন,—"ভৈরব।"

ভৈরবের মুখের অবস্থা দেখিয়া কমলা বড়ই ভয় পাইলেন। ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপার কি?"

"সর্ব্বনাশ উপস্থিত!"

"কিসের সর্ব্বনাশ?"

"মুসলমান সেনা গুর্জ্জরের অতি নিকটে।"

"সে সেনার পরিমাণ কত?"

"বোধ হয় বিশ হাজার!"

"বি—শ—হা—জা—র!"

"হাঁ মা! বেশী হইবে ত কম নয়।"

"তাহা হইলে গুর্জ্জর রক্ষা করা যে ভার হইবে! গুর্জ্জরের সেনা-সংখ্যা যে দশ হাজারের বেশী নয়—ভৈরব!"

"তাই ত ভাবিতেছি মা! গুর্জ্জর যা'ক্—গুর্জ্জরের, সর্ব্বস্ব যা'ক্ তোমায় কি করিয়া বাঁচাইব?"

"অবোধ মূর্খ সন্তান! এখনই কি ভুলিয়া গেলে যে আমি রাজপুত রাজকন্যা! তুমিও রাজপুত! মৃত্যু ত আমাদের ক্রীতদাস! যা'ক্ শত্রু এখন কতদূরে?"

"নগর হইতে চারিক্রোশ দূরে। সেখানে এক প্রান্তর মধ্যে তাহারা ব্যূহ রচনা করিতেছে।"

"পিতা কোথায় ?"

"তিনি সমস্ত গুর্জ্জরী সেনা সংগ্রহ করিয়া এখানে আসিতেছেন। তিনি বলেন, "সোমনাথের চরণতলে আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ করিব। সোমনাথই আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করিবেন।""

কমলা ঊর্দ্ধনেত্রে, যুক্তকরে, কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, "ভগবান্! সোমনাথ! কি হইবে প্রভু? কি করিলে প্রভু?"

সহসা এই সময়ে, কুমারসিংহ বর্ম্মাবৃত দেহে যোদ্ধবেশে, সেই স্থানে দেখা দিলেন।

কমলাবতী কুমারসিংহের হাত দুইখানি উত্তেজনাবশে দৃঢ় নিষ্পেষিত করিয়া বলিলেন, "কি হইবে কুমার?"

কুমারসিংহ উৎসাহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কিসের ভয় কমলা! স্বয়ং স্বয়ম্ভু আমাদের পৃষ্ঠ-পোষক। এ সোমনাথ-পীঠে, তিনি জাগ্রত মহাকালরূপে বিরাজিত। আর সাক্ষাৎ শক্তিময়ী তুমি যখন বর্ত্তমান, তখন কিসের ভয়! তুমি আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও।"

কমলা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল, "কুমার! কি যে বলিব, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। কি যেন এক ভবিষ্যৎ দুর্নিমিত্ত কল্পনায় চিত্ত অধীর হইয়া উঠিতেছে। কে যেন আমার প্রাণের মধ্য হইতে বলিয়া দিতেছে, "কুমারকে চিরদিনের জন্য বিদায় দাও।" হায়! আমি সর্ব্বনাশীই যে এই অনর্থের মূল! কেন সেই শয়তান শাহ-জামালকে অতিথিরূপে আশ্রয় দিয়াছিলাম!"

কুমার বলিল, "কমলা! এখন রোদনের সময় নয়, বিরহবিধুরতা-জনিত উচ্ছ্বাসময় আক্ষেপের সময় নয়! আমায় হাস্যমুখে বিদায় দাও কমলা! তোমার হাসি মুখের শক্তিতে, আমি যে রণক্ষেত্রে একাই একশত হইব।"

কমলা আবার চোখ মুছিল! সে কিছুতেই তাহার মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার প্রাণের চারিদিক্ ব্যাপিয়া একটা অশুভ কল্পনা থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল! ওঃ! সে কল্পনার অভিব্যক্তি যে অতি ভীষণ!

কুমারসিংহ স্বহস্তে কমলার সেই কমলনেত্রদ্বয় মুছাইয়া দিল। তারপর বিষণ্ণমুখে বলিল, "কমলা! যুদ্ধে জয়, পরাজয় দুইই আছে। প্রত্যাবর্ত্তন ও মৃত্যু, দুইই সম্ভব! মুসলমান বিজেতাদের বিশ্বাস নাই। বিশেষতঃ আমি শুনিয়াছি, তোমাকে আয়ত্ত করিবার জন্যই এই যুদ্ধ উপস্থিত। যদি কিছু বিপদ্ ঘটে, তাহা হইলে আত্মরক্ষার সময় পাইবে না। আমি আমার প্রাণের অগাধ স্নেহ প্রেম, আর সেই সঙ্গে এই বিষটুকু তোমাকে দিয়া গেলাম। প্রয়োজন বুঝিলে, ইহার সদ্ব্যবহার করিও। যখন শুনিবে আমি মরিয়াছি—তোমার পিতা স্বর্গগত, তখন মনে বুঝিও—দেবতাও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই হলাহলই তোমার নারী-সম্মান রক্ষা করিবে।"

কুমারসিংহ আর কিছু না বলিয়া, কাগজে মোড়া সেই সাংঘাতিক বিষটুকু, কমলাকে শেষ প্রেমোপহাররূপে দিয়া, সেই স্থান হইতে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে প্রস্থান করিল।

আর ভৈরব! সে কুমারসিংহকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই—তাহার নিজের ডেরায় চলিয়া গিয়াছিল। কুমারসিংহ নিষ্ক্রান্ত হইবার পরই সে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দিন গেল। সন্ধ্যা হইল। ভাগ্যবিপ্লবে—গুর্জ্জরসেনা পাঠান হস্তে পরাজিত। তপনদেব যেন গুর্জ্জরের এ পরাজয়-কলঙ্ক সহ্য করিতে না পারিয়া, ক্রোধে লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়া আকাশপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িলেন।

প্রান্তরের চারিদিক্ ব্যাপিয়া হত, আহত, মৃতের দেহরাশি। কেহ মরিতেছে—কেহ মরিয়াছে—কেহ ছিন্নমুণ্ড, কেহ বক্ষোবিদ্ধ, কাহারও বা ছিন্নপদ—কাহারও বা ছিন্নহস্ত। এই সব প্রেতমূর্ত্তি ও কবন্ধরাশি লইয়া বহুদূর বিস্তৃত সেই প্রান্তর, শোণিতরেখা বুকে ধরিয়া এক বিভীবিকাময় শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

সেদিন আর সোমনাথের সান্ধ্য-আরতি হইল না। দেব-মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা-রবে, পুরোহিতদিগের শিবস্তোত্রপাঠের গুরু-গম্ভীর ধ্বনিতে, দিগন্ত মুখরিত হইল না। সেই স্তোত্রপাঠের তীব্র প্রতিধ্বনি, সেদিন আর গর্জ্জনকারী সাগর-তরঙ্গ অঙ্গে মিশাইল না। সোমনাথ শ্মশান ভালবাসেন বটে, কিন্তু এ শ্মশানে ত চিতাভস্ম নাই—আছে তাঁহার একান্ত ভক্ত গুর্জ্জরবাসীর হৃদয়-শোণিত!

রজনী ক্রমশঃ গভীরা হইতেছে। জীবিত বলিয়া, সে শ্মশানক্ষেত্রে কেহ নাই। গুর্জ্জরীদের পরাজয়ে, বৃদ্ধ গুর্জ্জরপতির নিধনে নগর মহাশ্মশান হইয়াছে। কিন্তু গুর্জ্জরসেনাপতি কুমারসিংহ কোথায়? তাহার ত কোন সন্ধানই নাই!

কমলাবতী পিতার মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তৎপরে নিজের জন্য চিতা রচনা করিয়া কুমারসিংহের মৃতদেহ অনু-সন্ধানের জন্য সেই মহাশ্মশানে প্রেতিনীর ন্যায় ঘুরিতে লাগিলেন! কোথায় কুমার! কই কুমার! কেহই ত বলিয়া দেয় না!

পশ্চাতে মশালহস্তে ভৈরব! ভৈরব প্রত্যেক মৃতদেহের মুখের কাছে মশাল ধরিতেছে—আর নিরাশপূর্ণ স্বরে, মলিনমুখে বলিতেছে, "মা, এ দেহ ত নয়!"

সমীরণ, যেন হা-হুতাশ করিয়া বলিতেছে,—"কুমারসিংহ আর নাই।" প্রান্তরভূমির নানাস্থানে অবস্থিত, বিটপীপুঞ্জের শ্যামল পত্রগুলি যেন অস্ফুটস্বরে বলিতেছে, "কুমারসিংহ ত আর নাই।" চন্দ্রহীন ও মেঘশূন্য আকাশের, স্তিমিত তারকা-রাশি সমস্বরে যেন বলিতেছে, "কোথায় কুমারসিংহ! কেন বৃথা তাহাকে খুঁজিতেছ! সেত এখন আমাদের এই রাজ্যে!"

এমন সময়ে সেই মহাশ্মশানের ভীমান্ধকার মধ্যে, দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা দিল। সে মূর্ত্তিদ্বয় ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ভৈরব ও কমলাবতীর নিকটে আসিল। কমলাবতী সে মূর্ত্তি চিনিলেন! ভৈরবও তাহাদের চিনিল। তাহাদের একজন শাহ জামাল, আর এক জন রোস্তম!

কমলাবতী তিরস্কারপূর্ণস্বরে বলিলেন, "শয়তান! নরাধম! কেন আমাদের এ সর্ব্বনাশ করিলি! এই কি আমার আতিথেয়তার পুরস্কার?"

শাহ জামাল এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপও করিল না। সে মশালের আলোকে, কমলার সেই অপ্সরোপম হেমকান্তি দেখিতেছিল! সে ত ইতঃপূর্ব্বে কমলার মুখ এতটা ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। তাহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবৃত চন্দ্রালোকিত শুভ্র সৌন্দর্য্যই সে দেখিয়াছিল। কিন্তু এখন দেখিল, সেই মহাশ্মশানে যেন এক রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি—উজ্জ্বল দীপ্তিমণ্ডিতা স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

শাহ জামাল, কমলার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া

প্রাণ ভরিয়া কিয়ৎক্ষণ সে অনিন্দ্য রূপরাশি দেখিল। তৎপরে বিকৃত-স্বরে বলিল,—"তুমি কি সুন্দর কমলাবতী! এ ভীষণ দৃশ্যময় মহাশ্মশানে তুমি যে বেহেস্ত সৃষ্টি করিলে কমলা! কিন্তু তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ, তাহা আমি অনুমানে বুঝিতেছি। তুমি চাও—কুমারসিংহের মৃতদেহ! কিন্তু কুমারসিংহ ত মরে নাই—সে আহত হইয়া আমাদের শিবিরে বন্দী। এখানে খুঁজিলে তাহাকে পাইবে কিরূপে? আমরা এত অকৃতজ্ঞ নহি, যে তোমার আতিথেয়তার অবমাননা করিব। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি কমলা—আমি কুমারসিংহকে স্বাধীনতা দিব, কিন্তু আমি তোমাকে চাই!"

এ সব কথা শুনিয়া রোস্তমের নেত্রদ্বয় উজ্জলিত হইয়া উঠিল। আর কমলাবতীর সেই অশ্রুধারাময় আর্দ্র-নেত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল।

শাহ জামাল পুনরায় বলিল, "স্বয়ং সুলতান তোমাকে বেগমরূপে চান। আমি তোমায় পত্নীরূপে চাই। ধরিতে গেলে, এখন তুমি আমার করায়ত্ত। সুলতানকে ছাড়িতে পারি, যে রাজ্যে তিনি আমায় ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, সে রাজ্যের মায়াও ছাড়িতে পারি, কিন্তু তোমায় ছাড়িতে পারি না। সংকল্প করিয়াছি, আমি আফগানিস্থান আর ফিরিব না। তোমাকে লইয়া এই হিন্দুস্থানে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া, সুখে থাকিব! কমলা তোমার জন্যই আজ আমি গুর্জ্জর ধ্বংস করিয়াছি। যে গুর্জ্জর একদিন তাহার স্নেহময় আতিথ্যে, আমার মত শয়তানকে সম্মানিত করিয়াছিল—আমি সেই শান্তিময় নিরপরাধী গুর্জ্জরের বুকে শোণিতের ঢেউ তুলিয়াছি। কমলা! কমলা! একবার বল—তুমি আমার।"

শাহ জামাল যেমন কমলাকে বাহুপাশে আলিঙ্গন করিবার জন্য

সম্মুখে ধাবিত হইল, অমনই এক অলক্ষ্য স্থান হইতে বন্দুকের গুলি আসিয়া তাহার বক্ষভেদ করিল। শাহ জামাল সেই আঘাতে ভূপতিত হইল।

সেই আঘাতকারী পরিশেষে অন্ধকার মথিত করিয়া সকলের সম্মুখে আসিল। সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল, স্বয়ং সুলতান মামুদ সেখানে উপস্থিত।

সুলতান বলিলেন, "শয়তান্! বিশ্বাসঘাতক! আমি তোকে না দিয়াছি কি? এ প্রাণের অগাধ স্নেহ, একান্ত বিশ্বাস, ভবিষ্যতে সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত দিতেও প্রতিশ্রুত। মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার পরই, আমি পার্শ্বস্থিত কক্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া তোর সব কথাই শুনিয়াছি। তুই যে বিশ্বাসঘাতকতা করিবি, ইহা জানিয়াই, আমি তোকে ঐরূপ আদেশ দিয়াছিলাম। সামান্য সৈনিকের বেশে, ছায়ার ন্যায় তোর অনুসরণ করিয়াছিলাম। তারপর স্বহস্তে তোর বিশ্বাস-ঘাতকতার পুরস্কার দিয়াছি।"——

সুলতান ক্রোধে বাহ্যজ্ঞানশূন্য—রোস্তমও তদ্রূপ। শাহ জামাল মৃত। আর ইতোমধ্যে নূতনতর এক বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া, ভৈরব সেই মশালটী মাটীতে পুতিয়া রাখিয়া, কমলাবতীকে লইয়া নিঃশব্দে সেস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

সুলতান সবিস্ময়ে দেখিলেন, কমলাবতী ও তাহার সহচর সেস্থান হইতে অদৃশ্য হইয়াছে।

সুলতান, রোস্তমকে বলিলেন, "রোস্তম! কি হতভাগ্য আমি? হায়! হায়! দারুণ উত্তেজনাবশে, আজ আমি নিজের দক্ষিণ বাহু ছেদ করিলাম। যাহা করিয়াছি, তাহা ত অনুতাপে ও রোদনে ফিরাইবার উপায় নাই। তুমি এই দেহ স্কন্ধে করিয়া তুলিয়া লও।

একটু অগ্রেই আমার পার্শ্বচরদের রাখিয়া আসিয়াছি। এ যাত্রা গুর্জ্জরীদের শাস্তি দিতে পারিলাম না। শাহ জামালের দেহ গজনীতে সমাহিত করিয়া, আবার আমরা এই অভিশপ্ত গুর্জ্জর আক্রমণ করিব।"

রোস্তম তখনই প্রভুর আজ্ঞা পালন করিল। কিয়দ্দূরে আসিয়া সুলতান তাঁহার পার্শ্বচরদের সহিত মিলিত হইলেন। রোস্তম, সেই মৃতদেহ অশ্বের উপর তুলিয়া লইয়া শিবিরে পৌঁছিল। সেখানে আসিয়া শুনিল, যে শিবিরে কুমারসিংহ আবদ্ধ ছিলেন, তাহা গুর্জ্জরীরা আক্রমণ করিয়া কুমারসিংহকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য—এ সব দুঃসাহসিক কাজ ভৈরবের।

সুলতান গজনীতে আসিয়া, মহাসমারোহে শাহজামালের দেহ সমাধিস্থ করিলেন! তাহার অকাল-মৃত্যুজনিত শোকে সপ্তাহকাল সমস্ত রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে সুলতান মামুদকে কেহ কখন চোখের জল ফেলিতে দেখে নাই।

তিন মাসের মধ্যে সেই সমাধির উপর এক প্রকাণ্ড "মসোলিয়ম" নির্ম্মিত হইল। তাহার প্রবেশদ্বার-শীর্ষে, স্বর্ণাক্ষরে লেখা ছিল—

"রূপের মূল্য"

হজরতের মাণিক।

হজরতের মাণিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১৬০০ খৃষ্টাব্দের বসন্ত কাল। সমগ্র পার্ব্বত্য প্রদেশ, নূতন লতা, পাতা, নূতন ফুলে পরিপূর্ণ। নানাজাতীয় বনকুসুমের সুগন্ধে, উপত্যকার প্রত্যেকাংশই নূতন শোভাসম্পদ্‌পূর্ণ ও মধুর সুরভিময়। গাছে ফল—নদীতে জল, বৃক্ষশাখায় ক্ষুদ্রকায় পাহাড়িয়া পাখীর মধুর কূজন। প্রকৃতির বুকে স্নিগ্ধ মলয়ের সুরভি নিশ্বাস। কোথাও বা বিটপীশীর্ষ আলো করিয়া ঘোর লোহিতবর্ণের পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে; কোথাও বা, এক বৃহৎ শিলাখণ্ডের চারি দিক্ ঘেরিয়া বন-মল্লিকার অসংখ্য ক্ষুদ্র শাখা। রাশি রাশি পুষ্পোপহার দিয়া যেন তাহারা সেই পাষাণ-স্তূপের দেহাবরণ করিয়া, পাষাণের কাঠিন্যের সহিত তাহাদের কোমলতা, তুলনায় পরীক্ষা করিতেছে।

এই পার্ব্বত্য প্রদেশ, আফ্‌জাই জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। অধিকাংশই এখন মোগলের শাসনাধীন। হজরত আলি বলিয়া এক আফ্‌জাই পাঠান, বহুদিন পূর্ব্বে এই পর্ব্বতের সমুন্নত উপত্যকার মধ্যস্থলে এক নগর-প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার নাম ছিল "হজরৎ-নগর"। লোকে কিন্তু এই নগরকে 'হজরত'ই বলিত।

হজরতের পাষাণময় ক্ষুদ্র দুর্গ এখন মোগলের দখলের। পাঠানের

চির-গর্ব্বিত নীল পতাকা এখন মোগল কর্ত্তৃক দুর্গশিখর হইতে স্থান-চ্যুত হইয়াছে। এখন দুর্গপ্রাকার-শীর্ষে, মোগলের অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নিত রক্তবর্ণ পতাকা, মোগল বাদশাহের বিজয়ঘোষণা করিতেছে। বর্ত্তমানে হজরৎ-দুর্গের মালিক মোগল-সেনাপতি জবরদস্ত খাঁ। হজরতের পাঠান অধিপতি, মোগল-হস্তে নিহত হইয়াছেন এবং জবরদস্ত খাঁ মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে, এই নববিজিত পার্ব্বত্য-রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

এই পুষ্পরাজিময়, বাসন্তী সুগন্ধি-পরিপূর্ণ, উপত্যকার পার্শ্ববর্ত্তী এক ক্ষুদ্র প্রান্তরপথ দিয়া, একদিন একজন মোগল-সৈনিক দ্রুতগতিতে হজরৎ-দুর্গের অভিমুখে যাইতেছেন। তাঁহার অশ্ব পথশ্রমে পরিশ্রান্ত। তিনি বিশেষ তৎপরতার সহিত চড়াই ও ওৎরাইময় পথগুলি অতিক্রম করিতেছেন। এই সৈনিকের অশ্বচালনার ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয়, যে তিনি একজন অতি সুদক্ষ অশ্বারোহী। তাঁহার পরিচ্ছদ হইতে প্রমাণ হয়, তিনি একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক।

এই অশ্বারোহীর নাম মোকারেব খাঁ। ইনি হজরৎ-অধিপতি জবরদস্ত খাঁর কনিষ্ঠ সহোদর। আকবর বাদসাহের নিকট হইতে কোন জরুরি সংবাদ লইয়া, ইনি তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকট যাইতেছিলেন।

মোকারেব খাঁ উপত্যকার মধ্যে, সহসা একস্থানে বল্‌গা সংযত করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। আরোহীর ভারমুক্ত হওয়ায় অশ্বটা যেন একটা মহাতৃপ্তি অনুভব করিয়া আনন্দজনক হ্রেষারব করিল। মোকারেব স্নেহের সহিত অশ্বের-পৃষ্ঠদেশে হস্তামর্ষণ করিয়া তাহাকে এক বৃক্ষশাখায় বন্ধন করিলেন। তৎপরে তাহার পিঠ্ চাপড়াইয়া গম্ভীরমুখে বলিলেন "জঙ্গী! তুমি এইস্থানে একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক।"

ভাষাহীন জন্তু, সংস্কারবশে যেন সে কথা বুঝিল। সে সানন্দে একটা হ্রেষারব করিল।

মোকারেব খাঁ, সেই নাতিপ্রশস্ত উপত্যকার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। এইস্থানে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, জঙ্গলের লতাগুল্মাদি যেন অশ্বপদদলিত ও স্থানে স্থানে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। সেই কঙ্করময় মৃত্তিকার উপর অশ্বের ক্ষুরচিহ্নও বর্ত্তমান। জঙ্গলের এইরূপ বিমর্দ্দিত অবস্থা দেখিয়া, মোকারেব খাঁর সহর্ষ মুখ, বিমর্ষ ভাব ধারণ করিল। তিনি জঙ্গলপার্শ্ব হইতে উপত্যকার কঙ্করময় পথে আসিয়া একবার চারিদিকে সোৎসুক দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কোন দিকে কোনরূপ শব্দ হইতেছে কি না, তাহা স্থির-কর্ণে শুনিলেন। তৎপরে গভীর তূর্য্যধ্বনি করিলেন।

সেই তূর্য্যধ্বনি হইবার পনরমিনিট পরে, ছয়জন বলিষ্ঠ মোগল-সৈন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। মোকারেবের অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে তাহারা সকলেই অশ্ব হইতে নামিয়া পড়িল।

ইহার মধ্যে একজনকে সম্বোধন করিয়া, মোকারেব গম্ভীরমুখে বলিলেন—"মীর আলি খাঁ! গতিক বড় ভাল বোধ হইতেছে না।"

মীর আলি বলিল—"কেন জনাব! ব্যাপার কি?"

"এই পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের বিমর্দ্দিত অবস্থা দেখ।"

আলি খাঁ ও মোকারেব দুইজনে সেই জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। মোকারেব একে একে তাঁহার লক্ষ্যীভূত সন্দেহের কারণগুলি আলিকে দেখাইল।

আলি খাঁ বলিল—"দেখিতেছি, নিশ্চয়ই এই পথে অশ্বারোহী-সেনা গিয়াছে।"

মোকারেব বলিল—"সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু

তাহাদের সংখ্যাও বড় বেশী নহে। কথা হইতেছে, এই অশ্বারোহিগণ মোগলসেনা হইলে, এরূপ গুপ্তভাবে জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইবে কেন? আর এ সেনা যে আমাদের নহে, তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান।”

“কি প্রমাণ?”

“দেখিতেছ না—মৃত্তিকার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুরচিহ্নগুলিই তাহার প্রমাণ করিয়া দিতেছে, এগুলি খর্ব্বাকার অশ্বতরের পদচিহ্ন।”

আলি খাঁ বিশেষ মনোযোগের সহিত সেই চিহ্নগুলি দেখিয়া বলিল—“জনাবালির অনুমান যথার্থ।”

মোকারেব খাঁ চিন্তিতভাবে বলিলেন—“এখন করা যায় কি?” আমার জ্যেষ্ঠ একজন অতি দুর্দ্দান্ত ও হুঁসিয়ার শাসনকর্ত্তা। অদূরেই হজরৎ-দুর্গ। তাঁহার দুর্গের নিকট দিয়া এতগুলা পাঠান-সৈনিক চলিয়া গেল, আর তিনি ইহার কিছুই খবর রাখিলেন না—এ বড় তাজ্জব কথা!”

আলি খাঁ বলিল—“এখানে এরূপভাবে সময়ক্ষেপ করিলে ত এ বিষয়ের সূক্ষ্ম মীমাংসা অসম্ভব। জনাব না হয় ধীরকদমে আসুন, আমরা একটু দ্রুতপদে দুর্গের দিকে অগ্রসর হই।”

“না—আলি খাঁ তোমরাই ধীরে ধীরে এস। আমিই অগ্রসর হইতেছি।” এই কথা বলিয়া মোকারেব তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। মৃদু করাঘাত করিবামাত্রই, শিক্ষিত অশ্ব সেই বন্ধুর উপত্যকাপথে ধাবিত হইল।

মোকারেবের সঙ্গীগণও পথিমধ্যে বিলম্ব না করিয়া তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

দুর্গসন্নিহিত হইয়া মোকারেব খাঁ যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। দুর্গদ্বারে প্রহরী মাত্র নাই। দুর্গের আশেপাশে লোকজন নাই। সে স্থান যেন প্রেতপুরীর ন্যায় নিস্তব্ধ। যাহারা ছিল, তাহারা যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে,—তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। দুর্গের প্রবেশদ্বার ভগ্ন ও নানা স্থান চূর্ণীকৃত। কেবলমাত্র দুইটি বৃহৎ লৌহ-কীলকের উপর, সেই দ্বারের কাষ্ঠখণ্ড ঝুলিতেছে। এত বড় দ্বার এরূপভাবে ভাঙ্গিল কে?

এ ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া মোকারেবের হৃদয় কম্পিত হইল। সে ভাবিল, এই জনপূর্ণ দুর্গ একবারে জনশূন্য হইল কিরূপে? এত লোকজনই বা গেল কোথায়? ব্যাপার কি? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।

নির্ভীক-হৃদয় ও অসমসাহসী মোকারেব, তরবারি কোষমুক্ত করিল। দুর্গদ্বারে প্রবেশ করিয়া, চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে দুর্গ-মধ্যে জবরদস্ত খাঁ যেখানে বাস করিতেন, সেইদিকে অগ্রসর হইল। কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না, কেহ একটা প্রশ্নও করিল না।

দুর্গপ্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মোকারেব খাঁ যাহা দেখিল, তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সে সবিস্ময়ে দেখিল, কয়েকটি কাষ্ঠের বাতায়ন ও কক্ষদ্বারসংলগ্ন রেশমী পরদাগুলি সম্পূর্ণ-রূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। গৃহ মধ্যস্থ তোরঙ্গ ও পেটিকাগুলি প্রচণ্ডাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খলভাবে বিক্ষিপ্ত।

তারপর প্রতি কক্ষে অতি ভীষণ দৃশ্য! মোকারেব কল্পনায়

ভাবে নাই যে, এরূপ ভীষণ ব্যাপার তাঁহাকে চক্ষে দেখিতে হইবে। প্রত্যেক কক্ষতল শোণিতাক্ত। প্রস্তর-মণ্ডিত দালানের চারিদিকে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। বিগতপ্রাণ বালক-বালিকা যুবক-যুবতী প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাদের মৃতদেহ চারিদিকেই পড়িয়া আছে। কাহারও বক্ষে এখনও শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ রহিয়াছে। কাহারও বা দক্ষিণ-বাহুর অঙ্গুলিগুলি তরবারি-আঘাতে উড়িয়া গিয়াছে। কাহারও মুণ্ড স্কন্ধ-বিচ্যুত, কাহারও স্কন্ধে দারুণ আঘাত! চারিদিকেই যেন কবন্ধ ও প্রেতপুরীর ভীষণ দৃশ্য, চারিদিকেই হৃদয়স্তম্ভনকারী বিভীষিকা।

সেই পুরীর মধ্যে জীবিত কেহই নাই, ইহলোকের কেহই নাই। সেই কোলাহলময় রাজপুরী, এখন যেন প্রেতের নিস্তব্ধ বিচরণক্ষেত্র হইয়াছে।

মোকারেব এক শোণিতাক্ত কক্ষতলে দাঁড়াইয়া, বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল—"যদি কেহ কোন স্থানে লুক্কায়িত থাক, এখনও বাঁচিয়া থাক—আমার কথার উত্তর দাও। আমার সম্মুখে আইস। আমি জবরদস্ত খাঁর কনিষ্ঠ সহোদর মোকারেব খাঁ। আল্লার দোহাই! তোমাদের কোন ভয় নাই।"

কথাগুলি মোকাবের মুখোদ্ভূত হইয়া কেবলমাত্র কঠোর প্রতি-ধ্বনি করিয়া, তখনই বিলয়প্রাপ্ত হইল। কেহ তাহার সম্মুখে আসিল না, কেহ তাহার কথার জবাবও দিল না।

ভয়ে, বিস্ময়ে, উদ্বেগে, মোকারেবের বদনমণ্ডল ঘর্ম্মাপ্লুত। সে উষ্ণীষ-বস্ত্র দিয়া মুখের স্বেদরাশি মুছিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই শোণিতাক্ত কক্ষমধ্যে কয়েক মুহূর্ত্তকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এ ভীষণ ব্যাপারের কোনরূপ অর্থবোধ করিতে না পারিয়া, সে যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

এমন সময়ে কে যেন নিকটবর্ত্তী এক কক্ষ হইতে কাতরস্বরে বলিল—"জল দাও—জল দাও। মৃত্যু আমায় গ্রাস করিতেছে। বড় তৃষ্ণা।"

কোন্ কক্ষ হইতে এই অস্ফুট কাতর আর্ত্তনাদ আসিল, মোকারেব তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, পার্শ্বের এক কক্ষে প্রবেশ করিল। সেখানে যে ভীষণ দৃশ্য দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

মোকারেব দেখিল, তাহার প্রিয়তমা ভ্রাতৃজায়ার দেহ সেই কক্ষমধ্যে শোণিতাপ্লুত হইয়া পড়িয়া আছে। সেই বিগতপ্রাণা রমণীর রুধিরাপ্লুত বক্ষের উপর তাঁহার মৃত শিশুপুত্র। মাতা ও শিশুর অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল—যেন জননী আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার হস্তাবদ্ধ ছুরিকা শিশুরও বক্ষ-ভেদ করিয়াছে। সকল কাহিনীই যেন এই দুইটি হত্যা-কাণ্ডে পরিস্ফুট হইল।

অবস্থা দেখিয়া মোকারেব বুঝিল, যে তাহার ভ্রাতৃজায়া নারী-সম্মান রক্ষার জন্যই আত্মহত্যা করিয়াছেন।

তাহার কর্ণদেশের সকল অংশই ছিন্নবিচ্ছিন্ন। কে যেন জোর করিয়া সেই সকল স্থান হইতে অলঙ্কারগুলি ছিঁড়িয়া লইয়াছে। মণিবন্ধ ক্ষতবিক্ষত। অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, জোর করিয়া তাহা হইতে স্বর্ণবলয় খুলিয়া লওয়া হইয়াছে। তাঁহার সেই সুকান্তিময় বর-বপুর সকল স্থানই অলঙ্কারবিহীন। মোকারেব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"হায় দুর্ভাগ্য! কে সর্ব্বনাশ করিল?" কিন্তু তাহার এ আকুল প্রশ্নের উত্তর দিবার ত কেহই নাই!

সহসা সেই স্থান হইতে কাতরকণ্ঠে চীৎকার উঠিল,—"জল দাও—প্রাণ যায়।"

মোকারেবের সতর্ক কর্ণদ্বয়, এবার নির্দ্ধারণ করিতে পারিল—কোন্ দিক হইতে এ কাতর-প্রার্থনা আসিতেছে। তাহার নিকট সেই দুর্গের সকল স্থানই পরিচিত। শব্দ লক্ষ্য করিয়া, মোকারেব পার্শ্বস্থ এক কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিল,—তাহার জ্যেষ্ঠের একমাত্র অনুরক্ত বন্ধু, বৃদ্ধ মোল্লা, রক্তাক্ত অবস্থায় সেই গৃহের কোণে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। আঘাতের চোটে, মোল্লা সাহেবের দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলী উড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার দক্ষিণ বক্ষঃকোটরে ভয়ানক চোট্ লাগিয়াছে। মৃত্যুর আর বেশী বিলম্ব নাই!

মোল্লা সাহেব, সে অঞ্চলে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আকবর বাদশাহ তাঁহাকে বড়ই সম্মান করিতেন। নগরের কোলাহল অপেক্ষা নির্জ্জন পার্ব্বত্য-উপত্যকা, নিভৃত সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র, ধর্ম্মালোচনার পক্ষে উপযুক্ত স্থান ভাবিয়া, তিনি বাদশাহের সম্মতি লইয়া এই দুর্গমধ্যে জবরদস্ত খাঁর নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন।

মোকারেবকে মোল্লা-সাহেব বড়ই স্নেহ করিতেন। কাজেই তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া,মোকারেবের চক্ষে জল আসিল। সে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া জলের সন্ধানে গেল। ভাগ্যক্রমে কক্ষেই মুমূর্ষুর আকাঙ্ক্ষিত পানীয় মিলিল। মোকারেব সেই জলপূর্ণ পার্শ্বস্থ পাত্র মোল্লার মুখের কাছে ধরিল।

বৃদ্ধ তাঁহার জীবনের শেষ তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। তাঁহার প্রাণের মধ্যে যে একটা দাবদাহের প্রচণ্ড জ্বালা- জ্বলিতেছিল, তাহার যেন অনেকটা শান্তি হইল।

নিবিবার পূর্ব্বে দীপ যেমন উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, সেই মুমূর্ষু মোল্লার মুখমণ্ডল ক্ষণেকের জন্য যেন সেইরূপ উজ্জ্বলশ্রী ধারণ করিল।

"মোকারেব! এ প্রাণ যে এ সাংঘাতিক আঘাতেও যায় নাই,
তাহার জন্য খোদাকে ধন্যবাদ করিতেছি।" ৬১ পৃঃ

সেই মৃত্যুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন মুখে, যেন একটা আশা ও আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

জলপান করিবার পর, বৃদ্ধ মোল্লা যেন একটু শক্তিলাভ করিলেন। ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"মোকারেব! এ প্রাণ যে এ সাংঘাতিক আঘাতেও যায় নাই, তাহার জন্য খোদাকে ধন্যবাদ করিতেছি। ইতঃপূর্ব্বে জীবনান্ত হইলে হয় ত তোমায় একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা বলিবার অবসর পাইতাম না। যে ন্যস্তবিশ্বাস রক্ষার জন্য আমার এ দুর্দ্দশা ঘটিল, তাহাও তোমায় জানাইতে পারিতাম না। শোন মোকারেব! তোমার জ্যেষ্ঠ, আজ তিন দিন হইল পর্ব্বতবাসীদের বিদ্রোহ-দমনের জন্য সুদূর প্রান্তসীমায় গিয়াছেন। এ দুর্গে পাঁচশত বই সেনা ছিল না—তাহার মধ্যে কেবল মাত্র পঁচিশজন মোগল-সেনাকে এই দুর্গ-রক্ষার জন্য রাখিয়া, বাকী সমস্ত সেনাই তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছ ত সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু মনসুরের জ্বালায়, এ অঞ্চলে সকলেই ব্যতিব্যস্ত। বিশক্রোশ আশেপাশের নগর ও গ্রামের অধিবাসীরা, সর্ব্বদাই ভীত ও সন্ত্রস্ত। তোমার জ্যেষ্ঠ দুইবার এই মনসুরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে শয়তানকে ধরিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি তাহাকে ধরিবার চেষ্টাও ছাড়েন নাই। এজন্য তোমার জ্যেষ্ঠের উপর সেই দস্যুপতির ভয়ানক আক্রোশ।"

"চারিদিকে তাহার গোয়েন্দা নানাবেশে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। সে গোয়েন্দামুখে সংবাদ পাইয়াছিল—তোমার দাদা পর্ব্বতীয় বিদ্রোহীদিগকে স্ববশে আনিবার জন্য, প্রায় সকল সেনাই দুর্গ হইতে লইয়া গিয়াছেন। দুর্গ এক প্রকার অরক্ষিত। পাপিষ্ঠ এই সুযোগে আমাদের দুর্গে প্রবেশ করিয়া, পরিজনবর্গকে নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিয়াছে। সেই পঁচিশজন সেনার মধ্যে, দুইজন তোমার

জ্যেষ্ঠকে সংবাদ দিবার জন্য চলিয়া গিয়াছে। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের অর্দ্ধেক সেই দুর্দ্দান্ত শয়তান মন্‌সুরের হস্তে বন্দী। আর অর্দ্ধেক সেনা নিহত হইয়াছে। সেই শয়তানের নিষ্ঠুরতার ফলে অন্তঃপুরিকা ও বালক-বালিকাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ। এই দুর্গে যাহা কিছু বহুমূল্য ছিল, তাহার সবই সে লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে; কিন্তু একটি জিনিস সে পায় নাই। সেই জিনিসটির অনুসন্ধানের জন্যই সে সকল ঘর দ্বার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে—সমস্ত জিনিসপত্র ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়াছে। তুমি হয়ত জান না মোকারেব! কিসের অনুসন্ধানের জন্য, সে এত বড় একটা নৃশংস কাণ্ড করিল? সেটি আর কিছুই নয়, এই হজরত-দুর্গের পূর্ব্বাধিকারীর পুরুষানুক্রমে রক্ষিত—সেই "পদ্মরাগমণি"। এই অমূল্য মণিই "হজরতের-মাণিক" বলিয়া পরিচিত। আকবর বাদশাহ এই মণির লোভেই দুর্গজয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পান নাই; কিন্তু সেই মণির অস্তিত্ব জানিত কেবল মাত্র তিনজন। প্রথম আমি—দ্বিতীয় তোমার জ্যেষ্ঠ—তৃতীয় তোমার ভ্রাতৃ-জায়া। ভূতপূর্ব্ব পাঠান-দুর্গাধিপতি আমায় গুরুর ন্যায় সম্মান করিত, একথা ত তুমি শুনিয়াছ। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। তিনিই আমার হস্তে সেই অমূল্য মাণিকটি দিয়া বলেন,—"ইহার মূল্য নাই, আর ইহার জন্যই আমার অমূল্য জীবন ও এই বিশাল দুর্গ হারাইয়াছি। যে ফকিরের নিকট আমার পিতামহ এই বহুমূল্য মাণিকটি পান, তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন,—ইহা যেন তোমার বংশধরগণ ব্যতীত আর কাহারও হস্তগত না হয়—এজন্য এই মণিটি আপনি এই পর্ব্বতের উত্তরাংশে যে বিশাল হ্রদ আছে, তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই পক্ককেশ বৃদ্ধ ফকির, বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আবার কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"মোকারেব! আমাকে আর একটু জল দাও, জীবনের শেষ-তৃষ্ণা নিবারণ করি।"

মোকারেব পুনরায় স্নিগ্ধ বারিদানে, সেই বৃদ্ধ ফকিরের জ্বালাময়ী তৃষ্ণা নিবারণ করিল।

ফকির বলিলেন,—"আমি পাঠান-দুর্গাধিকারীর আদেশক্রমে, সেই মাণিকটি হাতে লইয়া—এক অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে, হ্রদের দিকে অগ্রসর হইলাম, কিন্তু সেই মহামূল্য মণিটিকে সলিলমধ্যে নিক্ষেপ করিতে পারি নাই। তাহার জ্যোতি এত উজ্জল, যে সেই ভীষণ অন্ধকারেও তাহার মধ্য হইতে উজ্জল লোহিত-শিখা বাহির হইতে লাগিল। আমি ফিরিয়া আসিয়া, গোপনে সেই পদ্মরাগমণি তোমার জ্যেষ্ঠকে প্রদান করিলাম। তিনি আবার নিজে না রাখিয়া তাহা তোমার ভ্রাতৃজায়াকে প্রদান করেন। পাপিষ্ঠ মনসুর বোধ হয়, এই মণির কথা কোনরূপে শুনিয়াছিল। তাই সে উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া, এই হজরত-দুর্গ আক্রমণ করে। তোমার ভ্রাতৃজায়া, বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া, উপযুক্ত সময়েই গোপনে এই মণিটি আমার হাতে দিয়া যান। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—"আমি ফকির, পাপিষ্ঠ আমার উপর কোনরূপ অত্যাচার করিবে না" কিন্তু তাহা হয় নাই। সেই নিষ্ঠুর দস্যু আমাকেও ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। বৎস! তোমার ভ্রাতা যতক্ষণ না ফিরিয়া আসেন, ততক্ষণ তুমি এই হজরত-দুর্গের অধিকারী। এই বহুমূল্য "হজরতের মাণিক" তোমার। এই নাও সেই পদ্মরাগ-মণি।"

ফকির সাহেব আর বেশী কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার জীবনবায়ু অবিলম্বে জীর্ণ দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিল।

মোকারেব খাঁ, সেই উজ্জ্বল মাণিকটি দুই তিন বার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, তাহার জ্যোতিঃ অতুলনীয়। তিনি সেই মাণিকটি সযত্নে তাঁহার আঙ্গরাখার মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন।

মোকারেবের সঙ্গিগণ বহুক্ষণ পূর্ব্বেই দুর্গমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারাও দুর্গের অবস্থা দেখিয়া ভীত ও বিস্মিতচিত্তে, মোকারেবের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মোল্লার সহিত মোকারেব যখন কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, সেই সময়ে একজন মোগল-সৈনিক প্রচ্ছন্নভাবে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের দ্বারান্তরালে থাকিয়া, তাহাদের সব কথাই শুনিল। তাহার মুখ, সহসা হর্ষপ্রফুল্ল হইল। মোকারেব ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। মোকারেবের সঙ্গে যে আটজন মোগলসেনা আসিয়াছিল—এ ব্যক্তি তাহাদেরই একজন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০—

চেষ্টা করিয়া, মোকারেব সেই অন্ধকারময় প্রেতপুরীতে সন্ধ্যার দীপ জ্বালিল। সে দীপালোক এক অতিভীষণ দৃশ্য প্রকটিত করিল।

মনসুরের ভয়ে, গ্রামবাসীরা নানা স্থানে পলাইয়াছিল। তাহারাও সন্ধ্যার পর একে একে গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

মোকারেব গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে লোক জড় করিল। তাঁহার সঙ্গীদের ও গ্রামবাসীদের সহায়তায়, মৃতদেহগুলির শেষকৃত্য করিয়া, গভীর রাত্রে চিন্তাপূর্ণ-হৃদয়ে, ক্লান্ত দেহে, সে জ্যেষ্ঠের কক্ষে বিশ্রামার্থে প্রবেশ করিল। অতীব ভীষণ ব্যাপারের স্মৃতি, তখনও তাহাকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল!

এখন কর্ত্তব্য কি? বৃথা এতগুলি বহুমূল্য জীবন নষ্ট হইল! জিনিসপত্র ও অর্থাদি যাহা ছিল, তাহাও লুণ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠেরও কোন সংবাদ নাই। এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত—মোকারেব তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে নিদ্রাহীন নেত্রে, সমস্ত রাত্রি সেই শয়নকক্ষে কাটাইল।

তাঁহার সঙ্গী রক্ষীরা চেষ্টা করিয়া, একটু সুবিধাজনক স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারাও উদ্বিগ্নচিত্তে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়াছে। অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহাদের সাহস হয় নাই। গ্রাম হইতে তাহারা যাহা কিছু খাদ্যপানীয় সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাতেই ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছে।

কালরজনী প্রভাতা হইল। সেই শূন্যপুরীতে মোকারেব কেবল

একা। সমস্ত রাত্রি সে চক্ষু বুঝিতে পারে নাই। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

প্রহরীরা তাঁহাকে সেলাম করিল। মোকারেব দেখিল, আটজন প্রহরীর মধ্যে সাতজন আছে। একজন অনুপস্থিত। যে নাই, তাহার নাম—আলি খাঁ।

পাঠক এই আখ্যায়িকার প্রথমাংশেই মীর আলিখাঁর পরিচয় পাইয়াছেন।

মোকারেব তাঁহার শরীর-রক্ষী সেনাগণকে প্রশ্ন করিয়া জানিল, "আলি খাঁ সকলের শেষে দুর্গ-প্রবেশ করিয়াছিল। রাত্রি প্রথম প্রহরের পর সে অশ্বারোহণে পর্ব্বতের উপর চলিয়া গিয়াছে।"

মোকারেব চীৎকার করিয়া বলিল—"বিশ্বাসঘাতকতা! বেইমানী! আলি খাঁ গেল কোথায়?"

একজন সেনা বলিল, "কি করিয়া জানিব হুজুর! রাত্রি এক প্রহরের পর, সে অশ্বারোহণে কোথায় চলিয়া গেল। আমরা কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইলাম না। মনে ভাবিলাম, হুজুরালি তাহাকে কোন জরুরি কাজে পাঠাইয়াছেন।"

মোকারেব চীৎকার করিয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিল,—"না—না আমি তাহাকে কোথাও পাঠাই নাই। সে শয়তান, বিশ্বাসঘাতক হইয়াছে। অতি বিশ্বাসী পার্শ্বচর সে আমার—সে নেমকহারামি করিতে গিয়াছে।"

মোকারেব তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন,—"যতক্ষণ না আমি ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তোমরা এই দুর্গ মধ্যে অবস্থান কর। দস্যুরা যদিও এই ভাণ্ডার গৃহ লুঠ করিয়াছে, কিন্তু এখনও তোমরা এখানে প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য পাইবে।"

আর কিছু না বলিয়া, মোকারেব তাঁহার অশ্বে আরোহণ করিল, দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইল। কিয়দ্দূর আসিবার পর দেখিল, এক চড়াই-পথ বরাবর উপরে গিয়াছে। আশে পাশে আর কোন পথই নাই। সে অতি ধীরে ধীরে, সেই বন্ধুর পার্ব্বত্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যে আলিখাঁর অনুপস্থিতিতে মোকারেব এতদূর বিচলিত—পাঠক! একবার সেই আলিখাঁর সন্ধান আমাদিগকে লইতে হইবে।

সেই গভীর রাত্রে আলিখাঁ অশ্বারোহণে পর্ব্বতে উঠিতেছে। কিন্তু অন্ধকারে সে পথ নির্ণয় করিতে পারিতেছে না। অনেক কষ্টে সে পর্ব্বতের উপরস্থ এক উপত্যকায় উঠিল। এই উপত্যকা বহুদূর বিস্তৃত। চড়াইয়ের পথ—এই উপত্যকা হইতেই শেষ।

আলিখাঁ এই অন্ধকার-মণ্ডিত পথ ধরিয়া, প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ আসিবার পর দেখিল—সম্মুখে এক ভীষণ জঙ্গল। অন্ধকারে সে গন্তব্যপথ স্থির করিতে পারিল না। তাহার বিশাল দেহ স্বেদজলে প্লাবিত। অশ্বও শ্রমক্লান্ত। আলি খাঁ এক একবার মনে করিতে লাগিল—"আর অগ্রসর হইব না—যে পথে আসিয়াছি, সেই পথেই ফিরিয়া যাই।" কিন্তু এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর সে পাইল না।

সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারাবৃত জঙ্গল হইতে, সহসা দুইজন লোক বাহির হইয়া তাহার অশ্ববল্গা ধারণ করিল। কঠোর-স্বরে বলিল,—"কে তুই?"

আলি খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া পড়িল। ধীরভাবে বলিল—"আমি মোসাফের।"

সেই ব্যক্তি কঠোরস্বরে বলিল,—"হতভাগ্য মোসাফের! এ পথে

আসিয়াছিস্ কেন? তোর কি মরিবার সাধ হইয়াছে? জানিস্ না এ জঙ্গলে মনস্থরের ভয়ে প্রেত-পিশাচ পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না।"

মনস্থরের নাম শুনিয়া, আলি খাঁ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। সে ভাবিল—খোদা নিশ্চয়ই তাহার সহায়। সে ত মনস্থরেরই অনুসন্ধানেই যাইতেছে। উপত্যকা-পার্শ্ববর্ত্তী এই গভীর জঙ্গলের কাছে আসিয়া সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না—যে কোন দিকে যাইবে। এখন সে বুঝিল—এই দুইজন দস্যু নিশ্চয়ই তাহাকে মনস্থরের নিকট উপস্থিত করিবে এবং অতি সহজেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

আলি খাঁ বলিল,—"দোস্ত! মৃত্যুর ভয় থাকিলে এ পথে আসিব কেন? জঙ্গলের বাদ্‌শা, মনসুরের কাছেই ত আমি যাইতেছি। একটা খুব জরুরী খবর তাঁকে দিতে হইবে।"

সেই দস্যু বলিল,—"কোথা হইতে তুই আসিতেছিস্?"

"হজরৎ-দুর্গ হইতে।"

"হজরৎ-দুর্গ হইতে?"

"হাঁ—জনাব!"

"সেখানে ত কেহই জীবিত নাই। তুই চাস্ কি?"

"এই জঙ্গলের বাদ্‌শা সেই মহাপরাক্রান্ত মনসুর আলির সহিত আমি একবার সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

"কেন?"

"তাহা তোমাদের নিকট বলিব না। তোমরা যখন আমাকে ধরিয়াছ, তখন যে সহজে ছাড়িয়া দিবে না তাহাও জানি; কিন্তু দোহাই তোমাদের, আমায় এই নির্জ্জন বনমধ্যে হত্যা করিও না।

যাহার জন্য মুনস্থর সাহেব হজরৎ-দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, আমি সেই বিষয়েই কোন জরুরি সংবাদ আনিয়াছি।

সেই দস্যু দুইজন গা টেপাটেপি করিল। তারপর যে প্রথমে কথা কহিয়াছিল, সেই বলিল,—"জানিস্ ত আগুন লইয়া খেলা করিলে অনেক বিপদ্। তুই যদি প্রাণরক্ষার জন্য কোনরূপ ছল করিয়া এ কথা বলিয়া থাকিস্, তাহা হইলে তোর আর নিস্তার নাই। আমাদের দলপতির সহিত চালাকি করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। এখনও বিবেচনা করিয়া কথা বল্।"

আলি খাঁ বলিল,—"না ভাবিয়া চিন্তিয়া, আমি এ ব্যাঘ্র-গহ্বরে আসি নাই। সখ করিয়া কে কোথায় জীবন বিসর্জ্জন দিয়া থাকে? সে সংবাদ তোমাদের নিকট বলিবার হইলে—বলিতাম। মনস্থর ব্যতীত আর কাহারও নিকট সে সংবাদ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ বলিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছি।"

দস্যুদ্বয়, আলি খাঁর ঘোড়াটি নিকটস্থ একটি বৃক্ষে বন্ধন করিল। তৎপরে দুইজনে তাহার দুইটি হাত ধরিল। আলি খাঁকে এই ভাবে কায়দা করিয়া লইয়া, তাহারা সেই অরণ্যাণী-মধ্যস্থ সংকীর্ণ পথে অগ্রসর হইল।

অদূরেই দস্যুপতির শিবির। চারিদিকে মশাল জ্বলিতেছে—আর এক কৃষ্ণকায় ভীষণদর্শন ব্যক্তি, একটি বৃক্ষতলে খাটিয়ার উপর বসিয়া ধূমপান করিতেছে। দস্যুরা সেই ব্যক্তির সম্মুখে আলি খাঁকে উপস্থিত করিয়া বলিল,—"ইনিই আমাদের দলপতি। তোর কি বলিবার আছে এঁর কাছেই বল্।"

দস্যুপতির চক্ষুর্দ্বয় লোহিতবর্ণ। বোধ হয় সে কোনরূপ উগ্র

মাদক সেবন করিয়াছে। তাহার দৃষ্টি অতি মর্ম্মভেদী, ওষ্ঠাধর স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ। দেহের রংও সেইরূপ।

দস্যুপতি মনসুর, কিয়ৎক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে আলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিল। তাহার আশেপাশে মশালের আলো জ্বলিতেছে। সে মশালের আলো তাহার কৃষ্ণবর্ণ মুখের উপর পড়ায় অতি ভীষণ ভাব প্রকটিত করিয়াছে।

দস্যুদ্বয়ের মধ্যে একজন বলিল,—"হুজুর! এ ব্যক্তি বলিতেছে আপনার সহিত ইহার কোন বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।"

দস্যুদলপতি মনসুর চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণায়মান করিয়া বলিল,—"কে তুই! এ বনের পথ চিনলি কিরূপে? নিশ্চয়ই তুই কোনও গোয়েন্দা। এ পর্ব্বতে আমাদের ভয়ে কেহই আসিতে সাহস করে না। তুই কেমন করিয়া আসিলি? কোথা হইতে আসিতেছিস্ তুই?"

আলি খাঁ সাহসী সৈনিক হইলেও, সে দস্যুপতি মনসুরের চোখ্‌রাঙ্গানি ও ধম্‌কানিতে মর্ম্মে মর্ম্মে কাঁপিয়া উঠিল। মনসুর যে কিরূপ পিশাচ-প্রকৃতির লোক, তাহা সে হজরৎ-দুর্গের লুণ্ঠন ব্যাপারেই বুঝিয়াছিল। মানুষের জীবন লইয়া ক্রীড়া করাই তাহার অভ্যস্ত কার্য্য। আলি খাঁ বুঝিল, এ ক্ষেত্রে সাহস হারাইলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে! শোচনীয় মৃত্যু অনিবার্য্য!

কাজেই সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল,—"জনাব! আমি আপনার সহিত রহস্য করিতে আসি নাই। যে হজরতের মাণিকের জন্য, আপনি এত কাণ্ড করিলেন, হজরৎ-দুর্গ শোণিতের বন্যায় প্লাবিত হইল—সেই মাণিকের সন্ধান আমি আপনাকে দিতে আসিয়াছি।"

মনসুর এ কথায় অনেকটা ঠাণ্ডা হইল। আলিকে একটি বেত্র-

নির্ম্মিত ক্ষুদ্র আসন দেখাইয়া দিয়া বলিল,—"ঐখানে বসিয়া তোমার কথা বল।"

আলি বলিল—"ইহাদের সম্মুখে সে কথা বলিব কি ?"

দস্যুপতি—বিকট হাস্য করিয়া বলিল,—"ইহারা আমার দক্ষিণ বাহু। ইহাদের নিকট আমার কোন কিছুই গোপন নাই। স্বচ্ছন্দে তোমার বক্তব্য বলিতে পার।"

আলি খাঁ বলিল—"যে মাণিকের জন্য আপনি এত কাণ্ড করিলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।"

মনসুর এককথায় যেন একটু প্রসন্নভাব ধারণ করিল। সহর্ষমুখে বলিল,—"সে মাণিক তুমি সঙ্গে আনিয়াছ কি ?"

"না—"

"তবে কেমন করিয়া তাহার সন্ধান জানিলে ?"

"সে মাণিক যাহার নিকট আছে, তাহাকে আমি দেখাইয়া দিব।"

"কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করা তোমার সংকল্প নয় ত ?"

"খোদার কসম্। আপনার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, এ দুনিয়ায় ক'টা লোকের এমন সাহস আছে ?"

"ভাল কথা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বিনা স্বার্থে কেউ কোন কাজ করে না। এ বিষয়ে তোমার স্বার্থ কি ?"

"মাণিকটি দেখিয়া আমার বড় লোভ হইয়াছে। আমি তাহার অধিকারীকে হত্যা করিয়া সে মাণিক লইয়া পলাইতে পারিতাম, কিন্তু বুঝিয়াছি, পলাইলেও আমার নিস্তার নাই। যাহার কাছে সেটা আছে, সে লোকটা অতি শক্তিশালী। তাহার সহিত আমি যুঝিয়া উঠিতে পারিব না। তাই আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমি আপনাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিব। তৎপরিবর্ত্তে আমি সেই মাণিকটি চাই।"

মনসুর চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কঠোরস্বরে বলিল,—"না তাহা হইতেই পারে না। আমার লোক চেষ্টা করিয়া সেই মণি উদ্ধার করিবে—আর সামান্য এক হাজার টাকা, যাহা আমি এক মুহূর্ত্তে উপায় করি; তাহার পরিবর্ত্তে তোমায় সেই বহুমূল্য মণিটি দিব—কথাটা অতি তাজ্জব! তুমি নিতান্ত বেকুব, তাই এরূপ একটা অসম্ভব প্রস্তাব মাথায় লইয়া আমার কাছে আসিয়াছ। তোমার সাহসও ত কম নয়! ও সব বাজে কথা ছাড়িয়া দাও। আমি যা বলিব, তাই তোমায় করিতে হইবে। যাহার কাছে হজরৎ-মাণিক আছে, সেই লোককে তুমি কেবলমাত্র দেখাইয়া দিবে। ব্যস্—এই পর্য্যন্ত। আমার লোকেরা খুব হুঁসিয়ার। তাহার পর যা করিতে হয়, তাহারাই করিবে। এজন্য আমি তোমাকে পঞ্চাশটি স্বর্ণ-মুদ্রা বায়না দিতেছি। সেই লোকটাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে ও মণিটা আমাদের হস্তগত হইলে, আরও পঞ্চাশ মুদ্রা তোমায় পুরস্কার স্বরূপ দিব।

দস্যুপতি এই কথা বলিয়া, তাহার কটিদেশনিবদ্ধ এক গেঁজিয়া হইতে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা একে একে গুনিয়া বাহির করিল। তৎপরে বলিল,—"কেমন আমি যা বলিলাম, তাহাতে স্বীকার আছ?"

আলি খাঁ মনে মনে ভাবিল—"যদি ইহার কথায় সম্মত না হই, তাহা হইলে উহারা এখনি আমায় হত্যা করিবে। খোদার দেওয়া এই একশত স্বর্ণমুদ্রা লইয়াই আমার সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। হায়! কেন এই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে আসিয়াছিলাম! মোকারেবের নিকট আর আমার মুখ দেখাইবার পথ নাই। আমি নিজের বুদ্ধির দোষে একবারেই পথে বসিলাম।"

আলি খাঁ বলিল,—"আপনার কথার উপর কথা কহিবার শক্তি

আমার নাই। তবে এই রাত্রে এত কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমি আপনার কাছে আসিয়াছি, যাহা ভাল হয় তাহাই করুন।"

দস্যুপতি সেই পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা আলি খাঁর হাতে দিয়া বলিল—"আমি অন্যায় বিচার করি না। নিখুঁতির ওজনে আমার কাছে:কাজ হয়। যাক্—এখন ত সব কাজ মিটিয়া গেল। বল দেখি, সে "হজরৎ-মণি" কাহার কাছে আছে? ঐ মণিটার জন্যই ত আমি হজরত-দুর্গ শোণিত রঞ্জিত করিয়া আসিয়াছি।"

আলি খাঁ বলিল,—"মোকারেবের কাছে সেই পদ্মরাগ মণি আছে।"

দস্যুপতি সবিস্ময়ে বলিল—"মোকারেব খাঁ? জবরদস্ত খাঁর ভাই।"

"হাঁ জনাব?"

"আমি যখন দুর্গ লুঠ করিতে গিয়াছিলাম তখন ত সে ছিল না।"

"না—আপনি চলিয়া আসিবার এক ঘণ্টা পরে মোকারেব দুর্গে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"

"সে সেই জহরৎ পাইল কার কাছে?"

"দুর্গে যে বৃদ্ধ মোল্লা বাস করিত, সে সেই মণিটি লুকাইয়া রাখিয়াছিল।"

"ঠিক—ঠিক! আমারও মনে সেইরূপ একটা সন্দেহ হইয়াছিল বলিয়া,আমি সেই ভণ্ড শয়তান মোল্লাকে একটা তরোয়ালের খোঁচা দিয়া আসিয়াছি। এতক্ষণ তোমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, এখন করিলাম। খোদার কসম! বল দেখি—তুমি যা বলিতেছ তা কি সত্য!"

"জনাব! আমার ধড়ে ত দুটো মাথা নাই যে, সাক্ষাৎ শমন-স্বরূপ মনসুর আলির কাছে মিথ্যা কথা বলিব!"

দস্যুপতি পুনরায় পূর্ব্বকথিত গেঁজিয়া বাহির করিল। তাহার মধ্য হইতে আবার পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া, তাহা আলি খাঁর হাতে দিয়া বলিল,—"আমি জীবনে কখনও কথার খেলাপ করি নাই। তোমাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। পঞ্চাশ এই মাত্র দিয়াছি—আরও লও এই বাকী পঞ্চাশ। তোমার কাজ শেষ হইয়াছে। তুমি এখন চলিয়া যাইতে পার। আমি তোমার সঙ্গে একজন লোক দিতেছি, সে তোমায় নিরাপদে এই বনের বাহির করিয়া দিবে।"

আলি খাঁ মনে মনে ভাবিল,—"খোদা মেহেরবান। এই একশত আসরফিই আমার পরিশ্রমের লাভ! একবার এ জঙ্গল হইতে বাহির হইতে পারিলে হয়। আমি অন্ততঃ এক হাজার আসরফি পাইবার আশা করিয়া, এ কষ্ট সহিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিতে আসিয়াছিলাম। তা যখন পেট ভরিল না—তখন দু-মুখো সাপের মত কাজ করিব। আজ রাত্রে ফিরিয়া গিয়াই মোকারেবকে সাবধান করিয়া দিয়া তাহার নিকটও এইরূপে পুরস্কার লইব।"

আলি খাঁ সেলাম করিয়া বলিল,—"সাহেব! তাহা হইলে আমি এখন বিদায় পাইতে পারি। প্রার্থনা রহিল—জনাবের কার্য্য সিদ্ধ হইলে আরও কিছু দিবেন।"

দস্যুপতি তাহার দুই জন সহচরকে ডাকিল। তাহাদের কাণে কাণে কি বলিল। মনসুরের আদেশ প্রাপ্তি মাত্র, তাহারা তখনই গিয়া আলি খাঁর হাত দুইটি বাঁধিয়া ফেলিল।

আলি খাঁ—সবিস্ময়ে বলিল,—"এ সব কি ব্যাপার! কৃতোপকারের এই কি পুরস্কার!"

মনসুর বলিল—"তুই শয়তান! বিশ্বাসঘাতক! আমরা বিশ্বাস-

ঘাতককে বড় ঘৃণা করি। আমাদের এত বড় দলটা, কেবল বিশ্বাসের উপরই চলিতেছে। মোকারেব খাঁ তোর মনিব! তাহার নিমক খাইয়া তুই মানুষ হইয়াছিস্। কিন্তু এতবড় শয়তান তুই, যে সামান্য একশত স্বর্ণমুদ্রার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিতে আসিয়াছিস্। সে "হজরৎ মাণিক" পাই আর না পাই, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তোর মত একটা বিশ্বাসঘাতককে দুনিয়া হইতে সরাইতে পারিলে বুঝিলাম, আজ একটা কর্ত্তব্য করিলাম। আমি তোর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছি। কথার খেলাপ আমি করি নাই। তোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ইতি পূর্ব্বেই একশত স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়াছি।"

আলি খাঁর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে বুঝিল, মনসুর যাহা বলিতেছে—তাহাই ঠিক! সে অস্ফুটস্বরে বলিল—"হায়! হায়! কেন শয়তানের ছলনায় এ বিশ্বাসঘাতকতা করিলাম!"

দস্যুপতির ইঙ্গিতমাত্রে, সেই দুইজন দস্যু শাণিত কৃপাণ কোষো-ন্মুক্ত করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে, আলি খাঁর মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইল। সেই নিভৃত উপত্যকাক্ষেত্র তাহার শোণিতরঞ্জিত হইলে, দস্যুপতির আদেশে শৃগাল-কুক্কুরের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য, সেই মৃতদেহ উপত্যকামধ্যবর্ত্তী এক গভীর জঙ্গলে নিক্ষিপ্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বলা বাহুল্য, সম্রাট্ আকবর সাহ, এই লোকবিশ্রুত পদ্মরাগ মণির জন্যই হজরতের পাঠান দুর্গাধিপতির স্বাধীনতা হরণ করেন। তিনি দুই তিনবার দুর্গাধিপতির নিকট এই বহুমূল্য মণিটি চাহিয়া পাঠান। কিন্তু দুর্গাধিপতি তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, আকবর সাহ বলপূর্ব্বক সে মণি অধিকারের চেষ্টা করেন। তাহার ফলে পুরাতন দুর্গাধিপতি নিহত ও রাজচ্যুত হন। আর এই জবরদস্তখাঁই তাহার আদেশে হজরৎ-দুর্গ দখল করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ মোল্লা যখন দেখিলেন যে, এক মণির জন্যই এই মহাবিপ্লব ঘটিল, তখন তিনি সেই অভিশপ্ত মণিটিকে কি করিয়া হস্তান্তর করেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। জবরদস্ত খাঁ লোক ভাল ছিলেন। তিনি ভূতপূর্ব্ব দুর্গাধিপতির সহচর, এই ধার্ম্মিক মোল্লাকে কোন মতেই দুর্গত্যাগ করিতে দিলেন না। সদ্ব্যবহারে ও সম্মান-প্রদর্শনে তাঁহাকে আয়ত্ত করিলেন। মোল্লাসাহেবও জবরদস্তখাঁর সদ্ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। শেষ একদিন তিনি সেই মণিটি জবরদস্ত খাঁর হস্তে তুলিয়া দিলেন।

মণির জ্যোতিঃ অতি উজ্জ্বল। যুগযুগান্তর হইতে বংশানুক্রমে এই পদ্মরাগ, হজরৎ দুর্গাধিকারীদের দখলে ছিল। মণিটির মূল্য বোধ হয় বহুলক্ষের উপর। জবরদস্ত খাঁ, মণিটির লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। কতবার তিনি মনে ভাবিয়াছেন যে, এই অভিশপ্ত মণিটিকে আকবর সাহের নিকট পাঠাইয়া দিই। কিন্তু তাহার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দেখিলেই তাঁহার লোভ বাড়িয়া উঠিত।

কাজেই এইটি তাঁহার নিকটেই ছিল। দুর্দৈববশে এই অভিশপ্ত পদ্মরাগটি গৃহে রাখিবার ফলে, সাবেক দুর্গাধিপতির রাজ্য গেল—প্রাণ গেল আর জবরদস্ত খাঁরও স্ত্রীপুত্রকন্যা গেল।

মোকারেব ভাবিল—এ মণি কাছে রাখিলেই একটা না একটা বিভ্রাট ঘটিবে। যদি এতদিনের পর, ইহা আকবর সাহকে ফিরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও বিভ্রাট ঘটিবে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সুনামে কলঙ্ক স্পর্শিবে—তিনি হয়ত পদচ্যুত হইবেন। এরূপস্থলে কোন দূরতর দেশে গিয়া ইহা বিক্রয় করাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু সে শয়তান আলির্খাই বা গেল কোথায়? সহসা তাহার হজরৎ-দুর্গ ত্যাগের কারণ কি? সে কি তাহা হইলে মোগল সম্রাটকে এই মণির সন্ধান দিতে গিয়াছে! পরদিন প্রভাতে মোকারেব নিজে তাহার সন্ধানে গিয়াছিল। কিন্তু গভীর বনরাজি তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া, বিফলমনোরথ হইয়া দুর্গে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই অবধি তার কোন সংবাদই নাই।

মোকারেব খাঁ মনে মনে ভাবিল "এই পর্ব্বতের অপর পারেই কাবুল নগরী। আফ্‌গানিস্থানের বাদ্‌শা ভিন্ন আর কেহই এ মণি কিনিতে পারিবে না। আকবর সাহের নিকট লইয়া যাওয়া অপেক্ষা, এ মণি লইয়া হিন্দুস্থান ত্যাগ করাই উচিত। পথে যদি অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে ইহা ফিরাইয়া দিব। না হয়, ইহা আমারই হইবে। অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক, সেই সুদূর আফগানিস্থানেই চলিয়া যাইব।"

মোকারেব তারপর মনে মনে ভাবিল—"এই হতভাগ্য আলির্খাই বা সহসা কোথায় চলিয়া গেল! সে কি তাহা হইলে দস্যু মনসুরের নিকট এই মণির সংবাদ দিতে গিয়াছে! প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া,

মোল্লার ও আমার মধ্যে সমস্ত কথা শুনিয়াছে! ছয়ঘণ্টাকাল ধরিয়া পাহাড়ের নানাস্থানে তাহাকে খুঁজিয়াছি—কিন্তু তাহার কোন সন্ধানই ত পাই নাই। যেদিক দিয়া দেখিতেছি, তাহাতেই বুঝিতেছি—আগরায় ফিরিয়া যাওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ নহে। আকবর সাহ যে কাজের জন্ত আমায় এখানে পাঠাইলেন, সে কাজ ত আমার অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে মিটিবেনা।”

এই সমস্ত ভাবিয়া, পরদিন প্রত্যুষে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া মোকারেব খাঁ অশ্বারোহণে সেই দুর্গ ত্যাগ করিল। পথের সম্বলরূপে থলিয়া ভরিয়া কিছু খাদ্য ও পানীয় লইল। পথে আত্মরক্ষার জন্য, তরবারি ও শাণিত ছুরিকা লইতে ভুলিল না—আর সেই লোক-বিশ্রুত “পদ্মরাগ” তাহার বক্ষোবসনের মধ্যে অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিল।

কোন পথে কাবুলে যাইতে হয়, তাহাও তাহার জানা নাই। তবে কাবুলের অবস্থান যে দিকে, মোকারেব খাঁ সেই দিকের পথই ধরিল।

পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, উপত্যকার পর উপত্যকা, জঙ্গলের পর জঙ্গল পার হইয়া, মোকারেব খাঁ অগ্রসর হইতে লাগিল। পরিশেষে সে এক নির্জ্জন শষ্পসম্পদময় উপত্যকা মধ্যে উপস্থিত হইল।

মোকারেব খাঁ পথশ্রমে ক্ষুৎপিপাসা সমাকুল। থলি হইতে কিছু খাদ্য বাহির করিয়া সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। নিকটে একটি ঝরণা ছিল। সেই ঝরণা হইতে জলপান করিয়া স্নিগ্ধ হইল। সহসা তাহার দৃষ্টি, দূরবর্ত্তী এক উপত্যকায় পড়িবামাত্র সে সবিস্ময়ে দেখিল, চারিজন অশ্বারোহী অতি দ্রুতবেগে সেই সংকীর্ণ উপত্যকা পথে ধাবিত হইতেছে।

মোকারেব কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে দেখিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, সেই অনুসরণকারী সেনাগণ তাহার মোগলসেনা নহে। তাহা হইলে—এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য-পথে এত ব্যস্তভাবে কে তাহার অনুসরণ করিতেছে?

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মোকারেব খাঁ সিদ্ধান্ত করিল, নিশ্চয়ই ইহারা সেই দস্যুদলপতি মনসুরের লোক। মনসুরের দলভুক্ত সকলেই শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী। তাহা না হইলে ওরূপ দ্রুতবেগে উহারা এই পর্ব্বতের চড়াইয়ের উপর উঠিতে পারিত না। নিশ্চয়ই সেই শয়তান আলি খাঁ উহাদের সঙ্গে আছে। আলি খাঁ নিশ্চয়ই তাহার ও মোল্লার মধ্যে যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা শুনিয়া অর্থলোভে শয়তান মনসুরকে পদ্মরাগমণির সন্ধান বলিয়া দিয়াছে।

মোকারেব, অশ্বকে জলপান করাইল। উপত্যকা-প্রদেশে প্রচুর তৃণ জন্মিয়াছিল—মোকারেবের ক্ষুধার্ত্ত অশ্ব, আগে সেগুলি নির্ম্মূল করিয়া উদরপূরণ করিয়াছে। তখন তাহার মনিবের প্রাণে যেমন একটা সজীব ও উৎসাহপূর্ণ ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে,তাহারও সেইরূপ। সে প্রভুকে সম্মুখবর্ত্তী হইতে দেখিয়া, সানন্দে হ্রেষারব করিয়া উঠিল। মোকারেব, এ হ্রেষারবের অর্থ বুঝিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া বসিল। দ্রুতবেগে অশ্ব-সঞ্চালন করিল।

এইভাবে এক ঘণ্টা পথ চলিবার পর, দিবা অবসান হইল। তপনদেব, সেই অভ্রভেদী পাহাড়ের পাশে ঢলিয়া পড়িলেন। সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সম্মুখের পথ আর দেখা যায় না। অশ্বও আর চলিতে চাহে না। নিরুপায় হইয়া মোকারেব এক জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

সে জঙ্গল অতি গভীর। তখনও প্রদোষের ছায়ায় তাহার কোন কোন অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় নাই। চারিদিকে বড় বড় শরগাছ।

মোকারেব :অশ্বটি লইয়া সেই শরগাছের জঙ্গলের মধ্যে লুকাইল। তাহার বিশ্বস্ত বাহনকে বলিল—"জঙ্গী! এই জঙ্গলের মধ্যে চুপ করিয়া থাক, কোনরূপ শব্দ করিও না। আমরা ডাকাতের হাতে পড়িয়াছি।"

সেই ভাষাহীন প্রাণী, প্রভুর মর্ম্মকথা বুঝিল। সে স্থির হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইল। মোকারেবও সেই জঙ্গলের মধ্যে দরী বিছাইয়া শয়ন করিলেন।

সহসা অদূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। মোকারেব প্রমাদ গণিল।

তাহার পর লোকের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। সেই চারিজন লোক তখন জঙ্গলের পাশে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের একজন বলিল,—"শয়তান গেল কোথায়, বল দেখি? তাহার জন্য যে আমাদের জান হয়রাণ হইবার উপক্রম হইয়াছে।"

আর এক জন বলিল,—"লোকটার মত হুঁসিয়ার ও পাকা সওয়ার আমি ত দ্বিতীয় দেখি নাই। এরূপ একটা লোক যদি আমরা পাই ত আমাদের অনেক বাঁকা কাজ সোজা হইয়া যায়।"

দ্বিতীয় বক্তা স্বয়ং মনসুর। মোকারেব, মনসুরকে কখনও দেখে নাই। কাজেই তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াও তাহাকে চিনিতে পারিল না।

একজন বলিল,—"শালা শয়তান এই জঙ্গলে লুকায় নাই ত? জঙ্গলটা একবার দেখিলে হয় না?"

মনসুর বলিল,—"সে নিশ্চয়ই সেই ঝরণার পার্শ্ব হইতে আমাদের দেখিয়াছে। আমরা যখন তাহাকে দেখিতে পাইয়াছি, তখন সে যে আমাদের দেখে নাই, ইহা অসম্ভব। সে যখন প্রাণভয়ে পলাইতেছে, তখন এত নিকটে কখনই আশ্রয় লইবে না। চল আমরা অগ্রসর হই। হয় ত সে এতক্ষণে অনেকটা পথ চলিয়া গেল।"

তাহারা সকলেই অশ্বারোহণে অন্য পথে চলিয়া গেল। মোকারেব খাঁ, হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সেই গভীর জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া, মোকারেব বিপরীত পথ ধরিল। দস্যুরা যে দিকে গিয়াছিল, সে দিকে না গিয়া, সে যে জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী একটি কঙ্করময় ক্ষুদ্র পথ ধরিয়া বরাবর উত্তরমুখে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শয়তানে মানুষকে আশ্রয় করিলে, তাহাকে যেমন কোন কথা কহিতে দেয় না, যে দিকে ইচ্ছা লইয়া যায়, আর সেই শয়তানগ্রস্ত হতভাগ্যও যেমন নিশ্চেষ্টভাবে তাহার অনুসরণ করে, মোকারেবের দশাও সেইরূপ হইল।

প্রাণের ভয় তাহার নাই। কারণ সে সাহসী বীরপুরুষ। তাহার ভয়, পাছে বহুকষ্টে সংগৃহীত সেই বহুমূল্য মাণিকটি তাহার হস্তচ্যুত হয়। দস্যুরা যেরূপভাবে তখনও তাহার অনুসরণ করিতেছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সেই মাণিকটি হস্তগত করিতে তাহারাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সমস্ত রাত্রি এই ভাবে কাটিল। যখন উষার আলোক ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছে, আকাশ একটু ফরসা হইয়াছে—প্রকৃতির বুকের উপর অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে, তখন সে সবিস্ময়ে দেখিল—তাহার সম্মুখে এক উচ্চ প্রাচীর। এ প্রাচীর নিশ্চয়ই কাবুল-সহরের না হইয়া যায় না।

কিন্তু নগরের প্রবেশদ্বারের সমীপবর্ত্তী হইয়া সে দেখিল, দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। সম্পূর্ণ প্রভাত না হইলে, সূর্য্যালোক ধরার বক্ষে স্বর্ণ-কিরণবৃষ্টি না করিলে, যে এই তোরণদ্বার খোলা হয় না, তাহা সে অতি সহজেই বুঝিল।

পথে জনপ্রাণী নাই। গাছের উপর পাখীগুলা, প্রভাত সমুপস্থিত দেখিয়া, থাকিয়া থাকিয়া মধুর ঝঙ্কার করিতেছে। শীতল বাতাস যেন সঞ্জীবনী শক্তি লইয়া, তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে। প্রভাত-সমীর স্পর্শে, মোকারেবের শ্রান্ত দেহ অনেকটা বলসঞ্চয় করিল।

সেই নগরপ্রাচীরের অদূরবর্ত্তী এক স্থানে একটী চতুষ্কোণ শিলাখণ্ড পড়িয়াছিল। পথশ্রান্ত মোকারেব এই শিলাখণ্ডের উপর তাহার উষ্ণীষবস্ত্র বিছাইয়া শয্যারচনা করিল। ঘোড়াটিকে এক গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া, সে সেই পাষাণ-শয্যায় শয়ন করিল।

শান্তিদায়িনী নিদ্রার মায়াময় করস্পর্শে পথশ্রান্ত মোকারেব, সকল কষ্ট ভুলিয়া স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হইল। এই সময় আর এক অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত। মোকারেব যখন নিদ্রায় অচেতন, সেই সময়ে ঊষার বিরলান্ধকারে, চারিজন লোক অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া, তাহার দিকে অগ্রসর হইল। একজন ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। তাহাদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, সে তাহার বুকের উপর বসিয়া বলিল—"শয়তান! এইবার তোর কি হয়!"

মোকারেবের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে চীৎকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, তাহার মুখ বাঁধা।

যে তাহার বুকের উপর বসিয়াছিল—সে মনসুর। মনসুর বলিল, "যখন তুই আমাদের এত কষ্ট দিয়াছিস্, তখন আমরা যে খালি

মাণিকটি লইয়া খুসী হইব, তা মনে ভাবিস্ না। তোকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া, এই গাছের তলায় পুঁতিয়া রাখিব।"

মোকারেব সহসা সবেগে পাশ ফিরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে মনস্থর তাহার বক্ষের উপর হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। মোকারেব তখনই উঠিয়া দাঁড়াইল, নিজের অস্ত্র বাহির করিতে গেল—কিন্তু তাহার সময় পাইল না। আর একজন দস্যু পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাহার মস্তকে তরোয়ালের বাঁটের দ্বারা ভীষণ আঘাত করিল। সেই আঘাতেই মোকারেব ভূপতিত হইল। মাটিতে পড়িবার সময় চীৎকার করিয়া উঠিল—"হত্যা—নরহত্যা! কে কোথায় আছ রক্ষা কর!"

মনস্থর তখনই একখানা ছোরা বাহির করিয়া, মোকারেবের বুকে বিঁধিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে কোথা হইতে একজন দীর্ঘকায় লোক আসিয়া, পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাহার গ্রীবা ধরিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। মনস্থর, সেই লোকটার মুখের দিকে চাহিবামাত্রই বুঝিল, ইহারা কাবুলপতির সেনা। সে ত একা নহে। তাহার সঙ্গে আরও সাতজন লোক। মনস্থর বুঝিল, তাহার আর নিস্তার নাই। কাবুলাধিপতি যে তাহার মস্তকের জন্য এক হাজার মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন—তাহাও সে শুনিয়াছিল।

সেনারা দস্যুচতুষ্টয়কে উত্তমরূপে বাঁধিয়া ফেলিল। প্রধান প্রহরী বলিল—"কে তোরা? জানিস্ না আমাদের বাদসার রাজ্য কিরূপ সুশাসিত? তাঁহার রাজধানীর নিকটে এই নরহত্যা!"

দস্যুদের কেহই কোন কথা কহিল না। মনস্থর কেবলমাত্র বলিল—"পরিচয় দিতে আমরা বাধ্য নই। ইচ্ছা হয়, তোমরা আমাদের আটক করিতে পার।"

একজন কাবুলী-সেনা, তাহার বক্ষ হইতে একটি ক্ষুদ্র বংশী বাহির করিয়া সঙ্কেতধ্বনি করিল। সেই সঙ্কেতধ্বনির কঠোর শব্দ, বায়ুস্তরে বিলীন হইতে না হইতে, আরও চারিজন সেনা সেই স্থলে উপস্থিত হইল। যে সঙ্কেতধ্বনি করিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া তাহারা মস্তক অবনত করিয়া সেলাম করিল। এই ব্যক্তিই কাবুলাধিপতির প্রধান পুরীরক্ষক।

সে বলিল—"তোমাদের দুইজন এই মূর্চ্ছিত দেহ সাহজাদীর কাছে লইয়া যাও। তিনি যেরূপ আদেশ করিবেন, সেইরূপ করিও। তাঁহার আদেশেই, এই বিপন্নের উদ্ধারের জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি। তোমরা দুইজন আমাদের সঙ্গে থাক। এই চারিটা শয়তানকে নিরাপদে কয়েদখানায় পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।"

আদেশ প্রাপ্তিমাত্র, প্রহরীরা মোকারেবের মূর্চ্ছিত দেহ তুলিয়া লইয়া প্রাসাদের দিকে গেল। আর বাকী ছয়জন প্রহরী, সেই দস্যু-দের বন্দী করিয়া তোরণদ্বার দিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন নগরদ্বার খোলা হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

"আমি কোথায়?"

কেহ এ কথার উত্তর দিল না। মোকারেব এক সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে, এক দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়া আছে। সে কক্ষ[illegible] স্বর্ণ-[illegible] মত। কক্ষতল মর্ম্মরমণ্ডিত। ছাদের উপর বিচিত্র গোলাপীর

কাজ করা। দেওয়ালের গায়ে লতাপাতা ও ফুল। কক্ষের সর্ব্বত্রই মিনার কাজ।

মোকারেব কক্ষসজ্জা দেখিয়া যথেষ্ট বিস্মিত হইল। তাহার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। তাহার মনে পড়িল—সে এক খণ্ড পাষাণের উপর শয্যারচনা করিয়া পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য শয়ন করিয়াছিল। তারপর তাহাকে ডাকাতেরা আক্রমণ করে। ইহার পরের কথা আর তাহার কিছুই মনে পড়ে না।

মোকারেব আবার ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমি কোথায়?"

এক যুবতী আসিয়া মোকারেবের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার মুখমণ্ডল উন্মুক্ত। সে পরমা সুন্দরী। সে যেন সেই তুষারমণ্ডিত, পার্ব্বত্য-প্রদেশের স্বপ্নময়ী রাণি।

সে কোমল কণ্ঠে বলিল—"সাহেব! আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই। আপনি উত্তম স্থানেই আছেন। কিন্তু বেশী কথা কহিবেন না। চিকিৎসকের নিষেধ।"

মোকারেব বলিল—"আমি একটি মাত্র প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি। আপনার দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইতেছে—আপনি পরম করুণাময়ী। আপনি কে? আপনার পরিচয় দিন।"

সেই রমণী বলিল—"আমি সাহাজাদী জুলেখার বাঁদী।"

মোকারেব বিস্মিতভাবে অস্ফুটস্বরে বলিল—"বাঁদী! বাঁদীর এত রূপ! না জানি ইহার কর্ত্রী দেখিতে কেমন!" এই কথা শুনিয়া সেই বাঁদী যেন একটু লজ্জিতা হইল। রূপের প্রশংসা শুনিলে অনেক রমণীরই, এইরূপ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই প্রশংসাটা যদি পুরুষের মুখে হয়।

মোকারেব বলিল—"আমি এখানে আসিলাম কিরূপে?"

বাঁদী বলিল—"মহাপরাক্রান্ত, আফগানিস্থানের সম্রাট্ দোস্ত মহম্মদ খাঁর কন্যার করুণায় ও অনুগ্রহে। যেদিন প্রভাতে আপনাকে ডাকাতে আক্রমণ করে, সেদিন সাহজাদী জুলেখা প্রাতর্ভ্রমণে [illegible] বাহির হইয়াছিলেন। আপনি যেস্থানে মূর্চ্ছিত হন, তাহার অতি নিকটেই তাঁহার "দেল্-আরাম" নামক প্রমোদোদ্যান। সাহাজাদী চীৎকার শুনিতে পাইয়াই প্রহরীদের আপনার উদ্ধারার্থে প্রেরণ করেন।"

মোকারেব যোড়হস্তে, উর্দ্ধদিকে চাহিয়া বলিল—"খোদাই ধন্য।" তারপর সে তাহার আঙ্গরাখার সেই নিভৃত স্থানটি অনুসন্ধান করিল ও মহোৎসাহে বলিল—"খোদা মেহেরবান।" কারণ সে মাণিকটি দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হয় নাই, যথাস্থানেই আছে।

মোকারেব অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল, "যিনি এ হতভাগ্যের জীবনরক্ষা করিয়াছেন, যিনি মূর্ত্তিমতী করুণারূপে, এক আশ্রয়হীন পথিককে মহাবিপদের সময় আশ্রয় দিয়াছেন—সেই সাহজাদীকে কি আমি একবার দেখিতে পাইব না?"

বাঁদী বলিল—"উপযুক্ত সময়েই আপনি তাঁহার দেখা পাইবেন। এখন আপনি বেশী কথা কহিবেন না। একটু স্থিরভাবে থাকুন। আপনার মাথার আঘাত অতি গুরুতর। হকিমের নিষেধ, যেন কোনরূপে আপনার মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি না হয়।"

বাঁদী একটি পাত্রে ঔষধ ঢালিয়া, মোকারেবের সম্মুখে ধরিল। মোকারেব সেই ঔষধ পান করিল। ঔষধের ক্রিয়াবশে, অচিরকাল-মধ্যে নিদ্রা আসিল। মোকারেব, নিদ্রায় এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল, অতুলনীয়া সুন্দরী, অপ্সরোরূপিণী অনুপমেয় জুলেখা যেন শয্যাপার্শে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে।

কি সুন্দর রূপ! এ রূপ যে দেবলোকে দুর্লভ। এ রূপের যে তুলনা নাই। মুখ চোখ, যেন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর সজীব চিত্রের পূর্ণ সাফল্য। চূর্ণ অলকার সৌন্দর্য্য কি মনোহর! রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধরাবলম্বী মৃদু হাস্যের কি একটা উন্মাদিনী শক্তি! মোকারেব মানসিক উত্তেজনা-বশে চীৎকার করিয়া বলিল—"জুলেখা! সাহজাদী! আমি অতি দুর্ভাগ্য! আমার প্রতি করুণা কর—আমার উপর সদয় হও।"

ঠিক্ এই সময়ে নিদ্রিত মোকারেবের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, সাহজাদী জুলেখা অতি মৃদুস্বরে তাঁহার বাঁদীর সহিত কথোপকথন করিতে-ছিলেন। সহসা সেই নিদ্রিত মুসাফেরের মুখে, তাঁহার নামোচ্চারিত দেখিয়া, জুলেখা লজ্জায় সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—o—

ইহার পর আরও এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। মোকারেব এখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ।

একদিন আফ্‌গানেশ্বর, তাহাকে দেখিতে আসিলেন। মোকারেবও পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছিল যে, আফ্‌গান-মুল্লুকের বাদশা তাহাকে দেখিতে আসিবেন।

মোকারেব মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করিল। সে মনোমধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল—তাহার জীবন বহুমূল্য, কি এই মণি বহুমূল্য! এ মণির জন্য যে তাহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। এ মণি লইয়া তাহার কি হইবে? বাজারে বিক্রয় করিতে গেলে, দিল্লী আগরার মণিকারের বিপণী ভিন্ন, আর কোথাও ইহা বিক্রীত হইবে

না। এত দাম দিয়া এ রত্ন কিনিতে অপরে ত সমর্থ হইবে না। আগরায় এই মণি বিক্রয় করিতে হইলে, সম্রাটের মুকিম যোধ্‌মল শেঠীর গদিতেই যাইতে হইবে। যোধ্‌মলের নিকট এ মণি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে গেলে, কথাটা নিশ্চয়ই আকবরসাহের কাণে উঠিবে এবং তাহাতে তাহার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে। পরিশেষে তাহার স্থিরসিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইল যে, "হজরতের মাণিক" কাছে রাখিলে যখন এত বিপদ্, তখন ইহাকে বিদায় করাই উচিত।'

আফ্‌গানেশ্বরের অন্য সন্তানসন্ততি নাই। কেবল এই একমাত্র কন্যা জুলেখা। সম্রাটের নয়নের মণি এই কন্যা জুলেখা পিতার অনুমতি লইয়াই এই আহত পথিকের সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল।

আফ্‌গানেশ্বর, তাঁহার রাজ্যের প্রধান সচিবদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া মোকারেব যে কক্ষে ছিল, তথায় দেখা দিলেন।

মোকারেব নতজানু হইয়া, সম্রাটের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে, কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কহিল—"সাহানশা! আপনার করুণাময়ী কন্যার দয়াতেই আমার, ছার জীবন বাঁচিয়াছে। আমি সেই করুণারূপিণী দেবীকে চক্ষে দেখি নাই, কিন্তু মনে মনে তাঁহার দেবী প্রতিমার, এক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি! খোদার এ দুনিয়ার তিনি অতি দুর্লভ রত্ন। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইবার শক্তি আমার নাই, সামর্থ্য আমার নাই। আমি হিন্দুস্থানের সম্রাট্ আকবর সাহের অধীনস্থ, একজন সামান্য সৈনিক। হজরৎ-দুর্গাধিপতি, জবরদস্ত খাঁর কনিষ্ঠ সহোদর।"

এই পরিচয়ই যথেষ্ট হইল। আফ্‌গানেশ্বর বলিলেন, "তোমার জ্যেষ্ঠ আমার বিশেষ স্নেহভাজন। তিনি হজরৎ-দুর্গের ভারপ্রাপ্ত হইয়া, একবার গজনাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। শুনিয়া

সুখী হইলাম, তুমি জবরদস্ত খাঁর কনিষ্ঠ। আরও আনন্দের কথা এই, আমার কন্যার শুশ্রূষায়, আমার এক বন্ধুর সহোদরের জীবন রক্ষা হইয়াছে।”

মোকারেব আবার নতজানু হইয়া আফগানেশ্বরের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিলেন। আফ্‌গানেশ্বর মোকারেবের হস্তধারণ করিয়া তাহাকে বলিলেন—“তুমি এখন বড় দুর্ব্বল, ঐ আসনে উপবেশনই কর। আমি অনুমতি দিতেছি।”

সম্রাট্‌ অন্য এক আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—“তুমি কাবুলে আসিলে কিরূপে? তোমার সঙ্গে রক্ষকমাত্র ছিল না—ব্যাপার কি?”

তখন মোকারেব খাঁ, অশ্রুপূর্ণনেত্রে হজরৎ-দুর্গের সমস্ত ব্যাপার আফ্‌গানসম্রাটের নিকট ব্যক্ত করিলেন। সম্রাট্‌ সে ভীষণ কাহিনী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

তিনি উজীরকে বলিলেন—“যে চ[illegible] ডাকাতকে সেদিন কারাবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই [illegible]য়তান মনসুরের দলের লোক। আমার আদেশ—আজই তাহা[illegible] ধাবক্ষ ভুপ্রোথিত করিয়া কাবুলি-কুকুর দিয়া খাওয়ান হইবে। [illegible]ই চারিজনের মধ্যে যে লোকটা খুব মোটা, খুব কৃষ্ণবর্ণ, সেই [illegible] জবরদস্ত খাঁ ইহাকে ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করি[illegible] ছ[illegible] তাহার মুখেই আমি তাহার ঐরূপ আকৃতির কথা শু[illegible]ছিলাম।”

মোকারেব কৃতজ্ঞচিত্তে, তাহার বক্ষোবস্ত্র হইতে সেই পদ্মরাগমণি বাহির করিয়া, আফগানেশ্বরের নিকটে ধরিল। নম্রস্বরে বলিল—“সাহানশা! এ দীন কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য এই লোকবিশ্রুত মণিটি আপনাকে উপহার দিতেছে—ইহাই দেশবিখ্যাত “হজরতের মাণিক।”

"হজরতের মাণিক!" এ যে বহুমূল্য রত্ন! আমি জানি, পাঁচ-লাখ টাকা ইহার মূল্য। বৎস! আমি তোমার এ সাদর উপহার অমূল্য মাণিক গ্রহণ করিলাম।"

আফগানেশ্বর কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। তৎপর প্রসন্নমুখে বলিলেন—"মোকারেব! আফগানরাজ্যেশ্বর কাহারও নিকট কৃতোপকারের মূল্য গ্রহণ করেন না। দান-প্রতিদান, সংসারের নিত্য ক্রিয়া। তুমি যেমন আমায় এই বহুমূল্য মাণিকটি দিয়াছ, ইহার পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে আর একটি দুষ্প্রাপ্য রত্ন দিব। আমি তোমার বংশ-পরিচয় জানি! তুমি পবিত্র সৈয়দবংশসম্ভূত। আমার পুত্র সন্তান নাই—সিংহাসনের অধিকারী নাই। খোদা তোমাকে ঘটনাচক্রের অধীন করিয়া, আমার রাজধানীতে উপস্থিত করিয়াছেন। এই জড় মাণিকের পরিবর্ত্তে, আমি তোমাকে একটি জীবন্ত মাণিক দিব।"

আফ্গানপতি তৎক্ষণাৎ তাঁহার উজীরকে কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন। তৎপরে উজীরের সহিত সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

মোকারেব খাঁ মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। সে মনে মনে স্থির করিতে পারিল না, আফ্গান বাদসার প্রতিশ্রুত এ জীবন্ত মাণিকটা কি? অগত্যা সে শয্যায় শয়ন করিল।

* * * * * *

একঘণ্টা পরে, আফ্গান বাদসার, এক পার্শ্বচর আসিয়া মোকারেবকে সেলাম করিয়া বলিল—"জাঁহাপনা আপনাকে তলব করিয়াছেন। তিনি পার্শ্বের কক্ষে আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

মোকারেব মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই প্রহরীর পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। সেই কক্ষে

"বৎস ! এই মাতৃহীনা কন্যা—আমার নয়নমণি, জুলেখাকে তোমায় দিলাম।"—৯১ পৃঃ

গিয়া দেখিল, স্বয়ং বাদসাহ, বৃদ্ধ উজীর ও আরও কয়েকজন পার্শ্বচর সেই কক্ষে উপস্থিত।

আর সেই কক্ষমধ্যে অতুলনীয় রূপশালিনী জুলেখা। মনোরম পরিচ্ছদে বিভূষিতা, সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা জুলেখার কমনীয় সৌন্দর্য্যে সেই কক্ষ যেন দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছে।

সম্রাট্ মোকারেবকে স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন—"বৎস! এই মাতৃ-হীনা কন্যা—আমার নয়নের মণি, জুলেখাকে তোমায় দিলাম। এর পর তুমি মনে মনে বিচার করিও তোমার "হজরতের মাণিক" অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠরত্ন কি না। আমার সন্তানাদি নাই—তুমিই আমার মৃত্যুর পর এ রাজ্যের অধীশ্বর।" মোকারেব অবনত-মস্তকে সহর্ষচিত্তে আফ্‌গানসম্রাটের প্রদত্ত অমূল্য উপহার গ্রহণ করিলেন।

"হজরতের মাণিকের" বিনিময়ে, মোকারেব যে অমূল্য-রত্ন প্রাপ্ত করিলেন—তাহার মূল্য কত, সারাজীবন ধরিয়া ভাবিয়াও তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই।

আলেখ্য।

আলেখ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রালোকিত যমুনাতীরে, এক নিভৃত কুঞ্জবাটিকায় দাঁড়াইয়া, দুইজনে কথোপকথন করিতেছিল। মধুর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, চন্দ্রের বিমল রজত-রশ্মি, যমুনার ঘনকৃষ্ণ সলিলে, সৈকত ভূমিস্থ প্রস্তরময় সোপান-সমূহে, আর সেই দুইজনের মুখে পড়িয়া, বড়ই শোভা পাইতেছিল। প্রকৃতি নিস্তব্ধ এবং সুবিমল শশিকর-প্লাবিত। জ্যোৎস্না-বিধৌত শ্বেতবর্ণ পুষ্পরাজি, নৈশ সমীরণের বুকে সুগন্ধ বিকীর্ণ করিয়া, নীরবে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাতলে বিশ্রাম করিতেছিল।

একজন বলিতেছে,—"তিলোত্তমে! অসার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ফল কি? তাহাতে কেবল যাতনা বাড়িবে বই ত নয়? তোমার পিতার শেষ কথা ত তোমাকে বলিয়াছি। আমি দরিদ্র, তুমি ঐশ্বর্য্যশালীর কন্যা। যদিও আমি তোমার সহিত বংশ-গৌরবে সমকক, কিন্তু আমি কপর্দ্দকমাত্র সম্বল বিহীন। তোমার পিতা কেন তোমাকে, আমার মত দরিদ্রের করে সমর্পণ করিবেন? তাই বলিতেছি, বৃথা কেন আমার জন্য কষ্ট পাও? তুমি সুপাত্রে সমর্পিতা হও। চিরজীবন তোমার ঐ সমুজ্জল মূর্ত্তি, মধুর গুণাবলী স্মরণ করিয়া, ভগিনীর ন্যায় আমি তোমায় স্নেহ করিব।"

তিলোত্তমা এ কথার কোন উত্তর করিল না। কেবল যন্ত্রণার অনলময় অশ্রু-রাশিতে, তাহার নয়ন-যুগল ভাসিতে লাগিল। তাহার কোমল হৃদয় নিপীড়িত করিয়া একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল।

যুবক একদৃষ্টে কিশোরীর সেই কৌমুদী-বিধৌত অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"তিলোত্তমে! তোমার এক একটী অশ্রুবিন্দু, আমার হৃদয়ে শত শত বিষাক্ত ছুরিকার আঘাত করিতেছে। আমি তোমার কষ্টের কারণ হইয়াছি, এ কথা ভাবিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া, আমাকে ভালবাসিয়া, তুমি যেমন সুখী হও, আমারও ত সেইরূপ হয়। আমাদের মিলন যদি বিধাতার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে কেহই আমাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। আমি আজ দেশ ছাড়িয়া, তোমার স্নেহময় সঙ্গ ছাড়িয়া চলিলাম, যদি কখনও অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, তবে আবার আসিয়া তোমার সঙ্গে মিলিব।"

তিলোত্তমা এ কথার কোন উত্তর করিল না। অবনত মুখে কেবল আর একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল। সেই মর্ম্মবেদনা-ময় নিশ্বাসের ভাষা, কেহই বুঝিল না।

কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া তিলোত্তমা ব্যাকুলস্বরে কহিল—"আমি তোমার সঙ্গে যাইব—তোমার জন্য আমি পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিব।"

"তুমি আমার সঙ্গে যাইবে! বল কি তিলোত্তমে? তোমার পিতা কি মনে করিবেন? তোমার পিতার শত্রুগণই বা কি মনে করিবে? প্রতিবেশীমণ্ডলী ও সমাজ কি মনে করিবে? আর আমিই বা কোন্ সাহসে তোমায় লইয়া যাইব? আমার এ প্রকার ব্যবহারে তোমার পিতার বংশগৌরবের জ্যোতি, চিরকালের জন্য মলিন হইবে। তোমার

জন্য এ জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তোমার হিতের জন্য এ হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া দিতে পারি—কিন্তু কৃতঘ্নতার পরিবর্ত্তে তোমায় লাভ করিতে চাহি না। এই ঘটনায় তোমার পিতা মনস্তাপ পাইয়া হয় ত আত্মনাশও করিতে পারেন। তিলোত্তমে! ও কথা আর মুখে আনিও না। তোমার পিতার জীবনের মূল্যে—তাঁহার শোকসন্তপ্ত চিত্তের রুষ্টাভিশাপের পরিবর্ত্তে—আমার কৃতঘ্নতার বিনিময়ে, তোমায় লাভ করা অপেক্ষা, শত জন্ম তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।"

কথাগুলি তিলোত্তমার কোমল মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিল। সে ঘোরতর নৈরাশ্যব্যঞ্জক-স্বরে প্রশ্ন করিল—"তবে কি আর কোন উপায়ই নাই—রঞ্জনলাল?"

"উপায় আছে বই কি। একমাত্র উপায়, আমার বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন। তিলোত্তমে! আমার বংশ-গৌরবে, তোমার পিতার কোন আপত্তিই নাই। তাঁহার আপত্তি এই যে, তাঁহার একমাত্র কন্যাকে, তিনি আমার মত দরিদ্রের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত নহেন। তবে এ ক্ষেত্রে আমার জন্য তিনি একবৎসর অপেক্ষা করিবেন একথাও বলিয়াছেন। এই এক বৎসরের মধ্যে, যদি আমার অদৃষ্টে প্রচুর ধনলাভ হয়, আমার অদৃষ্টের কোন শুভ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তবেই আমি তোমাকে লাভ করিতে পারিব। জানিও তিলোত্তমে! আমাদের উভয়ের প্রণয় যদি অকৃত্রিম ও পবিত্র হয়, তাহা হইলে বিধাতার করুণা আমাদের মিলন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিবে।"

কথাটা শেষ না হইতে হইতেই—সেই চন্দ্রকিরণ-মণ্ডিত ফেণময় তরঙ্গরাজির উপর তীব্র ক্ষেপণীচালনশব্দ পরিশ্রুত হইল। রঞ্জনলাল সোৎসুকে বলিলেন—"তিলোত্তমে! আর না, আমার নৌকা

আসিতেছে। নৌকায় আরও দুই জন সহযাত্রী আছে—আমি উহাদের সহিত আগরায় যাইব। যদি জগদীশ্বরী কখনও দিন দেন, তবে অদ্য হইতে দ্বাদশ পৌর্ণমাসীর পূর্ব্বে, তোমার সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিব। তোমার পিতা যখন এক বৎসর অপেক্ষা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তাহার অন্যথা হইবে না।” রঞ্জনলাল এই কথা বলিয়া, ধীর পদবিক্ষেপে সেই সৈকতভূমি অতিক্রম করিয়া নৌকায় উঠিলেন। হৃদয়ের যাতনা-ব্যঞ্জক এক মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘনিশ্বাস, ধীরে ধীরে সেই ঘনকৃষ্ণ নদীবক্ষোব্যাপী তরঙ্গোচ্ছ্বাস শব্দমধ্যে মুহূর্ত্তে মিশাইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

তিলোত্তমার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিলোত্তমা এলাহাবাদের কোন এক বিখ্যাত শ্রেষ্ঠীর কন্যা। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে গৌরবান্বিত সম্রাট্ আকবরসাহ, দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। তিলোত্তমার পিতার নাম ধনশ্রী দাস। ধনশ্রী দাস, আকবরের সভায় একজন বিখ্যাত রত্নবণিক্। ধনশ্রীর সম্মানের যথেষ্ট পরিচয় এই যে, দিল্লীশ্বর তাঁহাকে বড়ই অনুগ্রহ করিতেন। তিলোত্তমা যখন আট বৎসরের বালিকা, তখন সে একবার পিতার সঙ্গে আগরায় গিয়াছিল। বাদসাহ বালিকার সেই প্রভাত-কমলবৎ অপরিস্ফুট সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন—“ধনশ্রী! তোমার কন্যা এক দিন রূপলাবণ্যে সমস্ত হিন্দুস্থান উন্মত্ত করিয়া তুলিবে।”

তিলোত্তমাও পিতার একমাত্র সন্তান। অল্প বয়সে মাতৃহীনা; সুতরাং পিতার আরও আদরের সামগ্রী। ধনশ্রী, তিলোত্তমার জন্য সুপাত্র অনুসন্ধানেরও ত্রুটি করেন নাই। নানাস্থান হইতে সম্বন্ধও আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনটীই তাঁহার মনোনীত হয় নাই। দূরদেশ হইতে দুই একটী সম্বন্ধ আসিয়াছিল বটে এবং পাত্রও ধনশ্রীর মনের মত, কিন্তু অতি দূর বলিয়া তিনি সম্মত হইলেন না।

রঞ্জনলাল আশ্রয়হীন, পিতৃমাতৃহীন যুবক। রঞ্জনের পিতাও ধনশ্রীর সমব্যবসায়ী। কিন্তু তিনি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধনশ্রীর অপেক্ষা তিনি অধিক উপায় করিতেন, কিন্তু অপব্যয়ে তাঁহার সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। রঞ্জনলাল যখন দশ বৎসরের, তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাহার পিতাও, পরবৎসর ইহলীলা সংবরণ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর, রঞ্জনলাল নিরাশ্রয় হইয়া একাকী সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। ধনশ্রী, রঞ্জনলালের নিঃসহায় অবস্থা দেখিয়া তাহাকে নিজ গৃহে আনিয়া, পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

ধনশ্রীর গৃহিণী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রঞ্জনলাল মাতৃ-শোক ভুলিয়াছিল। দুইটী বালক-বালিকা একত্রে আহার করিত। তিনি তাহাদের দুই জনকে দুই পার্শ্বে শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইতেন। প্রভাতের সুলোহিত কিরণরেখা মাখিয়া, যমুনা যখন মৃদু বাতাসে লহরী তুলিয়া আপন মনে উজান বহিত, বালক-বালিকা তখন রাশি রাশি প্রস্ফুটিত ফুল কুড়াইয়া লইয়া, যমুনার সুনীল-সলিলে ভাসাইয়া দিত। "ঐ আমার ফুলটা আগে ভাসিয়া গেল, রঞ্জনদাদার ফুল ত বেশী দূরে গেল না"—বালিকা এইরূপ কত কথা বলিয়া উচ্চরবে করতালি দিয়া হাস্য করিত। শ্যামল-পল্লবাবৃত বৃক্ষশাখায় বসিয়া, পাপিয়া

যখন কাতরকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিত, আর সেই মধুর স্বর যখন প্রভাত বায়ু পরিচালিত হইয়া, নীল গগনের অন্তহীন কোলের চারিদিক ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়িত, বালিকা তখন কোমল কর-পল্লবে মুখখানি ঢাকিয়া, পাপিয়ার সেই কোমল স্বর অনুকরণ করিয়া ডাকিয়া উঠিত। রঞ্জন না খাইলে বালিকা খাইত না, রঞ্জনলাল পাঠ বলিয়া না দিলে বালিকা পড়িত না, রঞ্জন দাদা বাগানে বেড়াইতে না গেলে বালিকা সেদিকে যাইত না, রঞ্জন দাদা ফুল গুছাইয়া না দিলে, বালিকা মালা গাঁথিত না। তাহাদের এই বাল্য-সৌহার্দ্দ্য দেখিয়া, গৃহিণী কখন কখন বলিতেন,—ইহারা যেন এক বৃন্তে দুইটী ফুল—আমি ইহাদের বিবাহ দিব।”

গৃহিণী যদি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ইহাদের বিবাহের কোন অসম্ভাবনাই থাকিত না। এমন কি, রঞ্জনলালের পিতাও যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলেও এই বালক বালিকার মিলন সুদূর-পরাহত হইত না।

সংসারে কতকগুলি লোক আছে—পরের অনিষ্ট করিতে পারিলেই তাহাদের আনন্দ হয়। এ ব্যাপারে, তাহাদের নিজের স্বার্থ অগ্রসর হয়—হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহা না হইলেও তাহারা স্বভাব ছাড়িয়া পথ চলে না। এই সময়ে ধনশ্রীর কাছে এই প্রকার কতকগুলি লোক আসিয়া জুটিল। তাহাদের চেষ্টা—রূপবান্ দরিদ্র রঞ্জনলালের সহিত ধনশ্রীর রূপসী কন্যার বিবাহ যেন না হয়। এজন্য নানাপ্রকার কাণাঘুষা চলিতেছে দেখিয়া, ধনশ্রীর মনে ইচ্ছা থাকিলেও, তিনি রঞ্জনের সহিত তিলোত্তমার বিবাহ-বিচ্ছেদে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন।

তিলোত্তমা বালিকা—তাহার কোন দোষ নাই; কিন্তু রঞ্জনলাল

তাহার সম্মুখে প্রলোভনের মত বসিয়া থাকে কেন? ধনশ্রী ভাবিলেন, রঞ্জনলালকে কোন ছলনায় বাটী হইতে বিদায় করিতে না পারিলে, তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি দুরূহ হইয়া উঠিবে।

সাত পাঁচ ভাবিয়া, তিনি একদিন রঞ্জনলালকে ডাকাইয়া বলিলেন—"দেখ, তিলোত্তমা এখন বড় হইয়াছে—আর তোমাদের উভয়ের একত্রে থাকা ভাল দেখায় না, এবং তোমারও নিশ্চেষ্ট হইয়া চুপ করিয়া, ঘরে বসিয়া থাকা উচিত নয়। এই সময় হইতেই তোমার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা আবশ্যক। অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে, অদৃষ্ট কখন প্রসন্ন হন না। আমি জানিয়াছি, তিলোত্তমা তোমার প্রতি আসক্তা—তোমাকে তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে অন্তরাল না করিতে পারিলে, সে তোমায় ভুলিবে না। তোমায় আমি এতদিন পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছি। কিন্তু অলসতার প্রশ্রয় দিয়া, তোমায় অকর্ম্মণ্য করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার এক প্রিয় সুহৃদের নামে তোমায় একখানি অনুরোধ-পত্র দিতেছি—তিনি আগরা-সহরের একজন গণনীয় মহাজন। বাদসাহের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে। আমার অনুরোধে তিনি তোমাকে বাদসাহ-সরকারে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। তুমি যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহাতে নিশ্চয়ই তোমার উন্নতি হইবে। মনে রাখিও, তোমার জন্য আমি একবৎসর কাল অপেক্ষা করিব, ইহার মধ্যে তুমি যদি নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে পার, তাহা হইলে তিলোত্তমার সহিত তোমার বিবাহও অসম্ভব হইবে না।"

রঞ্জনলাল নির্ব্বাক্ হইয়া, স্থিরভাবে এই সব শ্রুতিকঠোর কথা শুনিলেন, কোন কথার প্রতিবাদ করিলেন না—কারণ তাঁহার সেরূপ করিবার অধিকার নাই। নতশিরে ধনশ্রী-প্রদত্ত অনুরোধপত্র ও

পাথেয়স্বরূপ ত্রিশটী মুদ্রা লইয়া রঞ্জনলাল ভগ্ন-হৃদয়ে নীরবে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরতার সহিত, ভগবানকে স্মরণ করিয়া কর্ম্মস্রোতে ভাসিলেন। অশ্রুজল লইয়া তিনি ধনশ্রীর বাড়ীতে ঢুকিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই সঙ্গে লইয়া তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিলেন।

বলা বাহুল্য, রঞ্জনলালের সেই দিনের সেই অশ্রুপূর্ণ মুখখানি, ধনশ্রী ইহজীবনেও ভুলেন নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘনকৃষ্ণ সলিলরাশি হৃদয়ে ধরিয়া—সুবর্ণসম সৌরকর অঙ্গে মাখিয়া, শ্যাম-সোহাগিনী কালিন্দী, কুলকুলরবে জাহ্নবী-সঙ্গমে চলিয়াছে। উপরে সুনীল আকাশ, অনন্তের বিশ্বব্যাপী প্রতিকৃতি। সেই নীল আকাশের নীচে—শুভ্র-তুলারাশিবৎ অগণ্য মেঘখণ্ড এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়াইতেছে। যমুনার উপরেই লোহিতবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত কঠোরকায় প্রকাণ্ড দুর্গ। যেন কালো যমুনা ও নীল আকাশের মধ্যে একমাত্র বিরাট ব্যবধান। রঞ্জনলাল, আগরা-দুর্গের ঘাটে অবতরণ করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যমুনা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে—তাহার সৈকতময় কূলে, আকবর সাহের এই বিশাল-দর্শন দুর্গ। দুর্গের উপর হইতে সেই সময়ে মধুমাখা ভৈরবী রাগিণীতে, মধুর নহবৎ বাজিতেছিল। রঞ্জনলাল আগ্রহবশে যেমন দুর্গের সর্ব্বোচ্চ মিনারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার মাথার পাগড়ীটি ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

নিকটে কতকগুলি বালক খেলা করিতেছিল—তাহারা উচ্চৈঃস্বরে করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠায়, রঞ্জনলাল যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

মোগল-রাজত্বের এই সময়ে পূর্ণ বিকাশের অবস্থা। আগরা ধন-জন-ঐশ্বর্য্য ও প্রাসাদরাজি পরিপূর্ণ। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই যেন ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ। আমীর ওমরাহগণের, রক্ত নীল, হরিদ্রাভ, বিশালকায় সৌধ, জনসংঘময় বিবিধ পণ্যরাজিপূর্ণ সুবিস্তৃত পণ্যশালা, জনতা-সঙ্কুল মনোরঞ্জন প্রমোদ-উদ্যান, যাহা কিছু দেখিবে তাহাতেই যেন চারিদিকে ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ। কোথাও বা বিচিত্র রাগ-রাগিণীতে নহবৎ বাজিতেছে, কোথাও বা মৃদঙ্গের মৃদুগম্ভীর নিনাদের সহিত সমতালে, গম্ভীরকণ্ঠ কলাবৎগণ, খেয়াল ধ্রুপদের আলোচনা করিতেছে—কোথাও বা যুবতীর কোমলকণ্ঠ, সারঙ্গের সুরের সহিত মিশিয়া, মোহময় কাকলী উৎপাদন করিতেছে—আবার কোন স্থান বা সৈনিকের প্রবল অস্ত্র-ঝন্‌ঝনায় প্রতিধ্বনি-পূর্ণ হইতেছে।

রাজপথে অগণ্য জনস্রোত। যেন অনন্তের সূক্ষ্ম রেখা কোথা হইতে আরম্ভ হইয়া কোথায় গিয়া শেষ হইবে, কেহ বলিতে পারে না। কোথাও বা নানা বর্ণে চিত্রিত হস্তিবৃন্দ, হস্তিপকের দ্বারা চালিত হইয়া, দর্পভরে রাজপথ অতিক্রম করিতেছে—কোথাও বা তাঞ্জামে চড়িয়া কোন ওমরাহ, রাজসভায় চলিয়াছেন—আবার কোথাও বা শত শত মদগর্ব্বিত অশ্বের হ্রেষারব, সৈনিকের কোষ-নিবদ্ধ তরবারি-ঝন্‌ঝনার সহিত মিশিয়া, রাজপথকে শব্দাকুলিত করিতেছে। রঞ্জনলাল এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে, চক অতিক্রম করিলেন। ধনশ্রী তাঁহাকে যে অনুরোধপত্র দিয়াছিলেন, মর্ম্মজান্

এবং অভিমানবশে তিনি তাহার কোনরূপ ব্যবহার করিলেন না। ধনশ্রীর সেই আত্মীয়ের নিকট না গিয়া, তিনি একেবারে তাঁহার প্রিয়বন্ধু প্রতাপরায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

বাড়ীর সন্ধান করিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইল না—কারণ, প্রতাপরায়ের নাম আগরার ছোট বড় সকলেই জানিত। তিনি আগরার একজন বিখ্যাত তসবীরওয়ালা। যত বড় বড় আমীর—ওমরাহ, এমন কি স্বয়ং আকবর বাদসাহ পর্য্যন্ত—তাঁহার খরিদ্দার।

প্রতাপের যশ, তাঁহার নিজার্জ্জিত নহে। তাঁহার পিতা দিল্লী ও আগরার একজন প্রধান চিত্রকর ছিলেন। চিত্রবিদ্যা-অবলম্বনে তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। একমাত্র পুত্র প্রতাপই, তাঁহার বিস্তৃত কারবারের উত্তরাধিকারী। প্রতাপও পিতার গুণ পাইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অল্প বয়সে, চিত্রাঙ্কণ কার্য্যে আগরায় কেহ অতদূর প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রতাপ, রঞ্জনের বাল্যকালের বন্ধু। অনেক দিনের পর, দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইল। দুই জনেই যথেষ্ট আন্তরিক প্রীতি-লাভ করিলেন। রঞ্জনের মুখে তাঁহার স্বদেশ-ত্যাগের কারণ অবগত হইয়া, তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং যত শীঘ্র পারেন, তাঁহার একটী কর্ম্ম করিয়া দিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুতি করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন গেল—প্রতিদিন প্রভাতে যেমন প্রকৃতির হরিত-বর্ণ মস্তকে সমুজ্জ্বল হিরণ্য-প্রবাহ বর্ষণ করিয়া, প্রভাত-সূর্য্য প্রাচীদিকে উদিত হইয়া থাকেন, আর সন্ধ্যা-প্রারম্ভে ঘোরতর রক্তাভ কিরণ-মালায় যমুনার কাল জল ও আকবরের লোহিতকায় পাষাণ-দুর্গ রঞ্জিত করিয়া থাকেন, সেই রূপই করিতে লাগিলেন—কিন্তু রঞ্জনের কাজ কর্ম্মের কোন সুবিধাই হইল না।

অনন্তকালের ক্ষুদ্রতম অংশ হইলেও কর্ম্মহীন অবস্থায় দিন কাটান রঞ্জনের পক্ষে অতি দুরূহ হইয়া উঠিল। তিলোত্তমার সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাঁহার মনের যে সুখ নষ্ট হইয়াছিল, আগরার বিশাল ঐশ্বর্য্যময় ভাবের মধ্যে পড়িয়াও, তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি কখনও বা যমুনা-তীরে, কখনও বা দুর্গপ্রাঙ্গণে, কখনও বা প্রতাপের চিত্রশালায় সযত্নে রক্ষিত চিত্রসমূহ দেখিয়া—কখনও বা পুস্তক-পাঠে সময় কাটাইতেন। প্রতাপ, অনেক সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহগণকে, রঞ্জনকে একটী কর্ম্ম করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা রঞ্জনের ভাগ্য-প্রতিকূলতার জন্য, কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এক দিন মধ্যাহ্নসময়ে, রঞ্জন প্রতাপের কক্ষমধ্যে বসিয়া আছেন, একখানি পুস্তক পাঠ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাহাতে মনঃসংযোগ হইতেছে না। রঞ্জন ধীরে ধীরে পুস্তক ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। একবার উন্মুক্ত বাতায়ন-পথ মধ্য-দিয়া আগরার বাহ্য-সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু

তাঁহার চিন্তা-পীড়িত-হৃদয়ে, সে বিরাট সৌন্দর্য্যও ভাল লাগিল না। তিনি সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রতাপের চিত্র-গৃহে উপস্থিত হইলেন।

চিত্র-শিল্পের যতদূর চরমোৎকর্ষ দেখান যাইতে পারে, প্রতাপের চিত্রগৃহে যেন তাহাদের সবগুলিরই একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। চিত্রগুলি, বহুবিধ বিচিত্র বর্ণ-রঞ্জিত ও কৃত্রিম হইলেও যেন অতি প্রকৃত বলিয়া উপলব্ধি হইতেছিল। এই জন্যই বোধ হয়, কবি ও চিত্রকরের মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় না। কবি, মধুর-শব্দ-ঝঙ্কারে যে চিত্র লোক-চক্ষে পরিস্ফুট করেন, চিত্রকর তাহার কলা-কৌশল-স্মৃত বিবিধ বর্ণসমষ্টির মধ্যদিয়া, তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তুলেন।

রঞ্জনলাল নিবিষ্টমনে চিত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্বেলিত হৃদয় কতকটা শান্ত হইল। চিত্রগৃহের চারিদিক বিচিত্র চিত্র ও দর্পণাদিতে পরিশোভিত। মধ্যস্থলে বিবিধ কারুকার্য্য খচিত উপবেশনের স্থান। দর্শক ক্লান্ত হইলে, এই আসনে উপবেশন করেন। রঞ্জনলাল যে কক্ষে ছিলেন, তাহার পার্শ্বেই একটী দ্বার। তৎপার্শ্বে আর একটী স্বল্প-পরিসর গৃহ। এইটীই প্রতাপের চিত্রশালা। এই গৃহে বসিয়াই প্রতাপ তাঁহার আলেখ্য চিত্র করিতেন। রঞ্জনলাল চিত্রপরিদর্শন কার্য্য শেষ করিয়া পাশের গৃহে গেলেন। বন্ধুর চিত্রকার্য্য দেখিবেন—এই তাঁহার মনে সাধ। কিন্তু গৃহ-মধ্যে প্রতাপ নাই, তাঁহার পরিবর্ত্তে অপর এক ব্যক্তি সেই কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট।

এই লোকটী রঞ্জনের নিকট পরিচিত নহে। প্রতাপের বাটীতে আসিয়া তাহার সহিত অনেকের আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। রঞ্জন দেখিলেন, লোকটী চুপ করিয়া একটী আসনের উপর বসিয়া আছে।

তাহার সম্মুখে অর্দ্ধ-চিত্রিত, অপরিস্ফুট বর্ণ-বিন্যস্ত এক বৃহৎ আলেখ্য। আশে পাশে কতকগুলি তুলিকা ও ফলিত রং পড়িয়া আছে। প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ উঠে নাই। যাহা উঠিয়াছে, তাহা হইতেই বোঝা যায়, সে চিত্র সেই আগন্তুকের প্রতিমূর্ত্তির অব্যক্ত ছায়া মাত্র।

রঞ্জনলাল, লোকটার অবস্থা দেখিয়া, বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সে ব্যক্তি অতি দরিদ্র। তাহার শরীর আদ্যোপান্ত ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রে আবৃত। দেখিলে বোধ হয়, যেন মূর্ত্তিমান দারিদ্র্য আসিয়া প্রতাপের চিত্রশালায় উপবিষ্ট রহিয়াছে।

আগন্তুকের আঙ্গরাখাটী সম্পূর্ণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও অতি মলিন। মাথায় একটী ধূলিক্লিষ্ট পাগড়ী আছে, তাহা আবার ততোধিক বিবর্ণ—যত রাজ্যের ময়লা তাহার মধ্যে। তাহার গলায় এক ছড়া তবলকীর মালা। পায়ের জুতা-জোড়াটী শত জায়গায় তালি দেওয়া। হাতে একটী ভিক্ষাপাত্র। রঞ্জনলাল বুঝিলেন, প্রতাপ এই ছিন্নকন্থা ভিক্ষুকেরই প্রতিকৃতি চিত্র করিতেছেন। প্রতাপ কি উন্মাদ!! এই হতভাগ্য ভিক্ষুকের চিত্র-কার্য্যে এত পরিশ্রম, বর্ণ ও তুলিকার অপব্যয় কেন?

রঞ্জন, প্রতাপকে এজন্য মনে মনে নিন্দা করিলেন। কিন্তু এই দরিদ্র আগন্তুকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন না। তাহার কাছে উপবিষ্ট হইয়া মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই! প্রতাপ কোথায়, বলিতে পার?"

সেই ভিক্ষুক যে রঞ্জনলালকে গৃহপ্রবেশের আরম্ভ হইতে আদ্যোপান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। রঞ্জনের প্রশ্ন শুনিয়া ভিক্ষুক ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"প্রতাপ কে?"

"কেন এই বাটীর অধিকারী—যিনি তোমার চিত্র আঁকিতেছেন।"

"প্রতাপ-ক্রতাপ জানি না—তবে যে মহানুভব ব্যক্তি, আজ আমায় দয়া করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছেন, হয় ত তিনিই বুঝি প্রতাপ ?"

"হাঁ—হাঁ তিনিই। তিনিই তোমার চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন। আচ্ছা! এই না তুমি বলিলে, সে তোমায় ডাকিয়া আনিয়াছে। এতলোক থাকিতে তোমায় ডাকিল কেন ? আর তোমার এই ছিন্ন-কন্থাবৃত প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াই বা তাহার কি লাভ ?"

ভিক্ষুক ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "মহাশয়! আমি অতি দুর্ভাগ্যবান্। আমার কথা শুনিলে, আপনি অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। নিশ্চয়ই বোধ হয়, আপনি তাঁহার কোন আত্মীয় হইবেন, সুতরাং তিনি আমায় কেন এখানে আনিয়াছেন, তাহা আপনাকে বলিতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

"বল ভাই বল! আমি তোমার দুঃখের কাহিনী শুনিব। আমিও তোমার ন্যায় একজন পথ-পরিত্যক্ত হতভাগ্য ভিক্ষুক!"

ভিক্ষুক বলিল—"মহাশয়! আমি এই আগরা-সহরের এক সম্ভ্রান্ত বণিক ছিলাম—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে এইরূপ পথের ভিখারি হইয়াছি। আমিও এক সময়ে প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করিতাম, কিন্তু এখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই। শত শত লোককে অন্ন দিতাম, এখন নিজে একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত। যে সকল লোক আগে আমায় দেখিলে, সাদরে সংবর্দ্ধনা করিত, এখন তাহারা—আমায় দেখিলে ঘৃণায় মুখ ফিরায়। ভিক্ষার জন্য তাহাদের দ্বারে গেলে, দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়। আজ চারি দিন আমি অনাহারী। পথে পথে বেড়াইতেছি, এক মুষ্টিও ভিক্ষা পাই নাই। কাল সমস্ত রাত্রিটা উন্মুক্ত রাজপথে, অনাহারে কাটাইয়াছি। ধনীর রাশীকৃত সুখাদ্য অন্ন, কুকুরের জঠর-

গত হইয়াছে—কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য আমি, যে ভিক্ষাদ্বারা তাহার একমুষ্টিও পাই নাই। নিজের জন্য ভাবি না, কিন্তু আমার ন্যায় হত-ভাগ্যকেও পরমেশ্বর স্ত্রী পুত্র দিয়াছেন। হায়! তাহাদের জন্যই আমার যত ভাবনা।"

"আজ মধ্যাহ্নে, এই বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহ-স্বামী দয়া করিয়া, আমায় হস্তেঙ্গিতে উপরে ডাকিলেন। আমায় দেখিয়া বলিলেন দেখ—"তোমাকে লইয়া আমার একটু কাজ আছে। তোমাকে এজন্য আমি প্রচুর পারিশ্রমিক দিব। আমার চিত্রশালায় সব চিত্রই আছে, কিন্তু অতি দীন ও মহা দরিদ্রের চিত্র নাই। আগরা সহরে, আমি এতদিন আছি, কিন্তু তোমার ন্যায় দারিদ্র্যের জীবন্তমূর্ত্তি আর কখনও দেখি নাই। আমি তোমার চিত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে, নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ পাইব এবং এজন্য তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব। মহাশয়! এই জন্যই আমাকে এখানে দেখিতে পাইতেছেন। ঐ দেখুন আমার চিত্র অঙ্কিত হইতেছে।"

রঞ্জনলাল, একবার সেই চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পুনরায় ভিক্ষুকের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ভাই! তবে তোমার এখনও কিছুই খাওয়া হয় নাই।"

"খাওয়া চুলোয় যাক্—জলস্পর্শও করি নাই।"

"তবে একটা কাজ কর। এখন ত চুপ করিয়া বসিয়া আছ, আর ও চিত্রও হইতেছে না। তুমি এই কয়টি পয়সা লও। এই বাড়ীর পার্শ্বে এক মিঠাইএর দোকান আছে, সেখান হইতে কিছু মিঠাই কিনিয়া খাও। আমি নিজে দরিদ্র। যাহা কিছু সঙ্গে ছিল সবই খরচ হইয়া গিয়াছে। নিজের হাতখরচের জন্য এই কয়টি পয়সা মাত্র ছিল। ভাই! এ দরিদ্রের দান অবহেলা করিও না। আমার দিব্য,

তুমি এই কয়েকটি পয়সা লইয়া কিছু মিঠাই খাইয়া আইস।” এই কথা বলিয়া রঞ্জনলাল কয়েকখণ্ড তাম্রমুদ্রা, সেই ভিক্ষুকের হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

রঞ্জনের এই অযাচিত করুণা ও হৃদয়ের অস্বাভাবিক উদারতা দেখিয়া, ভিক্ষুকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তাহার মুখমণ্ডলে কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকটিত হইল। সে পয়সাগুলি লইয়া বলিল—“মহাশয়! আমায় ত সবই দিলেন, কিন্তু আপনি কি করিবেন?”

“আমার জন্য ভাবিও না—আমার উপায় কি হইবে, উপরে ঐ বিধাতা তাহা ভাবিতেছেন।”

“আপনার দয়ার জন্য শত শত ধন্যবাদ। এই পয়সায় আপনি আমাকে মিষ্টান্ন খাইতে বলিতেছেন, কিন্তু ইহাতে আমাদের সপরিবারের একদিন আহার চলিবে।”

“আচ্ছা তবে পয়সাগুলি বাটী লইয়া যাইও। আমার ত আর কিছু নাই।” সহসা এই সময়ে রঞ্জনলালের দৃষ্টি তাঁহার অঙ্গুলির উপর নিপতিত হইল।

রঞ্জন প্রসন্নমুখে বলিল, “আমার আর কিছুই নাই, কিন্তু এখনও এই অঙ্গুরীয়কটি আছে। তুমি ইহা লও। ইহা বিক্রয় করিয়া যাহা হইবে, তাহাতেও তোমার কিছুদিন চলিতে পারে।

“না—ও অঙ্গুরীয়ক আমি লইব না। আমি শত জন্ম অনাহারে মরি, সেও ভাল। তবু এ ঘৃণিত কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না।”

“ভাই! তুমি বুঝিয়া দেখ। আমার সাদর উপহার প্রত্যাখান করিও না। এই অঙ্গুরীয়ক অঙ্গুলিতে থাকিলে, আমার কি বিশেষ উপকার হইবে? তদপেক্ষা যদি এটি তোমার কাজে লাগে, তাহা হইলে আমার যথেষ্ট সুখ হইবে। জানিও—দাতা, ইচ্ছা ও

ক্ষমতানুসারে দান করেন, গ্রহীতার মতামতের অপেক্ষা করেন না।”

ভিক্ষুক কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল,—“আমি যে একজন নামজাদা দরিদ্র, তাহা সকলেই জানে—এ অঙ্গুরীয় বিক্রয় করিতে গেলে, রত্নবণিক নিশ্চয়ই আমায় চোর বলিয়া কোতোয়ালিতে ধরাইয়া দিবে।”

“না—তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। উহার দাম তত বেশী নয় যে, কেহ তোমাকে সন্দেহ করিবে। যদি করে, তাহাকে আমার কাছে আনিও।”

“আচ্ছা মহাশয়! আপনি যদি ইহাতে সন্তুষ্ট হন—তাহাই হইবে।”

প্রতাপ তখনও সেই গৃহে প্রবেশ করেন নাই, তিনি অন্য গৃহে কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন। রঞ্জনলাল ব্যস্তভাবে ভিক্ষুককে বলিলেন—“তুমি একটু অপেক্ষা কর,আমি এখনি আসিতেছি”—এই কথা বলিয়া রঞ্জন সেই চিত্রশালা ত্যাগ করিলেন।

ইহার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে প্রতাপ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই ছিন্ন-কন্থাবৃত ভিক্ষুককে সসম্ভ্রমে কুর্ণীস করিয়া বলিলেন—“জাঁহাপনা! এ অধম আপনাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছে। চিত্রোপযোগী বর্ণের সামঞ্জস্য না হওয়াতে, এতটা বিলম্ব হইল। বান্দার এ গোস্তাখি মাপ করিবেন।”

“না—না প্রতাপ। তোমার কোন গোস্তাখি হয় নাই। স্থির হও। যা প্রশ্ন করি, তার উত্তর দাও। তোমার বাটীতে যে একটি যুবক আসিয়াছেন, তিনি তোমার কে?”

প্রশ্ন শুনিয়া, প্রতাপের মুখ শুষ্ক হইল। তিনি বিনীতভাবে

বলিলেন,—"ভারতেশ্বরের নিকট সে ব্যক্তি কি কোন অপরাধ করিয়াছে?"

"হাঁ—সে যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার কোন মার্জ্জনা নাই।"

এ কথায় প্রতাপের মুখ শুখাইয়া গেল। প্রতাপ কৃতাঞ্জলিপুটে নতজানু হইয়া, সহসা সেই ভিক্ষুকের পদতলে বসিয়া পড়িলেন। ভিক্ষুকবেশী ধীরে ধীরে প্রতাপকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "প্রতাপ! আমি জানিয়াছি, আগন্তুক তোমার বাল্য-বন্ধু। তুমিই সৌভাগ্যবান্। তা না হইলে, তোমার অদৃষ্টে এমন উদারপ্রাণ বন্ধু-লাভ ঘটিবে কেন? তোমার বন্ধুর হৃদয় অতি করুণা-পূর্ণ, অতি উদার, প্রচুর মহত্ত্ব-শোভিত। এই দেখ! তাহার নিদর্শন"। এই কথা বলিয়া তিনি অঙ্গুলী হইতে একটী অঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিয়া, প্রতাপকে দেখাইলেন।

প্রতাপ দেখিলেন, সে অঙ্গুরীয়ক—রঞ্জনলালের। রঞ্জনের অঙ্গুরীয়ক ইঁহার হাতে কিরূপে আসিল, ইহা তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। শুষ্কমুখে প্রতাপ বলিলেন—"জাঁহাপনা! এ বান্দা উপহাসের যোগ্য নহে। আপনিও এ বান্দার সহিত যে উপহাস করিতেছেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়। প্রকৃত কথা যে কি, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।"

সেই ভিক্ষুকবেশী,—রঞ্জনলালের সহিত, তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, কেন রঞ্জনলাল তাঁহাকে অঙ্গুরীয়ক দান করিয়াছেন, সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া বলিলেন। প্রতাপ সকল কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন ও তাঁহার বন্ধুর অপরাধের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিলেন।

এই ছদ্মবেশী ভিক্ষুক আর কেহই নহেন, স্বয়ং দিল্লীশ্বর আকবর

সাহ। কেন তিনি এই বেশে প্রতাপের গৃহে আসিয়াছিলেন, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

জগতে চিরদিনই করুণার জয়। আজও তাই হইল। দরিদ্র রঞ্জনলালের নিকট, অসীম ঐশ্বর্য্যশালী ভারত-সম্রাট্, পরাজিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভিক্ষুকবেশী সম্রাট্, প্রাসাদে চলিয়া গিয়াছেন। প্রতাপ একাকী বিষণ্ণমুখে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল, মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল। মানসিক উদ্বেগে, ললাটের শিরাগুলি স্ফীত হইয়াছিল, এক্ষণে যেন তাহাদের সমতা হইল। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"নির্ব্বোধ রঞ্জনলাল! করিয়াছ কি ভাই? সমগ্র হিন্দুস্থান যাঁহার পদতলে, গোলকুণ্ডার হীরকের খনি যাঁহার ঐশ্বর্য্যের শতাংশের একাংশ, যিনি সময়বিশেষে শত সহস্র, লক্ষাধিক স্বর্ণ ও রজতমুদ্রা এবং মণিমুক্তাদিতে তৌলিত হয়েন, তাঁহাকে তুমি সামান্য ভিক্ষুক ভাবিয়া, কয়েক খণ্ড তাম্রমুদ্রা দিয়াছ। ইহা অপেক্ষা তোমার বেশী প্রগল্‌ভতা আর কি হইতে পারে? যাঁহার কৃপা-কটাক্ষ পাইবার জন্য, হিন্দুস্থানের শতশত রাজন্যবর্গ, আগ্রহের সহিত আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে কি না সামান্য অঙ্গুরীয়ক দিয়া কৃপা দেখাইয়াছ?"

এই সময়ে রঞ্জনলাল একখানি মৃৎপাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া, প্রতাপকে সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই! সেই

দরিদ্র ভিক্ষুক কোথায় গেল ? সে অনাহারে তিন দিন কষ্ট পাইয়াছে বলিয়া, আমি তাহার জন্ত এই মিষ্টান্নগুলি আনিয়াছি।”

প্রতাপ বলিলেন—“রঞ্জন ! তুমি সর্ব্বনাশ করিয়াছ ভাই ! একটুও বুদ্ধি নাই তোমার !”

“কেন ভাই কি করিয়াছি ? এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি ? কই—না, কিছুই ত করি নাই, তবে খাবার কিনিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে। আমি বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, কাজেই একটু দেরী হইয়াছে। তোমার চাকরদের পাঠাইলে ত আরও দেরী হইত। যাক্ ও কথা, এখন সে ভিক্ষুক গেল কোথায় ?”

“রঞ্জন ! তুমি কি বাতুল ? তুঙ্গশৃঙ্গ হিমাচলকে তা না হইলে স্থাণুর বলিবে কেন ? যাঁহার ঐশ্বর্য্য অনন্ত, শত শত রাজন্যবর্গ যাঁর পদানত, হিন্দুস্থান যাঁর অসির ঝন্‌ঝনাতে শশব্যস্ত, তুমি সেই রাজার রাজা—সম্রাটের সম্রাট্‌কে, ভিক্ষুক বলিবে কেন ?”

রঞ্জন এ সব কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন—“ভাই ! কেন বৃথা রহস্য করিতেছ ? এখন রহস্তের সময় নয়। কোথায় সেই অনাহারী দরিদ্র ভিক্ষুক—বলিয়া দাও। আমি তাহাকে এইগুলি খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করি।”

প্রতাপ সহাস্যে বলিল—“সেই ভিক্ষুক এতক্ষণ যেখানে গিয়াছে, সেখানে প্রবেশ করিতে গেলে, হয় ত তোমার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইবে।”

রঞ্জনলাল, এ রহস্যময় কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কি যেন, কেমন হইয়া গেলেন। তখন প্রতাপ ধীরগম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন—“ভাই রঞ্জন ! আমি তোমার সহিত রহস্য করিতেছি না। যাহা প্রকৃত সত্য, তাহাই বলিতেছি। তুমি যাঁহাকে ভিক্ষুক বলিয়া

ভাবিতেছ, বাস্তবিক তিনি ভিক্ষুক নহেন। তিনি স্বয়ং ভিক্ষুকবেশী সম্রাট্ আক্‌বরসাহ!"

আক্‌বরসাহের নামোচ্চারিত হইবামাত্রই, রঞ্জনলাল যেন মন্ত্রৌষধি—রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্চল হইয়া পড়িলেন। উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় ও উত্তেজনাবশে তাঁহার প্রচুর স্বেদ নিঃসরণ হইতে লাগিল। মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল, খাদ্যপাত্র হস্তচ্যুত হইয়া হর্ম্ম্য-তলে পড়িল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার মনে এ সমস্ত ব্যাপার গভীর রহস্যময় বলিয়া বোধ হইল।

একবার রঞ্জন প্রতাপের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন প্রতাপও তাঁহার ন্যায় চিন্তামগ্ন ভাবে অবস্থিত। তবে কি প্রতাপ সত্য কথা বলিয়াছেন? রহস্য করেন নাই? কিন্তু কথা হইতেছে এই—আকবরসাহ এরূপ দরিদ্রের বেশে এখানে আসিবেন কেন?

প্রতাপ, রঞ্জনের মনের ভাব মুখে দেখিতে পাইলেন। বলিলেন—"ভাই! ভাবিতেছ, আকবর সাহ এখানে আসিবেন কেন? আসিবার কারণ আছে। তুমি বোধ হয় জান, আমি বাদসাহের প্রধান চিত্রকর। বাদসাহের জীবনের প্রত্যেক সুখ ও ঐশ্বর্য্যের সময় তাঁহাকে কিরূপ দেখায়, তাহার সমস্ত অবস্থাই আমি চিত্রিত করিয়াছি। ভিক্ষুকবেশে তাঁহাকে কিরূপ দেখায়, তাহার একটা স্মৃতি রাখিবার জন্য তাঁহার বড়ই সখ হইয়াছিল। তাই তিনি আজ আমার গৃহে দরিদ্রবেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন। কেবল আজ নয়। আজ তিন দিন এই ভাবেই চিত্র তোলাইতেছেন। এ আদর্শ ভিক্ষুকবেশ, আমিই তাঁহার জন্য সংগ্রহ করিয়াছি। তোমার সহিত তাঁহার যে সমস্ত কথা হইয়াছিল, সমস্তই তিনি আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। তোমাকে একখানি পত্র দিয়াছেন। এই লও—তোমার পত্র।"

রঞ্জনলাল পত্র পড়িবেন কি, এই সব অসম্ভব কথা শুনিয়া তাঁহার তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, মস্তক ঘুরিতেছিল। তিনি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, কি জাগ্রত অবস্থায় আছেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, রঞ্জনলাল বাদসাহের পত্র পাঠ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল,—

"মহানুভব বন্ধো!

আগামী কল্য রাত্রে, আপনার নবপরিচিত দরিদ্র ভিক্ষুক বন্ধুর কুটীরে পদার্পণ করিলে, বড়ই প্রীত হইব। নিমন্ত্রণ চিহ্নস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়ক গেলাম। ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য, আপনার বন্ধু প্রতাপ আপনাকে বলিয়া দিবেন।

"জালাল উদ্দিন মহম্মদ আকবর।"

এ কি প্রহেলিকা—না জাগ্রত স্বপ্ন? রঞ্জনলাল ভাবিতে লাগিলেন- "আগরার লোহিত-প্রস্তরময় প্রকাণ্ড দুর্গই, কি সেই ফকিরের কুটীর!!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দিন সবারই কাটে। রঞ্জনেরও কাটিল। সন্দেহে, বিস্ময়ে, আবেগে, উৎকণ্ঠায়, কৌতূহলে, রঞ্জনলাল—দিবাভাগ অতিবাহিত করিলেন। সন্ধ্যার পর প্রতাপ বলিলেন, "রঞ্জন! বাদসাহের সহিত সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করিবার এই উপযুক্ত সময়। আমি তোমাকে দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিতে আদিষ্ট হইয়াছি। দুর্গ দ্বারে, একজন তাতার-দেশীয় খোজা, তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে। এই অঙ্গুরীয়ক তাহাকে দেখাইলেই, সে তোমাকে বাদসাহের নিকট

লইয়া যাইবে। “বাদসাহের নিদর্শন এই লও”—বলিয়া আকবর সাহের নামাঙ্কিত এক বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় প্রতাপ তাঁহার বন্ধুর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই, প্রতাপের সহায়তায়, প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া, প্রতাপ ও রঞ্জন দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাদসাহের আদেশে, দুর্গদ্বারে এক তাতার-প্রহরী পূর্ব্ব হইতেই রঞ্জনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। দুইজন আগন্তুককে সহসা সম্মুখীন হইতে দেখিয়া সে রুক্ষস্বরে বলিল—“নিদর্শন কই? একজনের বেশী লোক প্রাসাদের মধ্যে লইয়া যাইবার ত আমার হুকুম নাই।”

প্রতাপ বলিলেন—“আমি যাইব না, ইনিই তোমার সঙ্গে যাইবেন।”

রঞ্জনলালকে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রতাপ নিজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি রঞ্জনকে দরবারোচিত আদবকায়দা সম্বন্ধে যথারীতি উপদেশ দিয়া সুচতুর করিয়া দিয়াছিলেন।

তাতারী বলিল—“আমার অনুসরণ করুন।” তাতারী এই বলিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইল। রঞ্জনলাল তাহার পশ্চাতে। রঞ্জনলাল, মর্ম্মর-দরওয়াজা দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কি ভয়ানক উচ্চতোরণ! উপরে চাহিতে গেলে, মাথা ঘুরিয়া যায়। তোরণের আপাদমস্তক, লোহিত প্রস্তরখণ্ডে গ্রথিত। তোরণদ্বারে ভীমকায় প্রহরীগণ উন্মুক্ত তরবারিহস্তে পাহারা দিতেছে। দরওয়াজার পর হইতে গন্তব্যপথ যেন ক্রমশঃ উচ্চ হইয়াছে। রঞ্জনলাল, তাতারীর সঙ্গে এই উচ্চপথ ধরিয়া কিয়দ্দূর অতিবাহিত করিয়া, আর এক মর্ম্মর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড তোরণের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেই গগনস্পর্শী প্রাসাদের অতুল সৌন্দর্য্য দেখিয়া, তিনি স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্‌। বহুজের

প্রবেশ-দ্বারে, আর একজন প্রহরী পুনরায় নিদর্শন দেখিতে চাহিল তাতারী অঙ্গুরীয়ক দেখাইলে, সে দ্বার ছাড়িয়া দিল।

রঞ্জন ভাবিলেন—"এ কি! কোথায় আসিলাম? এমন প্রকাণ্ড পুরী ত কোথাও দেখি নাই! শত শত খিলানে, সহস্র সহস্র স্তম্ভে যে এই প্রাসাদের অতুল সৌন্দর্য্য। চারিদিকে সুগন্ধভরা দীপাবলি জ্বলিতেছে। দালানের দুই পাশে—সমুন্নত খিলানের নিম্নে, নানাবিধ প্রস্তর-খচিত প্রতিমূর্ত্তি, ভাস্করের কারু-কার্য্যের জীবন্ত দৃষ্টান্তরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রঞ্জনের মুগ্ধ ভাব দেখিয়া, তাতারপ্রহরী বলিল— "এই মহলের নাম "যোধবাই-মহল"। বাদসাহের প্রধানা রাজ্ঞী যোধবাই, কুমার সেলিমের গর্ভধারিণী, এই প্রাসাদে বাস করেন। ইহা প্রাসাদের বহির্দ্দিক মাত্র।"

কিয়দ্দুর আসিয়া প্রহরী বলিল—"মহাশয়! একটু অপেক্ষা করুন।" রঞ্জনলাল স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন।

প্রহরী একখানি রেশমী রুমালে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আবদ্ধ করিল।

রঞ্জন, প্রাসাদের সৌন্দর্য্য দর্শনে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া, বড়ই সংক্ষুব্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কতক্ষণ এইরূপ ভাবে অন্ধের ন্যায় আমাকে যাইতে হইবে?"

তাতারপ্রহরী মৃদুহাস্যের সহিত উত্তর করিল—"বাদসাহের হুকুম। এ মহলে পুরুষের প্রবেশ একবারে নিষেধ। কেবল আপনাকে অন্তঃপুরে লইবার জন্য এই উপায়ে, মহলের এক বিশেষ অংশে লইয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে। এই মহল পার হইলেই; আবার আপনার চক্ষু খুলিয়া দিব।"

রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা ব্যতীত কি সেই দিকে যাইবার আর পথ নাই?"

"পথ থাকিবে না কেন—সহস্র। কিন্তু বাদসাহ সন্ধ্যার পর "দেওয়ানখাসে" অবস্থান করেন—তাই আপনাকে এই পথে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছি।"

রঞ্জনলাল বিনা বাক্যব্যয়ে মহল পার হইলেন। মহল পার হইয়াই, একটী প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। প্রহরী, সেইস্থানে তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিল।

রঞ্জনলাল দেখিলেন, সম্মুখেই এক অপূর্ব্ব শ্যামল-তৃণখচিত, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। বোধ হয়, তাহাতে দুই সহস্র লোকের সমাবেশ হইলেও স্থানের অকুলান হয় না। প্রাঙ্গণের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাবিতান। লতাবিতানে শত সহস্র সুগন্ধি কুসুমরাশি ফুটিয়া চারিদিক সৌরভা-কুলিত করিতেছে। মাঝে মাঝে মর্ম্মর প্রস্তরময় আসন—বিচিত্র রত্ন-বেদী। রত্নবেদীর আশে পাশে, ছায়াময় ফল-ফুল-পরিপূর্ণ বৃক্ষরাজি। তাহাদের শাখায়—শাখায়, পিঞ্জরাবদ্ধ শুক, শারী, হীরামন প্রভৃতি পক্ষিগণ, নিজ নিজ বুলি বলিতেছে। কোথাও বা কৃত্রিম পুষ্করিণীতে হংস, বক, সারস, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি জলবিহঙ্গগণ বিচরণ করিতেছে। কোথাও বা ময়ূরগণ শত শত চন্দ্রকখচিত সুচিত্রিত পক্ষরাজি প্রসারিত করিয়া কেকারবের সহিত নৃত্য করিতেছে।

ইহার মধ্যে একটি বৃক্ষের তলদেশ, সুন্দর মীনাখচিত শ্বেত-প্রস্তরে মণ্ডিত। তাহার উপর একখানি বিচিত্র আসন পাতা রহিয়াছে। আসনের উপর কতকগুলি পণ্যজাত, ঈষৎ মলিন ও ধূলিমিশ্রিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে একখানি রত্নখচিত শিবিকা, আর সেই শিবিকার পার্শ্বে একটি উন্নত মর্ম্মর-প্রস্তরময় স্থানের উপর বাদসাহের পুরাতন উষ্ণীষ্। সেই স্থানের চারিদিকে রৌপ্যপাত্রে সুগন্ধ দীপাবলি জ্বলিতেছে। বৃক্ষের আশেপাশে সুরভি কুসুম-মালার

বেষ্টিত হইয়া, সুগন্ধ মাখিয়া, অতুল সুষমা বিস্তার করিতেছে। চারিদিকেই তাতার-রমণীগণ, উন্মুক্ত অসি-হস্তে সেই স্থানে ভ্রমণ করিতেছিল।

রঞ্জনলাল সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে কি হইতেছে?"

তাতার-প্রহরী বলিল—"মহাশয়! এই বৃক্ষতলে 'খোসরোজের' দিন, আকবর-সাহের সহিত যোধপুর-রাজকুমারীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সে দিন রাজকুমারী যে শিবিকায় আসিয়াছিলেন, সেই শিবিকা ঐ রহিয়াছে। বৃক্ষতলে যে সমস্ত পণ্যজাত, বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ডের উপর সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে দেখিলেন, উহা সেই দিনেই বিক্রীত হইতে আসিয়াছিল। আর ঐ যে উষ্ণীস্ দেখিতেছেন, উহা বাদসাহের। ঐ উষ্ণীস্, আকবর-সাহ যোধপুর-রাজকুমারীর অলক্তক-রঞ্জিত চরণ-তলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।"

রঞ্জনলাল, এই সব দেখিতে দেখিতে, প্রাঙ্গণ পার হইলেন। খোসরোজের দিন এই প্রাঙ্গণে কতই না সমারোহ হয়! প্রাঙ্গণের পরই একটি ক্ষুদ্র ফটক দৃষ্ট হইল। প্রহরী রঞ্জনলালকে লইয়া সেই ফটকে প্রবেশ করিল।

ফটকের প্রথমটা বড় অন্ধকার। অন্ধকারে, রঞ্জনের দুই একবার পদস্খলন হওয়াতে, তাতার-প্রহরী তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিয়দ্দুর গিয়া, রঞ্জন এক গৃহমধ্যে আলোকছটা দেখিতে পাইলেন। এই স্থানে শাণিত বর্শাহস্তে বিশাল-দর্শন নপুংসকগণ, প্রহরীর কার্য্য করিতেছে।

প্রধান প্রহরী বাদসাহের নিদর্শন দেখিয়া, তাহার সঙ্গীদের চুপি চুপি কি বলিল,—রঞ্জন তাহা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু বুঝিলেন, তাঁহারই কথা হইতেছে। কথা শেষ হইবার পরই, একজন প্রহরী

আলখাল্লা হইতে একখানি রুমাল বাহির করিয়া তাঁহার চক্ষু বন্ধন করিল এবং একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া বলিল—"ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করুন। কোনপ্রকারে ভয় পাইবেন না—বা নড়িবেন না। ভয় পাইবেন বলিয়াই, আমি চক্ষু বাঁধিয়া দিয়াছি।"

রঞ্জন, তাহার অনুরোধক্রমে, সেই স্থানে বসিবামাত্রই আসনটি সহসা একটু নড়িয়া উঠিল, তৎপরে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। রঞ্জনলাল, ঘোর অন্ধকার মধ্যে একবার চক্ষুর বাঁধনটী শিথিল করিয়া দিয়া দেখিলেন, চারিদিকে সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকার!! আর তিনি সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছেন। উপরে অন্ধকার, নীচে অন্ধকার—চারিপার্শ্বে অন্ধকার। রঞ্জন ভাবিলেন, এই অন্ধকারের মধ্যেই আমার সমাধি হইবে না কি? ভয় পাইয়া তিনি পুনরায় চক্ষু আবৃত করিলেন।

কিয়দ্দূর এইভাবে উঠিয়া—উত্থান-গতি বন্ধ হইল। তীব্র আলোকচ্ছটা, রঞ্জনলালের আবদ্ধ-চক্ষুর মধ্য দিয়া চারিদিকে সঞ্চারিত হইল।

তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, একটি বিস্তীর্ণ মর্ম্মর-মণ্ডিত, আলোক-মালা-বিভূষিত কক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। কক্ষতল দুগ্ধ-ফেননিভ, মর্ম্মর দ্বারা সমাবৃত। স্তম্ভ, খিলান, ছাদ, সবই উজ্জ্বল মর্ম্মরময়। লক্ষ সহস্র আলোকজ্যোতিঃ পতিত হইয়া, কক্ষটি অতি মনোরম দেখাইতেছে। খিলান হইতে বড় বড় স্বর্ণমণ্ডিত দণ্ডে, অসংখ্য আলোক দীপ-রাজি, স্নিগ্ধভাবে চারিদিকে সুগন্ধ বিকীরণ করিয়া স্থিরভাবে জ্বলিতেছে। গৃহের আশে পাশে, দেয়ালের চারিদিকে, নানাবিধ সুন্দর আলেখ্য। উন্নত সুগোল অঙ্গুলির গাত্র, রত্নরাজিখচিত লোহিতবর্ণ

মখমল দ্বারা মণ্ডিত। ভিত্তিগাত্রে মিনার কাজ। চারিদিক কৃত্রিম লতাপাতা ও ফলপত্রাদি পরিশোভিত। বিচিত্র স্তম্ভশিরে নাগকেশর, গন্ধরাজ, গোলাপ, চম্পক, যুথী ও চন্দ্রমল্লিকার বিচিত্র মালা দুলিতেছে। হর্ম্ম্যতল, একখানি লোহিতবর্ণ বসোরাই গালিচায় মণ্ডিত। গৃহের চারিদিকে কলঙ্কশূন্য সুবৃহৎ মুকুররাজি। সেই সমস্ত মুকুরে, সেই আলোকরাজির অসংখ্য প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। এই বিচিত্র হর্ম্ম্যের চারিদিকে কৌচ, সোফা, দিবান প্রভৃতি সুখাসন ইতস্ততঃ বিন্যস্ত রহিয়াছে। আসনের পার্শ্বে, শ্বেত প্রস্তরময় ফুলদানিতে সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের তোড়া। ইহার মধ্যে এক বিশিষ্টস্থানে—দ্যুতিময় রাজ-সিংহাসন। তাহাতে কত শত মণি মুক্তি জ্বলিতেছে।

রঞ্জনলাল এই সমস্ত দেখিয়া, আত্মহারা হইলেন। তিনি আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! একবার করদ্বয় দ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দেখিলেন, বাস্তবিক তাঁহার নিদ্রার ঘোর নাই। তবে কি মস্তিষ্কেরই বিকৃতি ঘটিল? না তাও নয়, সন্ধ্যার পর যাহা ঘটিয়াছে, সবই ত মনে পড়িতেছে।

রঞ্জনলাল ধীরে ধীরে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, এক গালিচার উপর দাঁড়াইলেন। কক্ষ নির্জ্জন—কেহই সেখানে নাই। কেবল অসংখ্য দীপের আলো! মুকুরে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব ও মণিমুক্তার ঝলসিত অঙ্গজ্যোতিঃ ভিন্ন, সে গৃহে আর কিছুই নাই। তিনি সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইলেন। চারিদিকের উজ্জ্বল মুকুরে, তাঁহার প্রতিবিম্ব পড়িল। দেখিতে দেখিতে একা রঞ্জনলাল আটটি হইয়া পড়িয়াছেন। মনে ভাবিতেছেন, কি করি, এমন সময়ে মুকুরে আর একটি অভিমূর্ত্তির প্রতিচ্ছায়া পড়িল। কি সর্ব্বনাশ! এ মূর্ত্তি যে

তাঁহার পরিচিত। এই প্রতিবিম্ব দেখিয়া রঞ্জনলাল শিহরিয়া উঠিলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই মূর্ত্তি তাঁহার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, সেই মূর্ত্তি স্থিরভাবে তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। বলিল—"বন্ধু! তুমি আসিয়াছ দেখিয়া বড় সুখী হইয়াছি। বোধ হয় এখানে আসিবার সময় তোমার কোন কষ্ট হয় নাই। আর যদি কিছু হইয়া থাকে, তজ্জন্য কিছু মনে করিও না।"

রঞ্জনলাল ভাবিলেন, এ ত স্বপ্ন নয়! এ যে কঠোর সত্য—সত্য অপেক্ষাও পরিস্ফুট। দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এ মূর্ত্তি কার? এ যে সেই ভিক্ষুক-মূর্ত্তি!! প্রতাপের গৃহে, আলেখ্য-গাত্রে যে ভিক্ষুক চিত্রিত হইতেছিল—এ যে সেই ভিক্ষুক! ভিক্ষুক যে আর কেহই নহেন, স্বয়ং ভারতেশ্বর আকবর সাহ!

দর্পণে সেই ভিক্ষুক-মূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিয়া, রঞ্জন ভাবিতে-ছিলেন—ঐশ্বর্য্য যেন দারিদ্র্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রমোদ-কানন, যেন শ্মশানের ভাব ধরিয়াছে, প্রদীপ্ত তেজ যেন ধূমাচ্ছাদিত হইয়াছে—দীর্ঘকায় পর্ব্বত যেন তুষারের মলিন আচ্ছাদনে ভূষিত হইয়াছে, সুখ যেন দুঃখকে আলিঙ্গন করিয়াছে, প্রফুল্লতা যেন বিষাদকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

মূর্ত্তি আরও নিকটস্থ হইল। রঞ্জন আর থাকিতে পারিলেন না। নতজানু হইয়া, ঊর্দ্ধমুখে, যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন—"সাহান্ সা! অধমের সহিত এ বিড়ম্বনা কেন? তুচ্ছাদপি তুচ্ছের সহিত এ কঠোর রহস্য কেন? দরিদ্রকে বন্ধু সম্বোধন কেন? না বুঝিতে পারিয়া যে দোষ করিয়াছি, তাহা কি হিন্দুস্থানের গৌরবস্বরূপ আকবর সাহের নিকট উপেক্ষণীয় নহে?"

"কে বলিল—আমি আকবর সাহ? হাঁ, তবে আমি আকবর-

সাহকে চিনি বটে। তিনি আমার পরম বন্ধু ও আত্মীয়। এখানে তিনি এখন উপস্থিত নাই। একটু পরেই এই গৃহে আসিবেন। আইস ভাই! তুমি এই আসনে উপবেশন কর।"

আমার ভ্রম! আবার বিস্মৃতি! আবার নূতন প্রহেলিকা! রঞ্জনলাল মহা সন্দেহে পড়িলেন। ভাবিলেন, তবে কি ভিক্ষুক আকবর সাহ নহেন—প্রতাপ কি আমায় রহস্য করিয়াছে? রঞ্জন, নিস্তব্ধ ও নির্ব্বাক্ অবস্থায়, চিত্রপুত্তলীর ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন। ভিক্ষুক ধীরে ধীরে রঞ্জনের হস্ত ত্যাগ করিয়া, আবার সেই দর্পণরাশির মধ্য দিয়া অপসৃত হইল।

সেই বিশাল, সুসজ্জিত, শিল্পখচিত, মখমল-মণ্ডিত, হিরণ্ময়-দীপালোকিত কক্ষে দাঁড়াইয়া একমাত্র রঞ্জনলাল—আর তাঁহার পার্শ্বে বিরাট নিস্তব্ধতা!! সহসা আর এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া ধীরে ধীরে দাঁড়াইল। তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না।

এবার ছিন্নকন্থার স্থান, স্বর্ণ ও হীরক-খচিত-বাসে পরিভূষিত। শুভ্র মস্তকে দীপ্তিমান্ উষ্ণীষ, মলিন বস্ত্রাবৃত কটিদেশে মণিখচিত তরবারি, কর্ণে সুন্দর মুক্তাময় বীরবৌলি, মুখে তেজ, প্রতিভা, দীপ্তি, ঐশ্বর্য্য, একাধারে বিরাজমান।

এবার এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সম্মুখীন হইয়া, রঞ্জনলালের হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে এক আসনের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহাকে সেই আসনে উপবেশন করাইল। প্রীতিভরে তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল—"রঞ্জনলাল! আর আমি তোমাকে কুহেলিকাবৃত রাখিব না, আর তোমায় সন্দেহের কষ্ট দিব না। কিন্তু তোমায় আমার একটি অনুরোধ রাখিতে হইবে। আমি যাহা বলিব বা করিব, তাহা তোমাকে বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করিতে হইবে। তুমি অতি

দরিদ্র ভাবিয়া, যাহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলে, তাহাকে ধনী বলিয়া জানিতে পারিলেও, সেইরূপ আনুগত্য করিতে হইবে। আমার পরিচয় শুন,—আমার নামই জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবর। আমিই ভিক্ষুকবেশে চিত্রিত হইবার জন্য, চিত্রকর প্রতাপের গৃহে গিয়াছিলাম আর সেইখানেই তোমার অমূল্য বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি পাইয়াছি।”

“পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া, আমার ন্যায় অধমের প্রতি এই বিশাল হিন্দুস্থানের শাসনভার ন্যস্ত করিয়াছেন। আমি হিন্দুস্থানের প্রজার অধীশ্বর নহি—বস্তুতঃ তাহাদের দাস মাত্র। দোষের দণ্ড দেওয়া আমার যেমন কর্ত্তব্য কার্য্য, গুণের উপযুক্ত পুরস্কার দানও তদ্রূপ কর্ত্তব্য। রঞ্জনলাল! পরমেশ্বর তোমায় অনেক অসাধারণ গুণাবলী দ্বারা শোভিত করিয়াছেন। তোমাতে যাহা আছে, হয় ত আমাতে তাহা নাই। আমি তোমার গুণের পুরস্কার করিব।”

“যাও—পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে তোমার জন্য লোক অপেক্ষা করিতেছে—সেখানকার কর্ত্তব্য তাহারাই তোমাকে বলিয়া দিবে।”

রঞ্জন, মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাদসাহের আদেশ পালন করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে বহুমূল্য বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া আসিয়া, বাদসাহের পাদমূলে বসিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সম্রাট্ পুনরায় তাঁহাকে নিজের সম্মুখে হাত ধরিয়া বসাইলেন। বাদসাহ আবার বলিতে লাগিলেন—

“রঞ্জন! তোমার জীবনের সমস্ত ঘটনা, আমি প্রতাপের মুখে শুনিয়াছি। তোমার আগরায় আসিবার কারণও শুনিয়াছি। যাহাকে তুমি হৃদয় সমর্পণ করিয়াছ, যাহার জন্য তুমি এই বিশাল দুঃখ-সমুদ্রে ঝাঁপিয়াছ, যাহার জন্য তোমার মনের সুখ গিয়াছে, তাহাকে তোমার সহিত আমি অগ্রে মিলিত করিব। তিলোত্তমার সহিত

আমি তোমার বিবাহ দিব। শ্রেষ্ঠী ধনশ্রী, রাজদরবারের মুকীম! সে আমার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিবে না, বরঞ্চ সৌভাগ্য-বান্ জ্ঞান করিবে। আর একটি কথা, আগরায় তোমার বিবাহ হইবে। আমি স্বয়ং সেই বিবাহ-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিব ও তোমায় যথোপযুক্ত যৌতুক দিব। ইহাতে অস্বীকৃত হইলে, আমার মর্ম্মপীড়া হইবে। আমি আজ হইতে তোমাকে পঞ্চশতী মনসবদারের পদে নিযুক্ত করিলাম। রাজা টোডরমল্ল, কাল তোমার আবাস-স্থানে নিয়োগপত্র পাঠাইয়া দিবেন।"

কথা শেষ হইল। রঞ্জন নিস্তব্ধ ও নির্ব্বাক্—কিন্তু তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। তাঁহার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির প্রতি বাদসাহের এত অনুগ্রহ, এই ভাবিয়া তিনি দিল্লীশ্বরের উদারতায় অতীব বিস্মিত হইলেন।

বাদসাহ বলিলেন—"রঞ্জন! এই মণিময়হার আমি বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ তোমার গলদেশে অর্পণ করিলাম। ভরসা করি, এই সামান্য উপহার তুমি কখনও বিস্মৃত হইবে না"—এই কথা বলিয়া বাদসাহ স্বহস্তে একছড়া রত্নময় হার রঞ্জনের গলদেশে পরাইয়া দিলেন।

বাদসাহ আবার বলিলেন—"রঞ্জন! রাত্রি হইয়াছে, আজ এই পর্য্যন্ত। আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমার বিশ্রামের সময় উপস্থিত। অদ্য তোমার নিকট বিদায় লইতেছি। আমার ভৃত্যগণ এখনিই তোমাকে যথাস্থানে পৌঁছিয়া দিবে।"

রঞ্জনলালের চক্ষে, কৃতজ্ঞতার অশ্রু বহিতে-লাগিল। আকবরের অতুল্য উদারতা দেখিয়া, তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন। নত-জানু হইয়া বাদসাহের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিলেন। তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না।

বাদসাহ বলিলেন—"বন্ধো! তোমার এ দরিদ্রবন্ধু আলাল উদ্দিন, তোমার স্মৃতি-পথ হইতে, তোমার সুখদুঃখের মধ্যেও কখন যেন বহির্ভূত না হয়—এই তাহার শেষ অনুরোধ।" এই বলিয়া দিল্লীশ্বর কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

বাদসাহের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, সম্মুখের দালানে আসিবামাত্রই, দুইজন খোজা আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"জনাব! আমাদের সঙ্গে আসুন। আপনাকে বাহিরে রাখিয়া আসি।"

রঞ্জন, তাহাদের সহিত দুর্গের বাহিরে আসিলেন। বাহিরে তাঁহার জন্য একখানি সুসজ্জিত তাঞ্জাম অপেক্ষা করিতেছিল।

প্রধান খোজা সসম্ভ্রমে বলিল—"জনাবালি! বাদসাহের আদেশে এই তাঞ্জাম আপনার জন্য এস্থানে রক্ষিত।"

রঞ্জনলাল, সুখস্বপ্ন-ভরা চিত্তে এই সব অদ্ভুত ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে, সেই তাঞ্জামে চড়িয়া প্রতাপের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সময় বুঝিয়া প্রতাপকে সকল কথা বলিয়া, রঞ্জনলাল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বন্ধুর এই অভাবনীয় অদৃষ্ট পরিবর্ত্তনে, প্রতাপ অতিশয় সন্তোষলাভ করিলেন। রঞ্জনলাল "মন্সবদার" হইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার আনন্দরাশি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ন্যায়, তাঁহার হৃদয়-কন্দরকে উচ্ছ্বসিত করিল।

ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে, বাদসাহের চারিজন অশ্বারোহী প্রতাপের বাসায় আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে রঞ্জনলাল বলিয়া কোন ব্যক্তি আছেন কি না?" প্রতাপ ডাক শুনিয়া নীচে আসিলেন। প্রধান-প্রহরী রক্তবর্ণ বস্ত্রমণ্ডিত কতকগুলি কাগজ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। তিনি সেইগুলি লইয়া রঞ্জনের নিকট গেলেন। অশ্বারোহীরাও সেলাম জানাইয়া প্রস্থান করিল।

রক্তবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদনী খোলা হইল। তাহার ভিতর একখানি ফরমান ও অপরখানি আদেশপত্র। দুই খানিই আকবরের নামাঙ্কিত ও রাজা টোডরমল্লের সহি-সম্বলিত। তাহার মধ্য হইতে একখানি পত্র বাহির হইল, সেখানি এই—

১। সাহানশা, পরম গৌরবান্বিত হিন্দুস্থানের জ্বলন্ত সূর্য্যস্বরূপ, সম্রাট্ শাহ জালাল-উদ্দিন মহম্মদ আকবর সাহের আদেশক্রমে, আমি আপনাকে জানাইতেছি, অদ্য হইতে আপনি ভারত-সম্রাটের সরকারে পঞ্চম শ্রেণীর মন্সবদারের পদে নিযুক্ত হইলেন। বাদসাহ আপনার বাসের জন্য আগরার "সেলিমবাগ" নামক উদ্যানবাটী নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

২। এই পদের মর্য্যাদানুরূপ জায়গীর, আপনি স্বদেশেই হউক, বা অন্য কোন স্থানেই হউক, ইচ্ছা করিলেই পাইবেন। জায়গীরের বার্ষিক আয় দশ সহস্র মুদ্রা। আপনার মতামত জানাইলে, সরকার হইতে এক আমিন পাঠাইয়া জাইগীর নিশানদিহী করিয়া দেওয়া হইবে।

৩। সম্মানের চিহ্ন-স্বরূপ বাদসাহ আপনাকে একপ্রস্থ বহুমূল্য পোষাক, একখানি রত্নখচিত কাশগারি তরবারি ও আপনার ব্যবহারের জন্য একটি তাঞ্জাম—পাকী দিবেন। এই সমস্ত বস্তু আপনার বিবাহের পর, প্রকাশ্য দরবারে আপনি পাইবেন।

৪। জমাদারের মুকিম, এলাহাবাদ ছত্রপতি-নিবাসী ধনশ্রী শ্রেষ্ঠীর উপর

সরকার হইতে এক হাজির। পরওয়ানা গিয়াছে। সেই পরওয়ানানুসারে, ধনশ্রী দাস এই সপ্তাহের মধ্যেই আগরায় পৌঁছিবেন। তাহার পর, সেলিমবাগে আপনার বিবাহ উৎসব সম্পাদিত হইবে।

৫। আপনার বিবাহের দিন, সরকার হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু-আমীর ওমরাহ নিমন্ত্রিত হইবেন। অম্বররাজ মানসিংহ ও আমি উপস্থিত থাকিয়া উদ্বাহ-কার্য্য সম্পাদন করাইব এবং স্বয়ং বাদসাহ বরকর্ত্তার কার্য্য করিবেন।

৬। আপনাকে প্রকাশ্য দরবারে সনন্দ না দেওয়া পর্য্যন্ত, প্রতিদিন আপনার "আমখাসে" উপস্থিত হইবার আবশ্যকতা নাই।

(সহী)—শ্রীতোডরমল্ল।

(দেওয়ান-উল্-মুলুক।)

পত্রপাঠ শেষ হইলে প্রতাপ রঞ্জনের গলা জড়াইয়া বলিলেন—"ভাই! সার্থক তুমি, ধন্য তোমার হৃদয়ের উদারতা। হৃদয়ের মহত্বের পুরস্কার তুমিই লাভ করিলে।"

সেই রাত্রি দুই বন্ধুতে বড়ই মনের সুখে কাটাইলেন। রঞ্জনলাল—পথের ভিখারী রঞ্জনলাল, ভবিষ্যৎ সুখাশায় উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে তিলোত্তমাকে স্বপ্নে দেখিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—o—
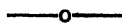
বাদসাহের পরওয়ানা পাইবামাত্রই, ধনশ্রী শেঠী কন্যা তিলোত্তমাকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তিলোত্তমা আগরায় আসিয়াছে শুনিয়া, রঞ্জনের হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণোচ্ছাস বহিল। সে দিনও রাত্রে তাঁহার নিদ্রা হইল না। শেষ-রাত্রে সুষুপ্তি। তাহাও সুখস্বপ্নময়।

বাদসাহের আদেশক্রমে, বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল। ধনশ্রী, বাদসাহের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া, প্রতাপের বাটীতে রঞ্জনের সহিত দেখা করিলেন।

ধনশ্রীর মুখে আর আনন্দ ধরে না। তিনি রঞ্জনের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"বৎস! আমি তোমার প্রতি অতিশয় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। তুমি এরূপ ভাবিও না যে, তোমার ঐশ্বর্য্য হইয়াছে বলিয়া,, আমি স্তোক-বাক্যে তোমার চিত্ততুষ্টি করিতে আসিয়াছি। তোমার চলিয়া আসার পর, আমার তিলোত্তমার দশা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। আমি যে আমার প্রাণসমা কন্যাকে ফিরিয়া পাইব, এমত আশা ছিল না। বাদসাহ না বলিলেও, আমি তোমার সহিত কন্যার বিবাহ দিতাম। আমি তোমার জন্য নানাস্থানে সন্ধান করিয়া শেষ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তোমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছি—বোধ হয়, তুমি আমার এই কঠোর ব্যবহারজন্য কোনরূপ কষ্ট হও নাই।"

রঞ্জনলাল ধনশ্রীকে আর বলিতে দিলেন না। তাঁহার পদধারণ করিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

*   *   *   *

বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে—সেলিমবাগে তাহার আয়োজন চলিয়াছে।

আবার সুখের দিন আসিল। মিলনের শুভ-মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল, রঞ্জনলাল শুভলগ্নে, শুভমুহূর্ত্তে তিলোত্তমার সহিত মিলিত হইলেন।

সে মিলনের আনন্দ, কেবল যে নব-পরিণীত দম্পতীই উপভোগ করিলেন, এমন নহে। স্বয়ং বাদসাহ, সেই বিবাহে উপস্থিত হইয়া আনন্দে মাতিলেন এবং যৌতুক স্বরূপ বরকন্যাকে নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিলেন।

বিবাহের উৎসব শেষ হইলে, রঞ্জনলাল প্রকাশ্য দরবারে "মনসবদারের" পদে অভিষিক্ত হইলেন। বাদসাহের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া নবমিলিত দম্পতী দিল্লীশ্বরের প্রতি সম্মান দেখাইলেন, পরে তাঁহার অনুমতি লইয়া ধনশ্রী কয়েক দিনের জন্য রঞ্জন ও তিলোত্তমার সহিত, আলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে। চন্দ্রের জ্যোতিঃ যমুনাবক্ষস্থ তরঙ্গরাজিতে পড়িয়া যেন চূর্ণ অয়স্কান্ত মণির ন্যায় দীপ্যমান হইয়াছে। প্রস্তরময় সোপান-রাজি, বালুকাময় নদী-সৈকত, জ্যোৎস্নায় হাসিতেছে। মাঝে মাঝে এক একটী পাপিয়া দিবাভ্রমে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—এমন সময়ে দুই জন সেই যমুনা-তীরস্থ উদ্যানবাটিকার মধ্যবর্ত্তী এক মর্ম্মরাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের মুখে চন্দ্রের আলোক পড়িয়াছে।

একজন অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"রঞ্জন! সেই এক

দিন, আর এই এক দিন। সেই দিন বিরহের, আর আজ মিলনের। সে দিন বিদায়ের—আজ আলিঙ্গনের। এই খানেই না আমরা সেই দিন দাঁড়াইয়াছিলাম? এই খানেই না তুমি নিষ্ঠুরের ন্যায় আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে?"

"আবার তিলোত্তমে! আবার সেই কথা! ছি! তুমি বড় নিষ্ঠুর!" এই কথা বলিয়া রঞ্জনলাল, আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে আবেগ-ভরে, প্রেমময়ী তিলোত্তমাকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই আবেগময় চুম্বন, বিমল জ্যোৎস্নাতলে উদ্ভূত হইয়া তিলোত্তমার কুসুম-কোমল আরক্তিম গণ্ডদেশে লয়প্রাপ্ত হইল।

রুধিরোৎসব।

রুধিরোৎসব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের, সুখময় বসন্তকালে, বাঙ্গালার জমিদারের মধ্যে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সুলতান সাহ সুজা, সম্রাট্ সাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র, তখন বাঙ্গালার নবনিযুক্ত সম্রাট্ ও রাজ-প্রতিনিধি। সাহ সুজা সম্রাটের পুত্র, সম্রাটের প্রতিনিধি, এবং সমগ্র বঙ্গবিহার উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা।

সম্রাট্ সাহজাহানের প্রিয়পুত্র সুলতান সুজাকে, তাঁহার পার্শ্বচরেরা বুঝাইলেন—"বাদসাহের পুত্র তিনি, বাঙ্গালা বিহারের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা তিনি। তবে—তিনি মোগল-সম্রাট্গণের প্রবর্ত্তিত সাধের "খোস্‌রোজ্" উৎসবানুষ্ঠান না করিবেন কেন? বাঙ্গালার এক মাসের রাজস্ব ব্যয় করিলেই, এই মহোৎসব অনুষ্ঠানে কোন অসুবিধাই হইবে না।

"খোসরোজ-নওরোজ" দিল্লীর সম্রাট্গণের ঐশ্বর্য্যময় আনন্দোৎসব। আগরা ও দিল্লীর খোসরোজ ও নওরোজ উৎসবে, আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাহজাহান প্রভৃতি বাদসাহগণ যে ভাবে সমারোহ করিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের কোন স্থানের বাদসাহই করিতে পারেন নাই।

উক্ত শুভদিবসদ্বয়ে, বাদসাহগণ, স্বর্ণ, মণিমুক্তা রজতাদির দ্বারা তৌলিত হইতেন। এই সকল বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার, হিন্দু-মুসলমান

পণ্ডিতগণের মধ্যে সমানভাবে বিতরিত হইত। অসংখ্য ভিখারী সরকার হইতে ভিক্ষাস্বরূপ প্রচুর অর্থলাভ করিত। সমগ্র আগরা দিল্লী, আলোকমালায় ও ধ্বজপতাকাদিতে পরিশোভিত হইত। সে উৎসবময় ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা-শক্তি আমাদের নাই।

প্রিয় অমাত্য ও সুহৃদ্‌গণের মন্ত্রণা-পরিচালিত হইয়া, বাঙ্গালার মালেক সাহজাদা সাহ সুজা, মুলুক্‌-উল্‌মুলুক্‌, বঙ্গীয় জমিদার ও প্রধান-গণের উপর এক সরকারী রোবকারী জারি করিলেন।

এই রোবকারী পাইবামাত্রই—বঙ্গব্যাপী একটা মহান্দোলন উপস্থিত হইল। বঙ্গীয়-জমিদারগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, সুজার "রোবকারী" বা আদেশপত্র এই—

প্রথম—"সুবা বাঙ্গালার প্রধান প্রধান জমিদার ও সামন্তবর্গের প্রতি মহাপ্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বরের ও ভারতের একমাত্র গৌরবান্বিত সম্রাট্ সাহজাহানের মহিমান্বিত পুত্র, সুলতান সাহ মহম্মদ সুজার এই আদেশ, যে—সম্প্রতি বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়া দুনিয়ার বাদসা তাঁহাকে বঙ্গদেশের একচ্ছত্র অধীশ্বর করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার মনের বাসনা এই, তিনি দেশের সমস্ত প্রধান।প্রধান জমীদার-বর্গের ও সামন্তগণের সহিত সদ্ভাব-বর্দ্ধন ও আত্মীয়তা-স্থাপন করেন। এই উদ্দেশ্যে, তিনি পরোয়ানা জারি করিতেছেন, যে উক্ত জমীদার ও সামন্তবর্গ, আগামী চৈত্রমাসের পূর্ণিমার দিনে—রাজমহলে তাঁহার বিস্তৃত দুর্গমধ্যে দিল্লীর সম্রাটের প্রথানুমোদিত যে "খোস্‌রোজ" মহোৎসব হইবে, তাহাতে তাঁহাদের স্ব স্ব কন্যা, ভগ্নী, পত্নী ও আত্মীয়াগণকে পাঠাইয়া দিবেন।

দ্বিতীয়—"দিল্লীতে বা আগরাতে তাঁহার গৌরবান্বিত প্রপিতামহ, পিতামহ ও পিতা যেভাবে যে প্রকারে এবং যে উদ্দেশ্যে এই প্রকার "খোস্‌রোজ" মহোৎসব করিয়া আসিতেছেন—রাজমহলে তাহাই অনুষ্ঠিত হইবে। যে সকল জমীদার ও সামন্তবর্গ সম্রাট্‌পুত্রের সহিত সদ্ভাব রাখিতে বা দিল্লীশ্বরের প্রতি সম্মান দেখাইতে [illegible]ক, তাঁহারা উক্ত দিবসে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে রাজমহল-দুর্গে স্ব স্ব পরিবারভুক্ত সুন্দরী মহিলা-দিগকে প্রেরণ করিবেন। অন্যথাচরণে, তাঁহাদিগকে সরকারের চিরপ্রচলিত গৌরবান্বিত

প্রথার অবমাননাকারী বলিয়া গণ্য করা যাইবে। জমিদারবর্গ, উৎসবের পরদিন, খোস্‌রোজের দরবারে উপস্থিত থাকিয়া রাজপ্রসাদ লাভ করিবেন।

তৃতীয়—সর্ব্বশেষে এই লিখিত থাকে, যে প্রকার উৎসবে পরাক্রমশালী রাজপুত রাজন্যবর্গ ও সামন্তগণ স্ব স্ব দুহিতা, পুত্রবধূ ও পত্নীদিগকে বাদসাহের রঙ্গমহালে প্রেরণ করিতে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন, বাঙ্গালার সামন্তরাজ ও জমিদারদের প্রতি সাহসুজা সেই সম্মান প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বিশেষরূপে গৌরবান্বিত করিতে চাহেন।

সরকারী পরোয়ানা এইরূপ,—কিন্তু বাঙ্গালার জমিদার ও সামন্ত-বর্গের মধ্যে অনেকেরই এইভাবে গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছা ছিল না। রাজপুত রাজা ও সামন্তগণের তুলনায়, তাঁহারা রাজ-দরবারের নিকট অনেকটা হীনভাবে সমাদৃত হইতেন। তাঁহাদের মনের ইচ্ছা—তাঁহারা যেমন নগণ্য হইয়া পড়িয়া আছেন, সেইরূপই থাকিবেন। উক্তরূপ উচ্চ সম্মানে তাঁহাদের কোন স্পৃহা নাই। তাঁহাদের প্রধান ভয়, পাছে—সম্রাট্‌পুত্রের সহিত আত্মীয়তাফলে, তাঁহাদের রাজপুতের দশা ঘটে। অম্বর, যোধপুর প্রভৃতি রাজপুত-রাজগণ যে ভাবে মোগল-বাদসাহের সহিত বৈবাহিক-ব্যাপারে আত্মীয়তা ও সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন—তাহা করিতে তাঁহারা আদৌ ইচ্ছুক নহেন।

সুজার বিলাসব্যসনমগ্ন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির কথাটা, তখন দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। দিবারাত্র, সুরূপা তন্বঙ্গী কামিনীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া, বিলাস-সুখেই তাঁহার দিন কাটিয়া যায়। তাঁহার অতি বিশ্বস্ত ও প্রিয় সহচর রৌশন খাঁ, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। এই রৌশন খাঁ অতি ভয়ানক লোক। সে দিন দিন সুজার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া তাঁহার বিলাসিতার ও স্বেচ্ছাচারিতার পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। এই সব উপায়ে যুবরাজকে বাধ্য এবং ব্যস্ত রাখিতে পারিলেই তাহার লাভ। সম্রাট্‌পুত্র সাহ-সুজা, মোগলের

যত্ন পরিচর্য্যা ও একান্ত আত্মসমর্পণে বিমুগ্ধচিত্ত। রৌশন খাঁ না হইলে, তাঁহার একদণ্ড চলে না।

বিলাস-বিভ্রম, মদিরাময় বিলোল রমণীকটাক্ষ—স্বর্ণপাত্র-পরিপূর্ণ সুগন্ধিত সেরাজী, আর কলকণ্ঠী কামিনীর অমিয়-মাখা সঙ্গীত-কাকলী—সুজার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত করিয়াছে। বিশেষতঃ রৌশন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে—রাজপুতনা, ইরাণ, পারস্য, কাশ্মীর প্রদেশের রমণীবৃন্দের অপেক্ষা, বঙ্গান্তঃপুরে অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী রমণীগণ বিরাজ করিতেছেন। ইহাতেই সুজার রূপ সম্ভোগ-আকাঙ্ক্ষা বিশেষরূপে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রায় সাতমাস হইল, তিনি বঙ্গদেশে আসিয়াছেন—ইহার মধ্যে বাঙ্গালার কয়েকটি আশ্রয়হীনা সুন্দরী, রৌশনের চেষ্টায়—আর রূপেয়ার প্রলোভনে, তাঁহার অন্তঃপুরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি যখন ঢাকায় ছিলেন, তখন রৌশনের পরামর্শে, রঘুদেব ঘোষাল নামক এক ব্রাহ্মণের, পরমা সুন্দরী কন্যাকে বেগম করিবেন বলিয়া, হস্তগত করিয়াছিলেন। রঘুদেবের কন্যা অতীব সুন্দরী। দশের মধ্যে সেরূপ একটা মেলে কি না সন্দেহ! এখন যুবরাজ সাহ সুজা, এই রঘুদেবের কন্যার রূপে উন্মত্ত হইয়া দিবারাত্র তাহার কাছে পড়িয়া থাকেন।

রৌশন ভাবিল—"এইবার ত বেশ উপযুক্ত অবসর। যুবরাজ বঙ্গীয় সুন্দরীর সৌন্দর্য্যরসাস্বাদে উন্মত্ত। কিছুদিন এই সব ব্যাপারে সুবাদারকে ব্যাপৃত রাখিতে পারিলে, আমারই যথেষ্ট লাভ। লুটের পথ ত খোলাই আছে—তাহা ছাড়া প্রকারান্তরে আমিই বাঙ্গালার হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া পড়িব।" এ সুখ, এ ঐশ্বর্য্য, এ প্রলোভন কে কোথায় সহজে ছাড়িতে পারে?

এত ভাবিয়াই, রৌশন সুজাকে নানা উপায়ে প্রলোভিত করিয়া, "খোস্‌রোজ" অনুষ্ঠানের পরামর্শ দিয়াছিল। সুজাকে উৎসন্নের পথে লইয়া যাইবার ইহাপেক্ষা আর সহজ উপায় কিছুই নাই। কাজেই যোগাড়যন্ত্র করিয়া, বাদশাহ-পুত্রকে কুমন্ত্রণা দিয়া সে পূর্ব্বোল্লিখিত পরোয়ানা জারি করিয়াছিল।

রৌশন এই সমস্ত ঘৃণিত কার্য্যে লিপ্ত থাকিত বলিয়া, সুজার দরবারে যে সমস্ত বঙ্গীয়-জমিদার, রাজকার্য্য উপলক্ষে উপস্থিত হইতেন—তাঁহারা সাধ্যমত রৌশনের সম্পর্ক ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেন। রৌশনও তাহাদের এইরূপ ব্যবহার হইতে বুঝিল, এই সব জমীদার তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করে। বাঙ্গালার এই উদ্ধত-প্রকৃতি জমিদারগণকে কাজেই সে বহুদিন হইতে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ে সে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইল।

বাঙ্গালার জমিদারদের নিকট যখন এ পরোয়ানা পৌঁছিল, তখন তাঁহারা সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বাদসাহের পুত্র ভবিষ্যতে বাদসাও হইতে পারেন। তাঁহার রোবকারীর আদেশ লঙ্ঘন করায়, অনেক বিপদ ঘটিতে পারে। কিন্তু সে সব ত পরের কথা।

সাহসুজা—এখন বঙ্গের একচ্ছত্রা রাজ্যেশ্বর। তাঁহার এ হুকুম অমান্য করিলে ভীষণ অনর্থ উপস্থিত হইবে। অথচ মোগলের অন্তঃপুরে কুলকন্যা প্রেরণ, অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। আর যদি পাঠানই হয়, তাহা হইলে তাহার যে কি ভীষণ পরিণাম হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, কলুষিত-চরিত্র, সুরাপায়ী, যথেচ্ছাচারী সাহ-সুজার অন্তঃপুরে—প্রাণসম দুহিতা, প্রেমময়ী ভার্য্যা, স্নেহময়ী ভগিনী তাঁহারা কোন্ সাহসে পাঠাইবেন?

কাজেই সুজার পরওয়ানা পৌঁছিবামাত্রই, বঙ্গের সামন্ত ও জমিদারদের মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেরই মুখে একই কথা। "উপায় কি? কি করা উচিত? কিরূপে মান সম্ভ্রম ও জাতিরক্ষা হইবে?" সকলেরই মুখে "উপায় কি! উপায় কি!" কিন্তু উপায় যে কি, তাহা বহু মন্ত্রণায় কেহই স্থির করিতে পারিলেন না।

পরিশেষে বীরভূমির প্রবীণ জমিদার কিরণচন্দ্র রায়, সমস্ত প্রধান প্রধান জমিদারবর্গকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আসুন, আমরা সকলে ঢাকায় সমবেত হইয়া, এ বিষয়ের একটা উপায় নির্দ্ধারণ করি।"

সকলে সেই প্রস্তাবে একমত হইয়া, নির্দ্ধারিত দিনে গোপনভাবে এ সম্বন্ধে শেষ প্রতিকার-চিন্তার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

রায়রায়াঁ যুগলকিশোর, সুজার দরবারের প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারী। তাঁহার দুহিতাও পরম রূপবতী। এ ব্যাপারে তাঁহার ভাগ্যও অন্যান্য জমীদারদিগের সহিত সমসূত্রে আবদ্ধ। বিশেষতঃ তাঁহার উপর সুজার প্রিয়সহচর রৌশন আলি, ঘোর অসন্তুষ্ট। কেবল তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভার বলে, রৌশন এপর্য্যন্ত কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। নচেৎ এতদিনে হয় ত তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারের অন্ধতমসাবৃত কক্ষ আশ্রয় করিতে হইত!

বীরভূমের জমীদার, কিরণরায়, যুগলকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—"ভাই! তুমিও পরওয়ানা পাইয়াছ। আমাদের যদিও বা কোনরূপে পরিত্রাণের পথ থাকে, তোমার তাও নাই। তুমি সাহজাদার অধীনস্থ কর্ম্মচারী—তোমার উপর যুবরাজের জবরদস্তি বড়ই বেশী হইবে। বিশেষতঃ রৌশন আলি তোমার ঘোর শত্রু। কিন্তু তুমিই আমাদের মধ্যে সুবুদ্ধিমান, রাজদরবারের প্রকৃত

অবস্থাভিজ্ঞ এবং সৎপরামর্শ দানে উপযুক্ত। কি করিলে মান বাঁচে, জাতি বাঁচে, সম্ভ্রম বাঁচে—তাহার উপায় বলিয়া দাও।”

যুগলকিশোরও সম্ভাবিত বিপদ-চিন্তায় বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন,—পর দিন রাত্রে তাঁহার নিভৃতকক্ষে, এপ্রদেশের বাঙ্গালার অন্যান্য জমীদারদিগকে আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়া গুপ্তদরবারে ইহার একটা উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠক! এই উদ্বিগ্নচিত্ত জমীদারবর্গকে ত্যাগ করিয়া, আমাদের সঙ্গে সুজার রাজধানী রাজমহলে একবার চলুন। সুজার রঙ্গমহলে কি ঘটনা হইতেছে, একবার দেখিয়া আসি।

একটী মালিকা-সুবাসিত, গন্ধদীপোজ্জ্বলিত, সুসজ্জিত বিচিত্রকক্ষে সম্রাট্-পুত্র সাহসুজা, অলোকসামান্যা সুন্দরীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কেহ বা কজ্জল-রেখাঙ্কিত বিলোলকটাক্ষে হাবভাব দেখাইয়া, সুজার হস্তে তুষারশীতল সুগন্ধি সিরাজি-পাত্র তুলিয়া দিতেছে—আর সেই পানপাত্র মুহূর্ত্তে নিঃশেষিত হইয়া পুনরায় তাহার করতলগত হইতেছে। কোন সুন্দরী বা মাঝে মাঝে কোকিল-কণ্ঠে, এক একটী গীতের একটী মাত্র চরণ ঝঙ্কার দিতেছেন। তাহাতে সেই কক্ষের চারিদিকে মধুর সুরতরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে।

কেহ বা সুগ্রথিত পুষ্পমাল্য লইয়া বাদশাহ-পুত্রের গলদেশে দোলাইয়া, তাঁহার কামকমনীয় সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া, তোষা-

মোদে মন ভুলাইতেছেন! কেহ বা সুজার আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অধরোষ্ঠ-চুম্বিত পাত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট সিরাজী পান করিয়া, আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিতেছেন। কেহ বা কোমল বাহুলতা দ্বারা, বঙ্গেশ্বরকে বেষ্টন করিয়া অলসভাবে তাঁহার অঙ্কোপরি ঢলিয়া পড়িয়াছেন।

সকলেই আমোদে উন্মত্ত। সকলেরই প্রাণ, মৃদু-মলয়-প্রতিহত বাসন্তী-ব্রততীর ন্যায়, আনন্দহিল্লোলে ধীরে দোলায়িত। সকলেরই হৃদয়ে সুখ-প্রস্রবণের পূর্ণোচ্ছ্বাস বহিতেছে।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের হাটে—একটীমাত্র সুন্দরী, নীরবভাবে সেই কক্ষের সুদূরপ্রান্তে সুজার দৃষ্টির বাহিরে বাহিরে থাকিয়া, কুপিত বাঘিনীর ন্যায়, তাঁহার প্রতি রোষপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে। সবাই নিজের আনন্দে উন্মত্ত, সুখে আত্মহারা—কাজেই অনেকে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই।

এই একান্তোপবিষ্ট রমণীর মুখে ক্রোধ ও জিঘাংসার ছায়া পরিস্ফুট। কিন্তু তাহা অনেক কষ্টে অসামান্য কৌশলে প্রশমিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার প্রাণে কি যেন একটা বিজাতীয় যাতনা। তাহার মনে কি যেন একটা সুগভীর উদ্দেশ্য জাগিতেছিল—তাই সে সেই সু-রঞ্জিত সুচিত্রিত, সুবাসিত ও দীপোজ্জ্বলিত কক্ষের, কোলাহলময় সুন্দরী-সমাজের সীমার বাহিরে বসিয়া, কোন কিছু মৎলব আঁটিতেছিল।

যে সুন্দরীরা সাহজাদার চারিধার ঘিরিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দিল্লী আগরা হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কাশ্মিরী, ইরাণী ও তুর্কী-রমণীর ভাগই অধিক। ইঁহাদের অধিকাংশই মুসলমানী।

এক সৌন্দর্য্যশালিনী, ক্ষুদ্রকায়া, তাতারদেশীয়া যুবতী, বঙ্গেশ্বরের

ক্রোড়প্রান্তে উপবিষ্টা ছিল। যেন সেই সৌন্দর্য্যের হাটে, সে একাই সাহজাদার প্রাণঢালা আদর উপভোগ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছিল। তারকামণ্ডলবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায়, তাহার রূপপ্রভা যেন—অতি সমুজ্জল।

আমোদ-আহ্লাদের প্রথম আন্দোলনটা কাটিয়া গেলে, সে, কৌতূহলপূর্ণ-স্বরে বলিল—"জাঁহাপনা! আমরা সকলে আছি, কিন্তু সেই বাঙ্গালী-রমণী, আপনার আদরের আদরিণী, রোশন কোথায়? তাহাকে আপনি অত ভালবাসেন—কিন্তু সে তাহার তিলমাত্র প্রতিদান করিতে পারে না, বরঞ্চ প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। আর আমরা এত করিয়াও আপনার একবিন্দু অনুগ্রহ পাই না। সবই আমাদের অদৃষ্ট!"

এই কথা শেষ না হইতে হইতেই, পূর্ব্বকথিত রমণী নিজ স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, সসম্ভ্রমে সম্রাট্‌পুত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একটী ছোট খাট কুর্ণীশ করিয়া সহাস্যমুখে বলিল—"জাঁহাপনা! দয়া করিয়া এ বাঁদীকে চরণে আশ্রয় দিয়াছেন। সাধ্য কি আমার—যে আপনার অত করুণার প্রতিদান করি। আপনি এখন ইহাদের সহিত আনন্দে উন্মত্ত। পাছে আপনার আমোদে কোন বিঘ্ন হয়, সেই জন্যই আমি একটু দূরে বসিয়াছিলাম। মনে জানি—এ হতভাগিনী রোশনকে ফুরসুতমত তলব হইবে।"

যে ক্ষীণাঙ্গী তাতার-যুবতী যুবরাজের নিকট রোশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছিল, সহসা তাহাকে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া সে যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া সরিয়া বসিল।

সুজা বলিলেন—"পিয়ারে রোশন মেরা! ওখানে দাঁড়াইয়ে রহিলে কেন? আইস এখানে—আমার কাছে উপবেশন কর।"

তখন রৌশেনের সুন্দর মুখ হইতে মন্ত্রবলে যেন বিষাদকালিমা চলিয়া গেল। ফুল্ল রক্ত-রাগরঞ্জিত সরস ওষ্ঠাধরে হাসির রাশি লইয়া, সুন্দরী রৌশন অগত্যা সম্রাট্‌পুত্রের হুকুম তামিল করিল। যুবরাজের চিত্ততোষের জন্য, একপাত্র গোলাপবাসিত-সিরাজী তাঁহার মুখের কাছে ধরিল।

যুবরাজ মদিরাপাত্র শেষ করিয়া, জড়িতস্বরে তাহাকে বলিলেন—"পিয়ারি! তুমি বড় সুন্দর! তোমার সৌন্দর্য্য আমার চক্ষে বড়ই মধুর লাগিয়াছে। বাঙ্গালীর ঘরে যে এত শ্রেষ্ঠ সুন্দরী থাকিতে পারে, তাহা আমার জানা ছিল না। আমি—আমি—আমার হারেমের প্রধান স্থান বাঙ্গালী-স্ত্রীলোকে পূর্ণ রাখিব। তুমিই তাহাদের অধীশ্বরী হইবে! তোমায় দেখিয়া অবধি, আমার হারেমের সকল সুন্দরীর সৌন্দর্য্যই যেন তিক্ত লাগিতেছে।"

বাদসাহের এই সোহাগে, সমাগতা সুন্দরী-মণ্ডলীর হৃদয়ে অভি-মানের তীব্র বিদ্যুৎজ্বালা ছুটিল। অনেকের প্রাণে ঈর্ষার দাবানল জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিবার সাহস ও অধিকার ত কাহারও নাই।

সেই অনুগৃহীতা সুন্দরী রৌশন বলিল, "না জাঁহাপনা! আমি আপনার রঙ্গমহালের অধীশ্বরী হইতে চাহি না, চিরকাল আপনার চরণ-সেবা করিব, চিরদিন আপনার এইরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ পাইব, ইহাই এ বাঁদির জীবনের কামনা।"

"তবে সুন্দরী! এস, সরিয়া এস—আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর। তুমি যে আমার অন্ধকারময় প্রাণ আলো করিয়া আছ রৌশন! সকল দেশের স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিয়া, খোদা বাঙ্গালাদেশের সুন্দরীদের গড়িয়াছেন—এ কথা সত্য নয় কি?"

সুজা মদিরাবিহ্বল-চিত্তে এতগুলি কথা বলিয়া, ক্লান্তভাবে সেই প্রশংসা-গর্ব্বিতা রৌশনবেগমের সুকোমল উরসোপরি ঢলিয়া পড়িলেন।

রৌশন, উজ্জ্বল পূর্ণিমা নিশির ন্যায় সদা হাস্যময়ী। সে সস্মিত-বদনে বলিল, "জাঁহাপনা এ বাঁদীর যেরূপ গৌরব বাড়াইলেন, তজ্জন্য সে অতি সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছে। ভারতের ভাবী-সম্রাট্, সাহজাদা সাহ-সুজার মুখনিঃসৃত সোহাগের কথা, যে এ দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ কামনা, তাহাও সে জানে। কিন্তু জাঁহাপনা! যে বঙ্গরমণীর সৌন্দর্য্য-গৌরবে আপনি আত্মহারা, তাহাদের শ্রেষ্ঠ রত্ন ত আপনার চোখে পড়ে নাই। যদি বীরভূমের জমীদার কিরণরায়ের পরমা সুন্দরী কন্যা, কখনও জাঁহাপনার দৃষ্টিগোচরে আসে, তাহা হইলে বুঝিবেন, রূপ কাহাকে বলে—আর সে রূপের মূল্য কি? এই অতুলনীয় সুন্দরীকুল তাহার সৌন্দর্য্যের মহাসমুদ্রে যেন ক্ষুদ্রতৃণের ন্যায়, ভাসিয়া যাইবে। যুবরাজ! কি লোকললামভূতা সে সৌন্দর্য্য! কি তীব্রোজ্জ্বল মহত্বময়ী সে রূপগরিমা! না—না—জাঁহাপনা! আমি তা ঠিক বর্ণনা করিতে পারিব না। এই দেখুন, সেই গরবিণীর অতুলনীয় চিত্র!"

তখনই কোমলাঙ্গী রৌশনের বস্ত্রমধ্য হইতে, একখানি আলেখ্য সাহ-সুজার সম্মুখে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইল! সাহজাদা এতক্ষণ রৌশনের ক্রোড়ে শুইয়া বেহেস্তের সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু সেই কমনীয় চিত্রপট দেখিয়া, সহসা শীকার-লোলুপ ব্যাঘ্রবৎ তীব্রবেগে উঠিয়া বসিলেন। চিত্রখানি তাঁহার চক্ষুর সহিত মিলিত হইবামাত্র, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। সেই মনোহর চিত্রপট দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"না—না—এ প্রলোভন আমি একবার

কাটাইয়াছি। রৌশন্—রৌশন্—শীঘ্র এই তস্‌বীর ছিঁড়িয়া ফেল। আর আমি উহা দেখিতে চাহি না।"

বঙ্গেশ্বর, কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে রৌশনের মুখের দিকে উদ্‌ভ্রান্ত-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। সে মোহ অপনীত হইলে, গম্ভীরকণ্ঠে বিরক্তির সহিত তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী সুন্দরী-মণ্ডলীকে আদেশ করিলেন—"তোমরা সকলেই এ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। এখন কেবল মাত্র এই রৌশনবিবিই আমার কাছে থাকিবেন।"

অনেকে উৎকণ্ঠায় ও আগ্রহে, সেই চিত্রপট দেখিতে আসিয়াছিল—সুজার নিষেধাজ্ঞায় সকলেই স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই উৎসবময়, দীপোজ্জলিত, গোলাপ-সুগন্ধিত কক্ষ, রমণী-সমাগম বিহীন হওয়ায় একেবারে নীরব হইয়া পড়িল। সুন্দরীগণ টলিতে টলিতে, রৌশনকে অভিশাপ দিতে দিতে, সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। কেবলমাত্র সাহ-সুজা ও তাঁহার অনুগ্রহ-প্রফুল্লা রৌশনবিবি সেই স্নিগ্ধ দীপোজ্জলিত নিস্তব্ধ কক্ষমধ্যে রহিলেন।

পাঠক! এই বঙ্গদেশীয়া রমণীকে কি আপনি চিনিতে পারিয়াছেন? ইনিই সেই রঘুদেব ঘোষালের অপহৃতা, প্রলুব্ধা, কুলকলঙ্কিনী কন্যা—রত্নময়ী। সাহ-সুজা আদর করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন—রৌশন বেগম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রত্নময়ীকে নির্জ্জনে পাইয়া, সাহ-সুজা উৎকণ্ঠিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রৌশন্! বল দেখি, এ চিত্র তুমি কোথায় পাইলে?"

এই প্রশ্নকালে কি জন্য জানি না—সুজার মস্তিষ্কে সেরাজির তেজ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সহজ বুদ্ধি আসিয়া জমিতেছিল। সাহজাদা যেন তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ।

রত্নময়ী বলিল—"জাঁহাপনা! আমার পিতার পূর্ব্ব বাসস্থান বীরভূমি। জমীদার কিরণরায়ের কন্যা, এই প্রভাবতী আমার বাল্যসখী। দুইজনে সর্ব্বদা একত্রে কাল কাটাইতাম। আমাদের দুইজনের মধ্যে বড়ই প্রীতি ছিল। প্রভাবতীই আমাকে সখীত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনস্বরূপ এই চিত্র উপহার দিয়াছিল।"

সুজার চরিত্র সংসর্গদোষে কলুষিত হইলেও, মন নিতান্ত অনুদার ছিল না। তিনি সহাস্যে বলিলেন—"তবে আমায় ইহা দেখাইলে কেন? সখীত্বের পবিত্র নিদর্শন, আমার ন্যায় ইন্দ্রিয়লোলুপকে দেখাইয়া অপবিত্র করিলে কেন—রৌশন জান? প্রভাবতীর সখী হইয়া, তাহার শত্রুর কার্য্য করিলে কেন?"

"শত্রুর কাজ করিয়াছি? না—জাঁহাপনা! এ দাসী হুজুরালির চরণাশ্রিতা মাত্র! জনাবের সুখস্বচ্ছন্দের দিকেই কেবল তাহার লক্ষ্য। আজ আমার রূপ যৌবন আছে, তাই আপনার এত অনুগ্রহ। কিন্তু চিরকাল ত এ ছার রূপ থাকিবে না, তখন কি হইবে জনাবালি? তাই মনে ভাবিয়াছি—যাহাতে এ দাসী বাদসাহের চির-অনুগ্রহ পায়, তাহারই উপায় করিব। আমি কিরণ রায়ের রূপবতী কন্যাকে

আপনার অঙ্কে তুলিয়া দিব। অবশ্য এই উপকারজনিত কৃতজ্ঞতা, আমাকে আপনার হৃদয়ে চিরদিন সজীব করিয়া রাখিবে।”

সুজার হৃদয়ে উদারতা বলিয়া একটা জিনিস ছিল। রৌশন-বেগমের কথা শুনিয়া তিনি অতীব বিস্মিতচিত্তে বলিলেন—“রৌশন্ বল কি? না না—তুমি বোধ হয় আমার সহিত রহস্য করিতেছ? সাহজাহান বাদসাহের পুত্র, এই বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার মালিক, অসীম প্রতাপশালী সাহ-সুজা, এরূপ রহস্য কখনই পসন্দ করেন না।”

“না—যুবরাজ! আপনার সহিত রহস্য করিতে পারে—এ বাঁদির এত স্পর্দ্ধা নাই। তবে নিতান্ত চরণাশ্রিতা ও অনুগৃহীতা বলিয়াই এরূপ বলিতে সাহসী হইয়াছি। আপনাকে তাহার প্রতি আসক্ত করিব বলিয়াই, এ চিত্রপট আনিয়াছি। যদি যুবরাজের ইচ্ছা হয়, তবে তাহাকে খোস্‌রোজের পরই আপনার অন্তঃপুরচারিণী করিব।”

“বটে! বটে! কিন্তু রৌশন্‌জান! তুমি যে এত সহজে তোমার সখীর সর্ব্বনাশ করিবে—ইহা ত আমার বোধ হয় না। হিন্দু-রমণীর হৃদয় যতই কলুষিত হউক না কেন—অপরের সতীত্ব-সম্মান রক্ষা করিতে, সে স্বতঃই অগ্রসর হয়। তবে কেন তাহার এ সর্ব্বনাশ করিবে?”

“সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ কিসের যুবরাজ? যিনি আজ বাদে কাল সমস্ত হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হইবেন, তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হওয়ায় যদি সর্ব্বনাশ হয়, তাহা হইলে এ দুঃখের দুনিয়ায় সুখ কাকে বলে, তাত জানি না! দুনিয়ার মালিক বাদসাহের পুত্রগণের সহিত, যে সম্পর্ক স্থাপনে—অম্বর, মারওয়ার, যশলমীরায়, বিকানীর চরিতার্থ বোধ করে—সামান্য বাঙ্গালী জমীদার কিরণরায় অযাচিতভাবে সে সৌভাগ্য পাইলে কি নিজেকে মহা সৌভাগ্যবান্ বোধ করিবেন না?”

সুজার সরল চিত্ত এই প্রকার চাটুবাদে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল,—সেই স্বাভাবিক উদারতার পরিবর্ত্তে, ইন্দ্রিয়লোলুপতার ভীষণ কালচ্ছায়া আবার সেই বিবেক-পবিত্র হৃদয়কে কলঙ্কিত করিল। পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নাময়ী উজ্জ্বল আকাশে, প্রলয়ের [illegible] ফুটিয়া উঠিল।

সুজা সহাস্যে বলিলেন—"যা বলিতেছ—তা সত্য বটে রোশন্! কিন্তু প্রিয়তমে! আমি এ কিশোরীকে পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছি। আমি সেই দুর্ব্বৃত্ত কিরণরায়কেও বিশেষ জানি। যখন আমি ঢাকায় ছিলাম, তখন কোন বিশেষ কারণে কিরণরায়কে সপরিবারে রাজ-ধানীতে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলাম। গবাক্ষপথে একদিন আমি তাহার কন্যাকে প্রথম দেখি। যাহা দেখিলাম, তাহা জীবনে আর কখনও দেখি নাই। চক্ষে পলক নাই—দেহে সংজ্ঞা নাই, প্রাণভরিয়া আমি সেই রূপতরঙ্গময়ী কিশোরীর সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিলাম। জানিনা, যৌবন-সমাগমে, বসন্ত-শোভাময়ী ধরার ন্যায়, এখন সে কতই না রূপসী হইয়াছে! সেই প্রভাত-কমলবৎ অপরিস্ফুট সৌন্দর্য্য, যৌবনসন্ধিগত হইয়া কতই না মোহনীয়রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে! তখন কোন বিশেষ কারণে, আমাকে তাহার আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই চিত্রপট আবার আমাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে! রোশন্! প্রিয়তমে! কেন আমার প্রাণে এ অনল-জ্বালার সৃষ্টি করিলে? ইহার জন্য যাহা কিছু করিতে হইবে, আমি তাহা করিতে প্রস্তুত। তুমিও আমার সহায় হও। তুমি সত্যই বলিয়াছ—সাহ-সুজা তোমার এ অযাচিত উপকারের কৃতজ্ঞতা-ঋণ পরিশোধে কখনই কুণ্ঠিত হইবে না। আমি এ তেজপূর্ণা রমণীর দর্পচূর্ণ করিতে চাই। কিরণরায়ের নিকট যখন আমি বিবাহসম্বন্ধে

গোপনে প্রস্তাব করিয়া পাঠাই, তখন সে আমার দূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। সে কথা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। কিন্তু প্রভাবতীর এ চিত্র দেখিয়া আমার প্রাণে আবার আগুন জ্বলিয়াছে।”

কুটিলা রৌশনবেগম মনে মনে বড়ই প্রীতা হইল। কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া সে বলিল—“জাঁহাপনা! উপযুক্ত অবসরের অপেক্ষা করুন, আপনার অভিলাষ নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। আমি যে এপ্রকার অবস্থায় এখানে আছি, তাহা সে জানে না। “খোসরোজের” দিন, অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের সহিত নিশ্চয়ই তাহাকে এখানে আসিতে হইবে। কিরণরায় বিষয়ী ও বুদ্ধিমান হইলেও বড় ভীরু। সে পরওয়ানা পাইলে, সাহাজাদার আজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন করিতে সাহস করিবে না। প্রভাবতী যদি আমায় এখানে দেখিতে পায়, হয়ত ভাবিবে, তাহার ন্যায় আমিও এখানে খোসরোজ দেখিতে আসিয়াছি। তার পর সেদিন যাহা করিতে হয়—আমিই করিব। নিশ্চয় জানিবেন—এই রত্নময়ীর কৌশলে, সেই সরলা হরিণী বাগুরাবদ্ধ হইবে।”

সুবিধা, সুযোগ, প্রলোভন আর জ্বালাময় রূপতৃষ্ণা, সুজার হৃদয়কে বিশেষরূপে প্রলুব্ধ করিল। তিনি আর এক পাত্র, স্নিগ্ধ গোলাববাসিত, সিরাজী পান করিয়া ধীরে ধীরে সেইখানে শুইয়া পড়িলেন। গৃহ-মধ্যস্থ উজ্জ্বল দীপাবলী ক্রমশঃ স্নেহশূন্য হইয়া, একে একে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সরস পুষ্পমালিকার উন্মাদনাময় সুগন্ধে, মদিরোন্মত্ত, উষ্ণমস্তিষ্ক সাহজাদা শীঘ্রই-নিদ্রার ক্রোড়ে শুইয়া ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

সম্রাট্-পুত্র স্বপ্নে দেখিলেন—“একটী লোহিত-প্রস্তরময় দীপ্তিপূর্ণ কক্ষে, অসংখ্য সুবাসিত শুভ্র ফুলের মালা দুলিতেছে। ফুলের সুগন্ধ,

আর দীপাবলীর উজ্জল আলো, যেন সেই স্থানকে বেহেস্ত করিয়া তুলিয়াছে। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ললনাগণ, পুষ্পমাল্য হস্তে একখানি হৈমসিংহাসন বেষ্টন করিয়া সস্মিতমুখে দাঁড়াইয়া আছে। গৃহমধ্যে মৃদঙ্গ, রবাব, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।”

“সেই দীপোজ্জলিত কক্ষে, সেই বিচিত্র হৈম-সিংহাসনে বসিয়া, এক অতুলনীয়া সুন্দরী। সুজা, যেমন সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন—মাল্যধারিণী সুন্দরীগণ তখনিই সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। সেই সিংহাসনোপবিষ্টা অনিন্দ্য অপ্সরীমূর্ত্তি, ধীরে ধীরে হাতখানি ধরিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইল। তৎপরে সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা—সহাস্যমুখে, সস্মিত-বদনে তাঁহার গলদেশে এক অতি শুভ্র মালতীমালা অর্পণ করিল। এই মালিকার সুবাস, বসন্তের মলয়, কক্ষের অসংখ্য দীপাবলীর উজ্জল আলো, আর সেই অলোকসামান্যা রূপসীর রূপজ্যোতি, এই সব যেন তাঁহার স্থিরমস্তিষ্কে একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত করিল।”

“সুজা ভাবিলেন—তিনি যেন কোন কুহেলিকাময় স্বপ্নরাজ্যে, অপ্সরীদিগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। এত সুন্দর, সুনির্ম্মল, সমুজ্জ্বল রূপসম্ভার আর কখনও তাঁহার চোখে পড়ে নাই।”

“যে সুন্দরী তাঁহার গলায় মালা দিয়াছিল—সে যেন হাসিয়া বলিল—নিষ্ঠুর! দেখিতেছ না—তোমার জন্য আমি উন্মাদিনী। এই কি তোমার প্রেমের মূল্য? আমার ভালবাসার মূল্য? আমি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা অপ্সরারাণী হইয়া, তোমায় এত সাধিতেছি—আর, তুমি কি করিয়া তাহার প্রতিদান করিতে হয়—তাহাও বুঝিলে না। কি লজ্জা! কি ঘৃণা! কি পরিতাপ!”

“সাহ-সুজা, এই কথায় লজ্জিত হইয়া, আবেগভরে সেই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠার সুকোমল করকমল গ্রহণ করিতে গেলেন। সে যেন ঘৃণায়

সহিত বিদ্যুৎবেগে হাতখানি সরাইয়া লইল। সুজা করুণনয়নে তাহার সুন্দর মুখের দিকে চাহিলেন। বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে দেখিলেন, সেই অপ্সররাণী আর কেহই নহেন—কিরণরায়ের অলোকসামান্যা অতুলনীয় রূপজ্বালাময়ী কন্যা—প্রভাবতী।"

"সহসা যেন সেই উজ্জল কক্ষের দীপাবলী নিভিয়া গেল। সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, যেন ঘৃণাভরে সুজাকে পদদলিত করিয়া চলিয়া গেলেন। সুজা, আবেগভরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"প্রভা! যাইও না, নিষ্ঠুর হইও না।" এমন সময়ে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।"

রৌশনবেগম সুজার পার্শ্বেই শুইয়াছিল। সে চোখ বুজিয়া অনেক কথাই ভাবিতেছিল। তাহার সুনিদ্রা হয় নাই। সহসা সাহজাদাকে চীৎকার করিয়া উঠিতে দেখিয়া, সে বুঝিল—সুজার মাদকোত্তেজিত মস্তিষ্ক মধ্যে, তাহার তীব্র ঔষধ প্রবেশ করিয়াছে। সুজাকে কোমলালিঙ্গন নিপীড়িত করিয়া, রোশেনা বলিল—"কি হইয়াছে জাঁহাপনা! আপনি কি কোন বিকট স্বপ্ন দেখিয়াছেন?"

সুজা, স্থিরস্বরে বলিলেন—"না রৌশন্‌, সে স্বপ্ন অতি মধুর, অতি উজ্জল! স্বপ্নে আমি প্রভাকে দেখিয়াছি। আহা! তাহার সে রূপ কত দীপ্তিময়। কিন্তু—সে আমাকে পদাঘাতে বিদূরিত করিয়া দিল।"

রৌশন সহাস্যমুখে বলিল—"স্বপ্নের ফল প্রায়ই বিপরীত হয়। বিশেষতঃ—প্রভাত-স্বপ্ন। সেই স্বপ্নদৃষ্টা সুন্দরী, আপনাকে পদাঘাত করিয়াছে—ইহার বিপরীত অর্থ এই, সে পরে পায়ে ধরিয়া আপনাকে সাধিবে।" সুজা এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া—পুনরায় নিদ্রিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে সময়ে রাজমহলের প্রস্তরময় দুর্গমধ্যে, দীপাবলি-উজ্জ্বলিত রত্নখচিত কক্ষে, পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদোল্লিখিত ঘটনাবলীর অভিনয় হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে, ঢাকার ফৌজদার রায়-রাইয়াঁ যুগলকিশোরের অন্ধকারময় ভবনের এক নিভৃত কক্ষে, একটী মহা গোপনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল।

কক্ষটী সুসজ্জিত হইলেও, ক্ষুদ্র বর্ত্তিকার মলিন আলোক-ছটায় তাহার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নয়নগোচর হইতেছিল না। হর্ম্মতলে এক বিস্তৃত গালিচার উপর উপবেশন করিয়া, বাঙ্গালার আটজন ক্ষুদ্র দিক্‌পাল অতি নিভৃতে এক গূঢ় মন্ত্রণায় ব্যস্ত ছিলেন।

কক্ষমধ্যে সকলেই মলিন-মুখে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন। সকলেরই মুখ প্রফুল্লতাহীন ও ঘোর চিন্তারেখাঙ্কিত। সকল মুখেই বিপদাশঙ্কাজনিত—কালচ্ছায়া ও ঘোর বিষণ্ণতা। মহাঝটিকার পূর্ব্বে যেমন সমগ্র বিরাট প্রকৃতি স্থিরভাব ধারণ করেন, তাঁহারা সকলে মুখোমুখী হইয়া সেইরূপ স্থিরভাবে উপবিষ্ট।

গভীর নিশীথকাল। চরাচর নিস্তব্ধভাবে সুপ্ত। বিরাট প্রকৃতি, অন্ধকারতলে নীরবে বিশ্রাম করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নৈশ-পবনের সন্ সন্ শব্দ, আর পথিপার্শ্বস্থ সারমেয়ের চীৎকারধ্বনি, সেই গম্ভীর নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল, আর অদূরস্থিত ঘনপল্লবময় বৃক্ষশাখাসীন পেচকের গভীর কণ্ঠস্বর, আবার তাহার সহায়তা করিতেছিল।

যুগলকিশোর সর্ব্বপ্রথমে সেই নির্জ্জন কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। তিনি বাদসাহের প্রধান আমিলদার। বঙ্গেশ্বর সুজার অধীনস্থ হইলে কি হয়, দিল্লীর সরকার হইতে তিনি নিয়োজিত হইয়াছেন। তাঁহার সাহসও যথেষ্ট। তিনি গুরুগম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন—"আপনারা মনে মনে কি স্থির করিলেন, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।"

একজন জমীদার উত্তর করিলেন—"আমার মতে এ নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া, আমাদের স্ত্রী কন্যাকে রাজমহলে না পাঠানই ভাল। যখন উভয়দিকেই বিপদ-সম্ভাবনা, তখন প্রথমটা অপেক্ষা শেষটাই আমাদের ঘটুক।"

আর এক জন বলিলেন—"মুখের কথা ও কাজের কথায় অনেক প্রভেদ। ভবিষ্যৎ অনুমান ও প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান, এই উভয়ের মধ্যেও বিভিন্নতা অনেক। খোস্‌রোজে কন্যাপ্রেরণ না করিলে, যেরূপ শোচনীয় পরিণাম হইবে আপনি অনুমান করিতেছেন, প্রকৃত কার্য্যকালে সেটা ততটা ভয়ঙ্কর না হইতেও পারে। সাহ-সুজা ন্যায়দর্শী সম্রাট্ সাহজাহানের পুত্র। তিনি এই বঙ্গবিহার উড়িষ্যার ভাগ্য-বিধাতা। সম্রাট্ যখন জীবিত, তখন তাঁহার এতদূর সাহস হইবে না যে, তিনি নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত কুলমহিলাগণকে আয়ত্বে পাইয়া কোন প্রকার অবমাননা করেন। তাহা হইলে দিল্লী ও আগরার রঙ্গমহলে, রাজপুত হিন্দু-রমণীগণ বিশ্বস্তচিত্তে যাতায়াত করিতে পারিবেন না। দৈবের উপর নির্ভর করিয়া এক্ষেত্রে কাজ করা যাক্—দৈবই আমাদের রক্ষা করিবেন।"

আর এক জন জমীদার বলিলেন—"দৈব পুরুষকারের বিরোধী। দেবতা, রক্ষার ভার মানবের নিজের হাতেই দিয়াছেন। মানব কেবল উপলক্ষ্যরূপে, দৈবের সহায়তা গ্রহণ করে মাত্র। মানব যদি

ইচ্ছা করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনে, তাহা হইলে দৈব কিছুতেই তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। রাজমহলে কুলমহিলাদের প্রেরণ করিলে, আমরা ইচ্ছা করিয়াই বিপদ ডাকিয়া আনিব।"

আর একজন বলিলেন—"আর এক কাজ করা যাক্। প্রচুর অর্থ দিয়া কতকগুলি সুন্দরী স্বৈরিণী সংগ্রহ করিয়া, কুলকন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাহাদের উৎসবক্ষেত্রে পাঠান হউক। তাহারা স্বভাবসিদ্ধ চতুরতা ও হাবভাবে সুজাকে অনায়াসে প্রতারিত করিয়া আসিবে এবং আমাদেরও কুলমান রক্ষা হইবে। আমরা এইরূপ প্রতারণা-সহায়তায় এক আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইব।"

আর একজন বলিলেন—"সরলভাবে কার্য্য করিলে বোধ হয়, সাহ-সুজা কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হইবেন না। মোগল-রাজবংশে জন্মিয়া তিনি যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত, এমন নহে। তাঁহার হৃদয়ে উদারতা বলিয়া একটা প্রবৃত্তি প্রস্ফুটভাবে আছে, তাহা আমরা জানি। তাঁহার অনেক কার্য্যে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এ প্রকারে প্রতারণা করিলে, যদি ভবিষ্যতে তাহা কখনও প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ভীষণ প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। আর সেই অগ্নিতে বাঙ্গালার সমস্ত জমীদারগণ ভস্মীভূত হইবেন। তখন সম্রাট্-পুত্রের কোপমুখ হইতে, আত্মরক্ষার কোন উপায়ই থাকিবে না।"

বীরভূমির জমীদার—কিরণরায় মহাশয়, এতক্ষণ মৌনাবলম্বনে সকলের কথাই শুনিতেছিলেন। এ পর্য্যন্ত কোন কথাই কহেন নাই। সকলের বক্তব্য শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"এখনও ত খোস্‌রোজের দুই মাস বিলম্ব আছে। আমার মতে এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া সওয়ার ডাকে, সাহজাঁহা বাদসাহের নিকট দিল্লীতে আবেদনপত্র-

সমেত উকীল পাঠান হউক, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুজাকে কোন বিশেষ ওজর দেখাইয়া উৎসব-কার্য্য আপাততঃ বন্ধ রাখান হউক।"

বিজ্ঞ, পক্ককেশ যুগলকিশোর সকলেরই যুক্তি শুনিলেন এবং পরিশেষে হাস্য করিয়া কহিলেন—"মহাশয়গণ! আপনাদের সকলকার অভিপ্রায়ই শুনিলাম। কিন্তু ইহার কোনটীই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমার মতে সুজার দরবারে সকলেরই স্ত্রী-কন্যা পাঠান উচিত। রাজমহলে ত তাহাদের একাকী পাঠান হইতেছে না। আমরা ত সকলেই সদলবলে সঙ্গে যাইতেছি। সাহজাদা যে বাঙ্গলার জমীদারবর্গকে একেবারে ভয় করিয়া চলেন না—তাহাও নহে। বিশেষতঃ ন্যায়পরায়ণ বাদসাহ সাহজাঁহা, যতদিন সিংহাসনে বিরাজমান—ততদিন সাহজাদা অতিরিক্তরূপে যথেচ্ছাচারী হইলেও বাঙ্গালার শক্তিসম্পন্ন জমীদারদের স্ত্রী-কন্যার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিতে সাহসী হইবেন না। আর, আমি মোগল-বাদসাহের কর্ম্মচারী। সাহসুজার সহিত আমাকে প্রায়ই মিশিতে হয়। তাঁহার হৃদয় অতি উদার। প্রাণ মহত্ত্বে পূর্ণ। কিন্তু মেঘ যেরূপ চন্দ্রের জ্যোতিঃ হ্রাস করে, সেই শয়তান রোশন খাঁ, সেইরূপ সম্রাট্-পুত্রের প্রাণের স্বাভাবিক মহত্ত্ব মলিন করিয়া দিতেছে। সবই বুঝি—সবই জানি। কেবল অবস্থার দাস হইয়া নির্ব্বাক্ আছি। এই উৎসবকার্য্যে এখন বাধা দিলে, আমাদের হয়ত বাদসাহের কোপ-মুখে পড়িতে হইবে। কিন্তু এ কার্য্যে সম্মতি দিলে, তাহার কোন সম্ভাবনাই নাই। বিশেষতঃ দিল্লীর রাজনৈতিক-আকাশ, এখন ভয়ানক মেঘাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে বাদসাহের সঙ্কট পীড়াদি উপস্থিত হওয়াতে, দিল্লীর সিংহাসন লইয়া রাজকুমারগণের মধ্যে মহা হুলস্থূল উপস্থিত হইয়াছে। অগ্নি চারিদিকেই ধূমায়িত অবস্থায় বর্ত্তমান।

এ সময়ে জমিদারদের সহিত কোনরূপ গর্হিত ব্যবহার করিলে, সুজার স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটিবে—অনিষ্ট বই ইষ্টসাধন হইবে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের দৈবের উপর নির্ভর করিয়া স্ত্রী-কন্যা রাজমহলে পাঠান উচিত।”

যুগলকিশোর নিস্তব্ধ হইলে, অন্যান্য সকলে মনে মনে স্থিরভাবে তাঁহার কথাগুলি আলোচনা করিয়া বলিলেন—“আপনার এ সুন্দর যুক্তিই আমাদের গ্রহণীয়।”

কিন্তু বীরভূমের জমীদার কিরণরায়, সর্ব্বশেষে গম্ভীর অথচ সুদৃঢ়-স্বরে বলিলেন—“আমার মত, আপনাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আপনারা যাহা করিতে হয় করুন, কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার পরিবারবর্গের কাহাকেও আমি রাজমহলে যাইতে দিব না। ইহাতে আমার যে শোচনীয় পরিণাম হয় হউক, আমি তাহার ফলাফল ভোগ করিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।”

যদি সেই সময়ে, সেই স্থানে সহসা বজ্রপতন হইত, আর সেই বজ্রাগ্নিতে সেই কক্ষ দীপ্তিময় হইয়া উঠিত, তাহা হইলেও গৃহস্থিত সকলে ততদূর চমকিত হইতেন না। ইতিপূর্ব্বে, বৃদ্ধ জমীদার কিরণ-রায়ের ভীরুতা অপবাদ লইয়া, সকলেই কাণাকাণি করিত। সকলেই এখন দেখিলেন, কিরণরায়ের সাহস তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। যিনি বঙ্গেশ্বরের একজন প্রধান কর্ম্মচারীর সম্মুখে, এরূপ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন, আর তাহার শোচনীয় পরিণাম জানিয়াও শঙ্কিত নহেন, তাঁহার সাহসও অপরিমেয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—o—

কিরণচন্দ্র রায় মহাশয়, গভীর মানসিক উত্তেজনা লইয়া, মধ্য-নিশীথে তাঁহার ঢাকার বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ঢাকা, পুরাতন রাজধানী, কাজেই ঢাকায় অনেক জমীদার, স্থায়ীরূপে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুজার উৎপীড়নে, তিনি পূর্ব্বে একবার ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে সাহ-সুজা ত আর ঢাকায় থাকেন না। রাজমহলই তাঁহার রাজধানী। সুতরাং অনেক সময়ে, প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া কিরণরায় ঢাকায় থাকিতেন।

রজনীর দ্বিযাম অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—এমন সময়ে কিরণ রায় উদ্বেলিতচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বাহ্য-জগতের অন্ধকারের ছায়া, যেন তাঁহার ভবিষ্যতের উপর বড়ই গভীরভাবে প্রতিফলিত হইতেছিল।

তিনি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া একটী কক্ষদ্বারে করাঘাত পূর্ব্বক মৃদুস্বরে ডাকিলেন—"মা প্রভা! তুই কি এখনও ঘুমাস্‌নি—আমার জন্য জাগিয়া আছিস্? তোর কক্ষে আলো জ্বলিতেছে কেন?"

প্রভা, পিতার স্নেহময় কণ্ঠস্বর শুনিয়া, সানন্দে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—"বাবা! আমি এখনও ঘুমাইতে পারি নাই। তুমি বাহিরে আছ—নিদ্রা আসিবে কেন বাবা? তোমাদের মন্ত্রণায় কি স্থির হইল শুনিব বলিয়া, এখনও জাগিয়া বসিয়া আছি। মনকে ভয়শূন্য ও চিন্তাশূন্য করিবার জন্য, মহাভারত পাঠ করিতেছি। হাঁ বাবা—সকলের পরামর্শে কি স্থির হইল? আমাদের কি রাজমহলে যাইতে হইবে?"

কিরণরায়, স্নেহময়ী কন্যার ঔৎসুক্যপ্রসূত এতগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে না পারিয়া, মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন,—"আমায় আগে একটু বিশ্রাম করিতে দে মা! তারপর তোকে সব কথাই বলিব।"

প্রভার একটু বিশেষ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। প্রভাবতী, কিরণ-চন্দ্র রায় জমীদার মহাশয়ের একমাত্র সন্তান, তাঁহার অতুল বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। প্রভার জন্মের পূর্ব্বে, তাহার দুইটী ভাই হয়—কিন্তু তাহাদের একটী আট বৎসরের ও অপরটী দশ বৎসরের হইয়া ভগবানে বিলীন হইয়াছে।

প্রভা মাতৃহীনা। ভ্রাতাদের মৃত্যুর পরই, তাহার মাতা পুত্রশোকে রুগ্না হইয়া পড়েন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যুর সময়, প্রভার বয়স তিন বৎসর ছিল। তাহার এক মাতৃস্বসা, কিরণ-রায়ের গৃহে বাস করিয়া, সেই মাতৃহীনা বালিকা প্রভাবতীকে লালন-পালন করেন।

প্রভা সকল সৌন্দর্য্যের আধার! সে রূপরাশি পরিস্ফুট করিতে সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকাও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। তাহার প্রশান্ত ও কমনীয় মুখে, প্রভাত-কমলের সুনির্ম্মল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। পবিত্রতা যেন সে মুখে আরও শুভ্রতর হইয়া বিরাজ করিতেছে। সে হৃদয়ে স্নেহ, দয়া, মমতা, সর্ব্বজীবে সমভাব, আত্মসম্মান বোধ প্রভৃতি গুণরাশি পাশাপাশি হইয়া অবস্থান করিতেছিল। বিধাতা, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ দেখাইবার জন্যই, যেন নির্জ্জনে বসিয়া এই অনিন্দ্য-সুন্দরী প্রভার অপূর্ব্বমূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন!

প্রভা বাল্যকাল হইতে মাতৃহীনা—সুতরাং বৃদ্ধ পিতার অতিশয় স্নেহের পাত্রী। তাহার বয়স এক্ষণে চতুর্দ্দশ বৎসর। বাঙ্গালীর ঘরে সেকালে এত বড় মেয়ে রাখা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কিন্তু উপায় না

থাকিলে কি হইবে? কিরণরায় গৃহ-জামাতার পক্ষপাতী—কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটীও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গুণবান্ পাত্র তাঁহার চক্ষে পড়িল না। এ নাগাদ একটী পাত্রও তাঁহার পসন্দমত হয় নাই। কাজেই প্রভার বিবাহে এত বিলম্ব। একমাত্র স্নেহময়ী কন্যাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে, তিনি নিতান্তই অনিচ্ছুক। এই জন্যই, কোন পাত্রই তাঁহার পসন্দসই হইতেছিল না।

সেই স্নেহময়ী কন্যা, পিতার জন্য সযত্নে প্রস্তুত নানাবিধ রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্যাদি থরে থরে এক রৌপ্যপাত্রে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। প্রভা কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে, রায় মহাশয়ের আহার হইত না। তিনি আহারে বসিলেন, আর প্রভা একখানি ব্যজনী লইয়া পিতাকে ব্যজন করিতে লাগিল।

যাহার হৃদয়ে দারুণ দুশ্চিন্তা, তাহার মুখে আহার রুচিবে কেন? কিরণরায়ের পাত্রস্থ আহার্য্য-দ্রব্য, সেইরূপই রহিল। তিনি আচমন করিয়া উঠিয়া, তাম্বূল-চর্ব্বণ আরম্ভ করিলেন।

প্রভা বলিল—"বাবা! আমি সংসারজ্ঞান-শূন্যা হইলেও দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, দারুণ দুশ্চিন্তা তোমার মনকে ব্যথিত করিতেছে। এই চিন্তা যদি অন্ধকার ঘটনাসম্ভূত হয়—তাহা হইলে আমিই তাহার প্রতিকার করিব। তোমার আগে, আমি ইহার উপায় চিন্তা করিয়া রাখিয়াছি।"

"তুমি ইহার প্রতিকার করিবে কি করিয়া মা? তোমার এমন কি ক্ষমতা যে, পিতার এই দারুণ দুশ্চিন্তার অপনয়ন করিতে পার? মা! তোমার জন্যই ত আমার যত ভাবনা!"

"বাবা! তুমি মন্ত্রণাগৃহে যাইবার পূর্ব্বেই আমি এক উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি। বুদ্ধিহীনা সন্তান আমি তোমার, কিন্তু

তোমাদের পরামর্শে কি স্থির হইবে, আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। বাবা! আমি তোমারি কন্যা, তোমার মনের ভাব আমি অনুভবে বুঝিতে পারি।"

"আচ্ছা বল দেখি প্রভা, আমাদের কি মন্ত্রণা স্থির হইয়াছে?"

"সকলেই বাদসাহের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন—কেবল তুমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছ।"

পাঠক জানেন, কিরণরায় তাঁহার কন্যা প্রভাবতীকে তাঁহাদের মন্ত্রণার কথা এ পর্য্যন্ত কিছুই বলেন নাই—সুতরাং প্রভার তীক্ষ্ণ প্রতিভায় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মনে ভাবিলেন, এই বালিকা কি অমানুষী শক্তিসম্পন্না?

কন্যা, পিতার মনের ভাব বুঝিয়া, ধীরে ধীরে কোমলকণ্ঠে, বলিল—"পিতঃ! আমি অতি তুচ্ছ। এই মেদ-মাংসময় দেহ, তোমা হইতেই উৎপন্ন। তোমা অপেক্ষা কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝিবার একটুও স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। কিন্তু নিশ্চয় জানিও—পিতঃ! সম্রাট্‌পুত্রের প্রস্তাবে সম্মত না হইলে, তোমার ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইবে! যে বিপদের জন্য তুমি এত চিন্তিত হইয়াছ, তাহা আপনি আসিয়াই উপস্থিত হইবে। বাবা! আমার কথা শোন, তোমার স্নেহময়ী প্রাণোপমা কন্যার কথা রাখ—আমাকে সুজার দরবারে নিশ্চিন্তচিত্তে পাঠাইয়া দাও। সকলে যখন যাইতেছে, আমি না যাইব কেন? তারপর সেখানে গিয়া, যাহা করিবার তাহা করিব। যদি এ উৎসব-অনুষ্ঠানে, অত্যাচার করাই সাহসুজার ঈপ্সিত হয়, তাহা হইলে আমি এমন কিছু করিব, যাহাতে এ বঙ্গদেশ হইতে চিরকালের জন্য এ প্রকার অত্যাচারের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে।"

কিরণরায় নিস্তব্ধে কন্যার কথা শুনিলেন, কিন্তু তাহার শেষাংশের

মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। চিন্তিতভাবে বলিলেন,—“প্রভা! তোমার মনের উদ্দেশ্য যে কি, কিছুই বুঝিলাম না। আমি যে ভীষণ ব্যাপার হইতে তোমাকে নিবৃত্ত করিতে যাইতেছি, তুমি স্বেচ্ছায় তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত! তুমি বালিকা, সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা, একান্ত বোধশূন্যা। পিতার স্নেহময় ক্রোড়, আর উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি সাহজাদার বিলাসের তাণ্ডব-লীলাময় অন্তঃপুর—দুইটী ক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তুমি বালিকা-হৃদয়ের উত্তেজনা-বশে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ। হয়ত এরূপ ক্ষেত্রে, নিজের ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াইতে পারে, তাহা চিন্তা করিবার অবসরও পাও নাই।”

প্রভাবতী অতি ধীরভাবে বলিল—“না পিতঃ! উত্তেজনা নয়, সকল কথা খুলিয়া না বলিলে তুমি বুঝিতে পারিবে না। সুজার মৃত্যুবাণ যে আমার হাতে রহিয়াছে! তুমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু আমি ত তাহা ভুলি নাই। পিতঃ! দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া দেখ। দুর্ব্বৃত্ত সুজা তোমাকে সপরিবারে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, একবার ঢাকাতে নজরবন্দী করেন। সে সময়ে আমি তোমার কাছে ছিলাম।”

“সুজা আমাদিগকে তাঁহার নিজ কক্ষের পার্শ্বে, এক নির্জ্জন মহলে অবরোধ করিয়া রাখেন। এ কথা ত মনে আছে।”

“সেই সময়ে একদিন গভীর নিশীথে সেই পিতৃদ্রোহী সম্রাট্-পুত্র, যে ভয়ানক মন্ত্রণায় তাঁহার মন্ত্রিবর্গের সহিত লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার আদ্যোপান্ত আমি জানি। সম্রাট্ সাহজাহানের সেই সময়ে কঠিন পীড়া। সুজা—সম্রাটের জীবনের সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় স্বীয় ভ্রাতৃগণকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়া, সম্রাট্‌কে বিষ খাওয়াইবার মন্ত্রণা করেন। সাহসুজা এ সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতা ঔরঙ্গজেবকে ও

তাঁহার আগরার প্রধান প্রণিধি মওয়াজি খাঁকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা আমারই হাতে পড়িয়াছে। পত্র-দুখানি সাহসুজা নানা কারণে সেই সময়ে দিল্লীতে মওয়াজি খাঁর নিকট ও দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেবের নিকট পাঠাইতে পারেন নাই।”

“যে রাত্রে সুজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া আগরায় চলিয়া যান, সেই রাত্রে আমি পলায়নের চেষ্টা করিতে গিয়া এক ক্ষুদ্র গলিপথে কতকগুলি কাগজ পত্র কুড়াইয়া পাই। তাহার মধ্যে সুজার নামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরীয়ক ছিল। সেই অঙ্গুরীয়কের সহায়তায় সুজার গমনের ক্ষণকাল পরেই আমি মুক্তিলাভ করি, এবং আপনারও মুক্তিসাধন করি। সহসা স্বাধীনতা লাভে আপনি তখন বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি প্রকৃত রহস্ত আপনাকে জানিতে দিই নাই। দিবার প্রয়োজনও ছিল না। মুক্তি লইয়াই আমাদের কথা। সেই পারসী কাগজগুলি, পরে আমি অবসরক্রমে আমাদের বৃদ্ধ দেওয়ানকে দিয়া পড়াইয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুবরাজের বিদ্রোহসূচক পত্রখানিও ছিল। আমি সেইখানির সহায়তায় এবার কার্য্যোদ্ধার করিব। সুজা, সমবেত রমণীদের কাহারও উপর কোনরূপ অত্যাচার-চেষ্টা করিলেই, আমি তাঁহার মৃত্যুবাণ বাহির করিব।”

কিরণরায় স্থির হইয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। প্রভাবতীর কথা শেষ হইবামাত্র, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—“মা! যা বলিলি সবই বুঝিলাম। কিন্তু সাহসুজা যদি ইহাতে ভয় না পান, যদি তোমার উপর কোন অত্যাচার করেন, তোমার পবিত্র কুমারী-ধর্ম্মের উপর কোনরূপ কলঙ্ক পড়ে, তখন কি হইবে মা? তুই কি মনে করিয়াছিস্—বৃদ্ধ কিরণরায় বংশের কলঙ্ক লইয়া, কন্যার কলঙ্ক লইয়া জীবিত থাকিবে? না না তা নয়। সে অপমানে, রোষে, ক্ষোভে

প্রতিশোধ লইতে না পারিয়া, দারুণ মর্ম্মজ্বালায় আত্মহত্যা করিবে।"

একথা শুনিয়া প্রভার মুখ মলিনভাব ধারণ করিল। সে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"পিতঃ! সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। নারী-সম্মান রক্ষার উপায় আমার হাতে। হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছি—প্রাণ অপেক্ষা সতীত্বের মূল্য বুঝি। পিতঃ! প্রাণ দিয়া নিজের সতীত্ব রক্ষা করিব।"

পিতা ও দুহিতায় এ সম্বন্ধে এর পর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। কিরণরায় পরিশেষে প্রভার প্রস্তাবে অসম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন, সে যে জেদ্ ধরে, তাহা ছাড়ে না। প্রভা, অতীব তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী। অনেক সময়ে জমিদারি-ঘটিত ব্যাপারে, তিনি প্রভার পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন। বুদ্ধিমতী প্রভা, একবার তাঁহাকে কিরূপে মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, তাহা তিনি এখনও ভোলেন নাই। এবারও নূতন কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। রূপগৌরবে, সতীত্ব-গর্ব্বে প্রভা অদ্বিতীয়া। দেবতার উপর তাহার অগাধভক্তি। অনেক সময়ে নির্জ্জনে থাকিয়া তিনি দেখিয়াছেন, ভক্তিস্রোতে ভাসিয়া, প্রভার নলিন নয়ন হইতে অজস্র অশ্রুপ্রবাহ নিঃসারিত হইতেছে। সতীকুল-শিরোমণি মহাকাল-পত্নী, মহাকালীই তাহাকে এ বিপদসাগর হইতে রক্ষা করিবেন। এই সব ভাবিয়া কিরণ রায় অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন রাত্রে, দারুণ দুশ্চিন্তার ফলে প্রভাবতী একবারও চক্ষু মুদিত করে নাই। নানাবিধ উৎকট চিন্তায় রজনী কাটিয়া গিয়াছে। পরদিন প্রাতে উঠিয়া, স্নান করিয়া, চন্দন-কুঙ্কুমাগুরু-পরিলেপিতা ও পট্টবস্ত্র-পরিধানা হইয়া, ধূপদীপ-মালাচন্দন ও প্রসূনরাশি লইয়া প্রভাবতী তাহাদের গৃহদেবতা মহাকালীর মন্দিরে পূজার্থে উপস্থিত হইল।

সেই সুন্দরী কিশোরী, দেবীর সম্মুখে বসিয়া অঞ্জলি ভরিয়া মহাকালীর কোকনদ-লাঞ্ছিত পদে পুষ্পাদি অর্পণ করিল। পরে যুক্তহস্তে, ঊর্দ্ধমুখে, ভবানীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিল,—"মা গো! বাল্যকাল হইতে স্বহস্তে তোর ঐ রাজীব-চরণ-চন্দন-লিপ্ত জবায় শোভিত করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতে, তোর মন্দির-তল মার্জ্জনা করিতে শিখিয়াছি—যখনই মনে কোন যাতনা হইয়াছে, তখনই তোকে জানাইয়াছি। মাতৃহীনা আমি—তোকে মা বলিয়া প্রাণে শান্তি পাইয়াছি। কিন্তু দেখিস্ মা! এবার যেন আমার মান রক্ষা হয়। আমি অকূলে আত্মসমর্পণ করিতে চলিলাম। মা! তুই গৌরীরূপে কুমারী-মূর্ত্তি। দেখিস্ মা! যেন আমার কুমারী-ধর্ম্মে, নারী-সম্মানে কোন আঘাত না লাগে।"

প্রভাবতী ভক্তিভরে প্রণত হইয়া, দেবীর সম্মুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। তৎপরে মৃদুগম্ভীর-স্বরে—নিম্নলিখিত স্তোত্রটী পাঠ করিতে লাগিল।

করালবদনা কালী, কামিনী কমলাকলা।
ক্রিয়াবতী বিশালাক্ষী, কামাখ্যা কামসুন্দরী।

কপালা চ করালা চ কালী কাত্যায়নী তারা,
কঙ্কালা, কালদমনা, করুণা কমলার্চ্চিতা,
কাদম্বরী কালহরা, কৌতুকী কারণ-প্রিয়া।
কৃষ্ণা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণ-পূজিতা কৃষ্ণবল্লভা।
কুমারী পূজনরতা, কুমারীগণ-সেবিতা
কুলীনা কুলধর্ম্মজ্ঞা, কুলভীতি বিমর্দ্দিনী।
মুণ্ডমালা মহাতন্ত্রং মহামন্ত্রস্থ সাধনে,
ভক্ত্যা ভগবতী দুর্গাং, দুঃখদারিদ্র্যনাশিনাম্।
বিনা তন্ত্রাদ্ বিনা মন্ত্রাদ্ বিনা-যন্ত্রান্মহেশ্বরী,
ন চ ভক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ জায়তে বরবর্ণিনী।
ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপানাপি ভবিতা,
নিরালম্বো লম্বোদর-জননী কং যাহি শরণম্॥

দেবী, যেন সেই অভাগিনী বঙ্গবালার মনের দুঃখ বুঝিলেন। মহাশক্তির হৃদয়, ভয়চকিতা কুমারীর দুঃখে বিগলিত হইল। দৈবশক্তির প্রেরণায়, প্রভাবতীর হৃদয় তেজোময় হইয়া পড়িল। ভয়, সঙ্কোচ, আশঙ্কা, সবই যেন তাহার কোমল প্রাণ হইতে শরতের মেঘের মত সহসা অপসৃত হইল। প্রভার নলিননেত্রদ্বয় দিয়া ভক্তিময় অশ্রু-প্রবাহ ছুটিল। সেই আরক্তিম গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া, সে উষ্ণাশ্রু হর্ম্ম্যতলে পড়িল।

প্রভাবতী কালী প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—মা যেন তখন হসন্মুখী, স্ফুরিতাধরা। সেই ভ্রূকুটিভঙ্গিময়, নেত্রত্রয় যেন অমল স্নেহধারা-পরিপ্লুত। সেই সুস্মিত বদনকান্তি, যেন [illegible]

অতি প্রসন্ন। মায়ের গলদেশবিলম্বী মুণ্ডমালা-হার, যেন পদ্মহারে পরিণত হইয়াছে। বরাভয়প্রদ করপদ্ম, যেন তাহার দিকেই প্রসারিত। মা যেন হস্তেঙ্গিতে বলিতেছেন—"ভয় কি প্রভা! কুমারি তুই, শক্তির অংশ তুই, আমার সেবিকা তুই! কার সাধ্য তোর সতীধর্ম্মের অবমাননা করে? তোর অভীষ্ট নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।"

প্রভাবতী প্রসন্নমুখে, ভক্তিপূর্ণ প্রাণে, মহামায়ার চরণোপান্তে পুনরায় অবনত হইল। সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া কোমল-কণ্ঠে বলিল,—

"নমামি সর্ব্বমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী, নারায়ণী নমস্তু তে"।

সেই দেব-মন্দির প্রকোষ্ঠ প্রতিধ্বনিত করিয়া রব উঠিল—

"নমামি সর্ব্বমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে"

প্রভাবতী প্রণাম করিয়া উঠিয়াই দেখিল, তাহার স্নেহময় পিতা, মন্দিরমধ্যে উপস্থিত।

কিরণরায় সস্নেহে কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—আজই দিন ভাল। সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী। যাত্রা অতি শুভ। রাজমহল পৌঁছিতে, পথে আমাদের পনর দিন সময় লাগিবে। তুমি প্রস্তুত হও মা।"

প্রভা, পিতৃচরণে অবনত হইয়া বলিল—"বাবা! অই দেখ—জগন্মাতা আমাকে প্রসন্নমুখে রাজমহলে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। ঐ দেখ মা এখনও হসন্মুখী।"

পিতা ও কন্যা উভয়েই মহাকালীকে প্রণাম করিলেন, পরে ধীরে ধীরে মন্দিরের বাহিরে আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজমহলের ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যস্থ অন্তঃপুর-সংলগ্ন প্রাঙ্গণটী আজ নূতন-বেশে সুসজ্জিত হইয়াছে। সদর তোরণ হইতে এই প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত, দুই ধারে লাল মখমল-মণ্ডিত কানাত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কানাতের মধ্যনিবিষ্ট দণ্ডসমূহের উপর, উভয়দিকেই এক একটী নিশান, এবং প্রত্যেক নিশানের শিরোদেশ পুষ্পমাল্যে ভূষিত। কানাতের শেষে একটী ক্ষুদ্র দ্বার—এই দ্বারের পরই আর একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। প্রবেশ-দ্বারের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্রধারিণী তাতারীগণ শাণিত ও মুক্ত অসি-হস্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।

সেই স্বল্পবিস্তৃত ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের শোভা আরও মনোরম। মধ্যে মধ্যে প্রস্তরময় কৃত্রিম বেদীসমূহ প্রস্তুত করা হইয়াছে। বেদীগুলি নাগকেশর, চম্পক, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পগুচ্ছে আবৃত। মধ্যে মধ্যে লতা-পুষ্পময় সুরভিত মঞ্জু-কুঞ্জ-কুটীর। তাহাতে হীরামন, পাপিয়া, ভীমরাজ, বুলবুল প্রভৃতি স্বর্ণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া মনের আনন্দে তান ছাড়িতেছে। কোন স্থানে দশজন অন্তঃপুরচারিণী একত্র হইয়া একটী বিচিত্র চন্দ্রাতপের নীচে বসিয়া—একতানে সারঙ্গ, বীণ্, সেতার, জলতরঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র লইয়া করতালীর সুমধুর তালে মোহনীয় সুরের উচ্ছ্বাস তুলিতেছে।

খোস্‌রোজের মেলা, রূপের হাট—সৌন্দর্য্যের বাজার! সুজার অন্তঃপুরচারিণী এবং সম্ভ্রান্ত মুসলমান ওমরাহ্‌-পত্নী ও দুহিতাগণে প্রাঙ্গণ প্রায় অর্দ্ধেক পরিপূর্ণ। বাঙ্গালী সম্ভ্রান্তগণের পরিবারদের মধ্যেও অনেকে আসিয়া দেখা দিয়াছেন। অসংখ্য সুন্দরীর সমাগমে

প্রাঙ্গণ যেন অপূর্ব্ব রূপজ্যোতিতে আলোকিত। বোধ হয়, যেন সৌন্দর্য্য-দেবী স্বশরীরে সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়া, সেই উৎসব-মণ্ডপের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

কে কাহাকে দেখে, তাহার স্থিরতা নাই। সকলেই নিজ নিজ পণ্য-দ্রব্য ও সময়োচিত আলাপ-পরিচয় লইয়া ব্যস্ত। যাহারা এ ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় আদব-কায়দা জানে না, তাহারা অপরের দেখিয়া রাজান্তঃপুর-সুলভ আদব-কায়দার অনুকরণ করিতেছে।

এই বিশাল জনতার মধ্যে, দুইটি সুন্দরী, প্রাঙ্গণ-পার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র লতাকুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়াইয়া, মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছিল।

ইহাদের মধ্যে একজন বলিতেছে—"সই! তুমি মুসলমানী ও আমি হিন্দু হইলেও এখন আর তোমায় আমায় কোন প্রভেদ নাই। আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ঘরে জন্মিয়া, সাহজাদার উপভোগ্যা হইয়াছি। এখন আমাদের দুইজনের অদৃষ্ট, সমসূত্রে আবদ্ধ। তুমি আমার হিতকামনা না করিলে কে আর করিবে? তুমি হয় ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, এই উৎসবে আমি আমোদ করিতে আসি নাই—প্রতিহিংসা লইতে আসিয়াছি! যুবরাজ আজ এই উৎসবে অমৃতের ভাগ লইবেন, আমি ইচ্ছা করিয়া গরলের অংশ গ্রহণ করিব। আমি যাহা বলি, তাহা তোমাকে করিতেই হইবে।"

অপরা উত্তর করিল—"দেখ বিবি! তুমি যা করিতে বলিবে, তাহাতেই আমি প্রস্তুত। কিন্তু তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বের কোন কথা আমার কাছে গোপন করিলে চলিবে না। একটী বিষয়ে যখন বিশ্বাস করিতেছ—তখন সকল বিষয়েই বিশ্বাস করা চাই। বল দেখি, আজ কি করিলে তোমার উপকার করা হইবে?"

প্রথমা উত্তর করিল—"ভগিনি! তবে শোন। হৃদয়ের জ্বালাময়

কথা, যাহা উষ্ণ ধাতুস্রাবের ন্যায় এ হৃদয়মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি, তাহার উচ্ছ্বাস দেখ! তুমি বোধ হয় জান, আমি পিতৃহীনা হইয়া নিরাশ্রয়া হওয়াতেই—আমার এই দুর্দ্দশা! কিন্তু আমার পিতার মৃত্যুর প্রধান উপলক্ষ্য কে—তাহার নাম শুনিবে? সে পাপিষ্ঠ জমীদার কিরণরায়!! আমাদের না ছিল কি? সুখ, ঐশ্বর্য্য, সবই ছিল, কিন্তু কিরণরায় তাহাতে আগুন ধরাইয়া গিয়াছে।"

"কিরণরায় এখন যে বিশাল জমীদারী অর্জ্জন করিয়াছে, দশজনের একজন হইয়াছে, সে জমীদারী তাহার জ্যেষ্ঠ কুমুদরায়ের অর্জ্জিত। দুরাত্মা ভীষণ ষড়যন্ত্রদ্বারা তাহার মৃত জ্যেষ্ঠের সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করে। আমার পিতা, তাহার জ্যেষ্ঠ কুমুদরায়ের বাল্যসখা। বন্ধুত্বের অনুরোধে, তিনি কিরণরায়ের দুষ্ট সংকল্পের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া, আমার পিতার উপর কিরণরায় জাত-ক্রোধ হইয়া উঠে। নানা কৌশলজাল বিস্তারে, সে আমাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া, পিতাকে পথের ভিখারি করে। শেষ আমার এক বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর, সতীত্ব নাশ করায়। আমি অকালে পিতামাতাকে হারাইয়া দারুণ মনস্তাপে পথের ভিখারিণী হইলাম—যৌবন-পণে, বঙ্গেশ্বর সাহ-সুজার নিকট আত্মবিক্রয় করিলাম। মনে করিয়াছিলাম, পিতার মৃত্যুশয্যায় যে ভীষণ প্রতিশোধের শপথ করিয়াছি, তাহা যুবরাজের সহায়তায় একদিন কোন না কোন উপায়ে পালিত হইবে। আজ সেই দীর্ঘ প্রত্যাশিত দিন উপস্থিত।"

"বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়া, কিরণরায়ের কন্যা প্রভাবতীর একখানি প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিরণরায়ের কন্যা, পরম রূপবতী। সে রূপ দেখিলে মুনির মন টলে, তা সাহ-সুজা ত ছার! যে রূপের জন্য আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সেই রূপের জন্য প্রভারও

সর্ব্বনাশ হইতে পারে এই ভাবিয়া—আমি এত দিন উপযুক্ত সুযোগাপেক্ষা করিতেছিলাম।”

“সে সুযোগ এতদিন পরে উপস্থিত হইয়াছে। মা কপালিনীর করুণায়, আমার আশা সিদ্ধ হইয়াছে। যুবরাজের মনে প্রভার চিত্র দেখিয়া ঘোর বিপ্লব উপস্থিত!”

“দৈবের ব্যাপার শোন। যুবরাজ আর একবার বহুদিন পূর্ব্বে ঘটনাবশে এই কিরণরায়ের সুন্দরী কন্যা প্রভাবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ঢাকার প্রাসাদে আটক করিয়াছিলেন, তাহার পিতাকে নজরবন্দী করিয়াছিলেন; কিন্তু সেবার কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই। এবার এক বাণে দুই পাখী মরিবে। আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি এবং যুবরাজেরও রূপতৃষ্ণা নিবারণ হইবে। এখন সব কথা বুঝিলে ত? আমি এই উপলক্ষে কিরণরায়ের কন্যার উপর প্রতিশোধ লইব। এই জন্য যুবরাজকে ইতিপূর্ব্বে আমি তাহার বাল্য-সখী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়াছি। আর কিরণরায়ের কন্যাকে হস্তগত করা যে তাঁহার পক্ষে অতি সহজ, তাহাও বুঝাইতে পারিয়াছি।”

যে একমনে এই সব অদ্ভুত কাহিনী শুনিতেছিল, সে বলিল,—“কি করিতে হইবে শীঘ্র বল। অই দেখ, প্রাঙ্গণ-পথ ক্রমশঃ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। জনাব এখনই বাহির হইবেন। তুমি যাহা করিতে বলিবে, তাহাতেই আমি প্রস্তুত।”

অপরা বলিল—“কিরণরায়ের কন্যা প্রভাবতী এ উৎসবে আসিয়াছে। আমি স্বচক্ষে তাহাকে দেখিয়াছি। কি তার রূপের জ্যোতি! কি তার রূপের দর্প! সে দর্প আজ চূর্ণ হইবে। নানা কারণে আমি কিরণরায়ের কন্যা প্রভাবতীর সম্মুখে যাইব না। তুমি উৎসবের গোলমালের মধ্যে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, তাহাকে যে কোন কৌশলে

পার, অথচ তাহার মনে সন্দেহ না হয় এরূপ ভাবে, উত্তরদিকের গলিপথের বিশ্রামগৃহে লইয়া যাইবে। তাহার পর যাহা করিতে হয়, আমিই করিব।”

পাঠক! ইহাদের চিনিয়াছেন কি? কিরণরায় কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা, এই নিগৃহীতা রমণীই, আপনাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা রঘুদেবের কন্যা, রত্নময়ী, আর সাহসুজার আদরের প্রণয়িনী রৌশনবেগম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—o—

সূর্য্যতেজ ক্রমশঃ অনলকণা-বিহীন হইয়া আসিল। তখনও দুই ঘণ্টা বেলা আছে, এমন সময়ে নহবতধ্বনি হইল। একটা রব উঠিল, বাদসাহ-পুত্র সাহসুজা উৎসবক্ষেত্রে আসিতেছেন। প্রাঙ্গণ-বক্ষে সমুত্থিত সেই অস্ফুট কোলাহল, মুহূর্ত্তের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

যুবরাজ অন্তঃপুর হইতে রূপসীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া বাহিরের প্রাঙ্গণে আসিলেন। সঙ্গে তাঁহার প্রধানা বেগম পেয়ারউন্নিসা বা পেয়ারেবানু। পশ্চাতে দুইজন বাঁদি। যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী পেয়ারেবানু বেগম, প্রফুল্ল মুখে প্রত্যেক বেদিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, প্রচুর স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বাদসাহী-প্রথা মত ক্রয়কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ক্রয়-বিক্রয় শেষ হইলে, তাঁহারা বিক্রয়িত্রীর পরিচয় গ্রহণ করিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদনে, সেস্থান ত্যাগ করিয়া অপর স্থলে গমন করিতে লাগিলেন।

যাহাদের শিল্পজাত ক্রয়-বিক্রয় হইয়া গেল, তাহাদের সকলেই

একে একে চলিয়া গেল। অবশেষে কিরণরায়ের কন্যা প্রভাবতী যেখানে ছিলেন—রাজ-দম্পতি তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

সম্রাট্‌-পুত্রকে সহসা সম্মুখীন হইতে দেখিয়া, প্রভা—লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কুচিতা হইল। তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

প্রভা দেখিল, যুবরাজ একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার অনিন্দ্য-রূপরাশি, নির্ণিমেষ-লোচনে দেখিতেছেন। কি ধৃষ্টতা! প্রভাবতীর স্বাভাবিক আরক্তিম গণ্ডস্থল আরও লোহিত-রাগ-রঞ্জিত হইল। পেয়ারেবানু বেগম, সহসা সে স্থান হইতে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। সেখানে রহিল, কেবল প্রভাবতী আর বঙ্গেশ্বর সাহ সুজা। আর একটী স্ত্রীলোক, দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের লক্ষ্য করিতেছিল।

সাহ সুজা প্রভাকে চিনিতে পারিয়াও মনোভাব গোপন করিলেন। শিষ্টতাময় কোমলস্বরে বলিলেন—"সুন্দরি! তোমার পরিচয় জানিতে সৌভাগ্যবান্ হইব কি?"

সহসা সম্রাট্‌-পুত্রকে সম্মুখীন হইয়া এরূপভাবে প্রশ্ন করিতে দেখিয়া, প্রভাবতীর স্বভাবারক্ত গণ্ডযুগল আরও লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু সম্রাট্‌পুত্রের, বঙ্গের ভাগ্যবিধাতার—প্রশ্নের উত্তর না দিলেও তাঁহার অমর্য্যাদা করা হয়, ইহা ভাবিয়া প্রভাবতী সসম্ভ্রমে লজ্জা-বিজড়িত-কণ্ঠে, নম্রভাবে উত্তর করিলেন,—জাঁহাপনা! এ আশ্রিতার নাম প্রভাবতী। আমি বীরভূমির জমীদার কিরণরায়ের কন্যা।"

প্রভার রূপপ্রভা, সুজার শরীরের প্রত্যেক ধমনীতে, শিরায় শিরায়, বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটাইল। তাঁহার মুখমণ্ডলে, পাশবিক প্রবৃত্তি

জাগিয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ের সৎ-বৃত্তিগুলি সেই মোহনীয় সৌন্দর্য্যের শক্তিবলে শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি একটু হাস্য করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। এ হাসির অর্থ—"সরলা হরিণী ফাঁদে পড়িয়াছে। আশা অর্দ্ধেক সফলিত।" এত সহজে যে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, যুবরাজ তাহা আদৌ ভাবেন নাই।

সাহ-সুজা চলিয়া গেলে, প্রভাবতী নিজের দাসীকে শিবিকার অনুসন্ধানে পাঠাইয়া, মনে মনে ভাবিল—"হায়! কি করিলাম! কেন প্রগল্‌ভার মত সাহজাদার সহিত কথা কহিলাম? তিনি আমাকে কতই না নির্লজ্জ মনে করিলেন। তৎপরে দাসীর ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, উৎকণ্ঠিতা-চিত্তে সে নিজেই পাল্কীর অনুসন্ধানে গেল। ইহাতেই তাহার সর্ব্বনাশের পথ সূচিত হইল।

কর্ম্মফল—কি সূত্রে যে মানবভাগ্যে সুখদুঃখ আনয়ন করে, তাহা অবোধ মানব আগে জানিতে পারে না। মানব ত অতি ছার, স্বয়ং ভগবানও, কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, ইহার অজানিত চক্রমধ্যে পতিত হইয়া, নররূপে বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। তাহার তুলনায় প্রভা যে অতি ক্ষুদ্র! এই জন্যই কর্ম্মফল-চালিত হইয়া, সে এক নূতন বিপদের মুখে পড়িল।

প্রাঙ্গণের পার্শ্বে একটী স্থিরসলিলা সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা ও তাহার পাড়ের উপর, চতুর্দ্দিকব্যাপী লোহিতকঙ্করময় পথের উপর, পাঁচ সাত খানি রৌপ্যমণ্ডিত কিংখাপাচ্ছাদিত শিবিকা দেখা যাইতেছিল। দাসী হয় ত সেই দিকে গিয়াছে ভাবিয়া, প্রভা ধীরে ধীরে সেই বাপীতটে উপস্থিত হইল।

মধ্যপথে, একটী ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে কুর্ণীস করিয়া বিনীতভাবে বলিল—"আমি বঙ্গেশ্বর-মহিষী পেয়ারেবানুর

বেগম সাহেবের বাঁদী। বিবি! আপনি কি বেগম-সাহেবের সহিত দেখা করিবেন? তাঁহার আদেশ আছে, আজ সকল সম্ভ্রান্ত রমণীই, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।"

প্রভা উত্তর করিলেন,—"না—আমি বাটী চলিয়া যাইব, আমার দাসীকে শিবিকা আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, তাহাকেই খুঁজিতেছি। বেগমের সহিত সাক্ষাতের কোন প্রয়োজনই নাই। সে যে কোন্ দিকে গেল, স্থির করিতে পারিতেছি না।"

সেই বাঁদী বলিল—"ওখানে যে সব পাল্কী দেখিতেছেন, উহা মুসলমান ওমরাহ-পত্নীদের। তাঁহাদের সকলই প্রধানা বেগমের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। আপনি যদি বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন—তবে আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনার পাল্কী খুঁজিয়া দিতেছি।"

প্রভা নিজের দাসীর উপর একটু রাগ করিয়া, সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। স্ত্রীলোকটী তাহাকে একটী গলিপথে লইয়া গিয়া বলিল,—"আপনি ততক্ষণ এই গৃহমধ্যে বিশ্রাম করুন, আমি পাল্কী আনিতে চলিলাম। যদি দাসী বলিয়া ঘৃণা না করেন, তবে কক্ষমধ্যে আসিয়া বসুন।"

মুগ্ধস্বভাবা প্রভা, সেই বাঁদীর যত্নে ও মৌখিক শিষ্টাচারে ভুলিয়া, সানন্দিতচিত্তে তাহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাহির হইতে সেই কক্ষের দ্বার আবদ্ধ হইয়া গেল। হতভাগিনী প্রভাবতী, বংশীনাদ-বিমুগ্ধা হরিণীর ন্যায় ব্যাধের ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। সে অনেক টানাটানি করিল, কিছুতেই দ্বার খুলিল না। প্রভা নূতন বিপদাশঙ্কায়, অগত্যা সেই কক্ষমধ্যে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

সে কক্ষ প্রকৃতপক্ষে সেই বাঁদির কক্ষ নহে। তখনও বাতায়ন-পথে অস্তগামী সূর্য্যের অতি মলিন কিরণমালা প্রবেশ করিতেছিল। সেই স্বল্পালোকে বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে প্রভা দেখিল—কক্ষটী আদ্যোপান্ত রাজোচিত সজ্জায় পরিশোভিত।

অবস্থা দেখিয়া প্রভা মনে মনে বুঝিল—সে কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধা হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

সুজা উৎসব-ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া, নিজের "হাওয়া-মহলে" সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে রত্নময়ী, ওরফে রৌশন বিবি আসিয়া সংবাদ দিল,—"জাঁহাপনা! পক্ষিণী পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে। আপনার শয়ন-গৃহের পার্শ্বে তাহাকে কৌশলে আটক করিয়া রাখিয়াছি।"

সুজা, এই শুভ সংবাদ শুনিয়া আনন্দিতচিত্তে দ্রুতপদে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। বহুদিন পরে আজ তাঁহার প্রাণের একটা প্রধান অতৃপ্ত বাসনাতৃপ্তির মহা সুযোগ ঘটিয়াছে।

আর হতভাগিনী প্রভা? সে অশ্রুজলে সেই মখমল-মণ্ডিত হর্ম্ম্যতল ভাসাইয়া দিতেছে! সে ভাবিতেছে—"হায়! কেনই বা দুঃসাহসে ভর করিয়া পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আসিলাম? জানি না এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে আরও কি আছে? নিশ্চয়ই এ সাহজাদার চক্র!

এ প্রাণ থাকিতে সে আমার উপর কখনই অত্যাচার করিতে পারিবে না। আমার যে দুইটী অমোঘ অস্ত্র আছে, তাহার একটীও কি কাজে আসিবে না? মা বিপদবারিণী ভবানি! হৃদয়ে সাহস দাও, প্রাণে বল দাও মা! যেন এ মহা-পরীক্ষায় নিরাপদে উত্তীর্ণ হইতে পারি। আদ্যাসতি! সতীকুলরাণি! সতীর সতীত্ব রক্ষায় সহায় হও মা। তাহা না হইলে, তোমার শক্তিময়ী নামে যে কলঙ্ক হইবে মা?"

সহসা কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল। কক্ষের অপর পার্শ্বে আর একটী ক্ষুদ্র দ্বার। সাহজাদা সাহ-সুজা, বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার মালিক, সেই দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সুজা, সেরাজি পান করিয়াছেন। তাঁহার নীলোৎপল-নিন্দিত চক্ষুর্দ্বয় সরাপের উত্তেজনায়, লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সেই চিরসুন্দর মুখে, ঘোর পাশব-প্রবৃত্তির ছায়া জাগিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়মধ্যে কলুষিত সম্ভোগবাসনা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি টলিতে টলিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"সুন্দরি! বরাননি! বঙ্গেশ্বর সাহ-সুজা, নিজে তোমাকে সম্মান দেখাইতে আসিয়াছেন—তোমার ঐ রাঙ্গাচরণতলে বিক্রীত হইতে আসিয়াছেন। ভারত-সম্রাটের পুত্র, হিন্দুস্থানের ভাবী অধিকারী, সাহ-সুজা তোমার নিকট প্রণয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। সুন্দরি! দাসের প্রতি প্রসন্না হও।"

দৃপ্তা সিংহীর ন্যায়, প্রভা একবার বঙ্গাধিপের কামনা-লোলুপ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; এবং তৎপরক্ষণেই তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখকমল ভয়ে আরও মলিনভাব ধারণ করিল। তাহার হৃদয়ের মধ্য দিয়া, একটী বিদ্যুৎস্রোত বহিল। মৌনা, সঙ্কুচিতা, লজ্জাবতী লতার মত, অদূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া অবনতমুখে সে স্থিরভাবে উত্তর করিল—"জাঁহাপনা! অধিনী ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম। আপনি রক্ষাকর্ত্তা

হইয়া নিজে এ প্রকার অত্যাচার করিলে আশ্রিতাদের উপায় কি? এ মাতৃহীনা হতভাগিনী রমণীর উপর অত্যাচার করিলে, তাহাকে কলুষিতভাবে সম্বোধন করিলে, আপনার উজ্জ্বল বংশ-গরিমায়, কলঙ্ক স্পর্শিবে। আমি আপনার নিমন্ত্রিতা অতিথি। অপরে আমার উপর কোনও অত্যাচার করিলে, রক্ষার ভার আপনার। ছিঃ! জাঁহাপনা— সামান্য একটা মোহের উত্তেজনায়, নীচতার কলঙ্ক কিনিবেন না। আমায় ছাড়িয়া দিন্—আপনার উদারতা কীর্ত্তন করিতে করিতে এ স্থান হইতে চলিয়া যাই।”

সুজা দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, ত্বরিতবেগে প্রভার নিকটে আসিলেন। প্রভাও মুহূর্ত্তমধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিয়া দূরে দাঁড়াইল। সুজা কোমল-স্বরে বলিলেন,—“সুন্দরি! বিরাগ প্রকাশ করিও না। আমার রঙ্গমহল অসংখ্য সুরূপা সুন্দরীতে পরিপূর্ণ—কিন্তু তোমার মত ত একটীও নাই! বঙ্গরমণী যে এতদূর অপরিমেয় সৌন্দর্য্যশালিনী হইতে পারে—এ ধারণা ত আমার আগে ছিল না। তোমায় দেখিয়া অবধি, আমার চিত্ত বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। তোমার পিতাকে সেবারে বাকী-খাজনার দায়ে ও দাঙ্গার জন্য যখন আবদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কেবল তোমার মুখ চাহিয়া তাঁহাকে আমি পীড়ন করি নাই। তোমার ঐ নিষ্কলঙ্ক মুখচ্ছবি, আমার প্রাণে একটা গভীর দাগ কাটিয়া দিয়াছে। ছার ঐ বাঙ্গালার মসনদ! আমি তোমায় পাইলে সব ত্যাগ করিতে পারি। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—যদি কখনও দিল্লীর সিংহাসন আমার হয়, আমি তোমাকে রাজ্যেশ্বরী করিব। সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। তুমি চিরদিন এ হৃদয়ে পূজনীয়া দেবীর ন্যায় আসন অধিকার করিয়া থাকিবে। খোদা কৃপা করিলে এই বিশাল হিন্দুস্থান, একদিন হয়ত তোমার পদতলে নত হইবে।

সাহ-সুজা কখনও উপযাচক হইয়া কাহারও কাছে প্রেমভিক্ষা করেন নাই, তুমিই কেবল সেই বিষয়ে সৌভাগ্যবতী হইয়াছ।”

“না—না—যুবরাজ! আমি এ সৌভাগ্য চাহি না। সমগ্র হিন্দুস্থান অপেক্ষা, পর্ণকুটীর আমার পবিত্র সাম্রাজ্য। যুবরাজ! একবার আপনার প্রপিতামহ, সেই প্রতাপশালী আকবর-সাহের মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সেই গৌরবান্বিত আকবর-সাহের পবিত্র নাম ও কীর্ত্তির অনুরোধে, আমায় ছাড়িয়া দিয়া হৃদয়ের উদারতা দেখান।”

“দেখিতেছি শুধু কথায় হইবে না, দেখিতেছি, তুমি বড়ই অবোধ। ইচ্ছা করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ সুখ-সৌভাগ্য পদদলিত করিও না। যাহা বলি শোন—সহজে না শুনিলে, বলপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।”

প্রভাবতী একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তাহা হইলে এক নিরীহা নিঃসহায়া কুমারীর প্রতি বলপ্রয়োগে, মোগল-রাজবংশের গৌরব বাড়িবে বই কমিবে না! ছিঃ! ছিঃ! জনাব! আপনি এতই বিকল-চিত্ত? এতই অন্তঃসারশূন্য!—”

এ তিরস্কারবাণী নিষ্ফল হইল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া, সাহ-সুজা ক্ষিপ্রগতিতে প্রভাবতীর হাত ধরিয়া ফেলিলেন। প্রভার প্রত্যেক লোমকূপ হইতে প্রবলবেগে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে লাগিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, তথাপি সে সাহস সঞ্চয় করিয়া সবলে হস্ত ছাড়াইয়া লইল। সুজা আবার ধরিতে গেলেন—প্রভা দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

ব্যাঘ্র যেমন শীকারের উপর লম্ফ দিবার পূর্ব্বে, তাহার প্রতি স্থিরলক্ষ্যে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে, তখন সুজার অবস্থাও তদ্রূপ।

পাছে প্রভা উন্মুক্ত দ্বারপথে বাহির হইয়া যায়, এই ভয়ে সেই সৌন্দর্য্য-লোলুপ সাহ-সুজা, দ্বারটী আগে বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রভাবতী আরও নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন।

সুজা তীব্র বিদ্রূপমিশ্রিতস্বরে বলিলেন—"সুন্দরি! খোস্‌রোজের এই উৎসবের আয়োজন কেবল তোমার ন্যায় সুন্দরী পক্ষিণীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিবার জন্য। আমি তোমার রূপ দেখিয়া বড়ই মোহিত হইয়াছি। জীবনে কখনও কাহাকে এরূপ ভাবে উপাসনা করি নাই। তুমিই আমার হৃদয়ের আরাধ্য-দেবী। এই লও—আমার রত্নখচিত মুকুট, তোমার সুকোমল রক্তরাগ-পরিলাঞ্ছিত চরণতলে অর্পণ করিলাম! হিন্দুস্থানের ভাবী বাদসাহ তোমার পায়ে ধরিতেছেন, তুমি তাঁহার প্রতি প্রসন্না হও।" এই বলিয়া সাহ-সুজা পুনরায় সেই সুন্দরী কিশোরীর গাত্র স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রভার নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিজ্বালা ফুটিয়া উঠিল। মা—ভবানী তাহার দুর্ব্বল শরীরে যেন তীব্র বিদ্যুৎস্রোত সঞ্চারিত করিলেন। মরাল-গ্রীবা উন্নত করিয়া, ক্রুদ্ধস্বরে প্রভা বলিল—"সাবধান! শয়তান, গাত্র স্পর্শ করিয়া এ দেহ কলঙ্কিত করিও না। আমায় ছাড়িয়া দাও—আমি তোমা অপেক্ষা তোমার মহত্ত্বকে চিরদিন পূজা করিব।"

প্রভার কথাগুলি, সেই নির্জ্জনকক্ষে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। সুজা আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না—তিনি দ্বারের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, পুনরায় প্রভাকে আলিঙ্গন-নিপীড়িত করিতে ধাবিত হইলেন।

প্রভা অগত্যা নিরুপায় হইয়া, ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল—"যুবরাজ! এখনও বলিতেছি—সাবধান! নচেৎ তোমার সম্বন্ধে কোন অশুভকর কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব। সে কথা

প্রকাশ হইলে নিশ্চয় জানিও, তুমি পথের ভিখারীরও অধম হইয়া পড়িবে। হয়তঃ বৃদ্ধ-সম্রাটের জল্লাদের হস্তে, তোমার ঐ মুকুট-শোভিত মস্তক ধরাশায়ী হইবে। সতীর সতীত্বনাশ চেষ্টার পাপের ফলে, চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। সে আগুনে তোমার ভবিষ্যৎ সুখাশা ভস্মীভূত হইবে।"

সুজা বলিলেন—"সুন্দরি! এমন কি কথা—যাহাতে আমি তোমার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়িব? ভারত-সম্রাটের পুত্র জীবনে এমন কোন কার্য্য করেন নাই, যাহাতে এক অপরিচিতা বাঙ্গালী যুবতী, তাঁহাকে এরূপভাবে ভয়-প্রদর্শন করিতে সাহসী হয়!" সুজা পুনরায় টলিতে টলিতে, মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, প্রভার দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রভা দ্বারের দিকে সরিয়া গিয়া, বিদ্রূপসূচক হাস্য করিয়া বলিল—"যুবরাজ! সাবধান! মণ্ডয়াজী খাঁর সহিত চক্রান্তের ব্যাপারটা প্রকাশ করিয়া দিলে, বোধ হয় আপনার কোনই ইষ্টানিষ্ট নাই?"

সহসা আশীবিষ-দষ্ট হইলে, আহতব্যক্তি যেরূপ কাতর হইয়া পড়ে, এই কথা শুনিয়া সুজাও সেইরূপ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ যেন শবের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। তাঁহার দেহযষ্টি থরথরি কাঁপিতে লাগিল। মণ্ডয়াজী খাঁর নাম সুজার কাণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ-বীর্য্য ভুজঙ্গবৎ নিস্তব্ধ হইয়া একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

প্রভা দেখিল—ঔষধ ধরিয়াছে। ধীরে ধীরে বলিল—"ঘটনা-ক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া, দাসী যদি ভারতেশ্বরের পুত্রের প্রতি কোনরূপ অসম্মানসূচক ব্যবহার করিয়া থাকে, তজ্জন্য সে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। যুবরাজ! আপনার সম্মুখের ঐ দ্বার খুলিয়া দিন, আমার

বাহিরের পথ দেখাইয়া দিন—আমি পিতার কোলে গিয়া আপনার এরূপ নীচ অত্যাচারের কথা ভুলিয়া যাই। আমি দেবতার নামে শপথ করিতেছি, আমার দ্বারা মওয়াজি খাঁর কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হইবে না। যুবরাজ! আরও শুনুন—মওয়াজি খাঁর সহিত চক্রান্ত করিয়া বাদসাহকে বিষ প্রয়োগজন্য আপনি দিল্লীতে যে গোপনীয় পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও আমার কাছে আছে। এই দেখুন—তাহার প্রতিলিপি।”

সুজা পত্রখানি গ্রহণ করিয়া, তাহার আদ্যোপান্ত পড়িলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া, শিশুর ন্যায় শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। আর কোন কিছু না বলিয়া, দেয়াল ধরিয়া নিকটস্থ এক আসনের উপর ধীরে ধীরে উপবিষ্ট হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া, সাহজাদা আবার এক নূতন মৎলব আঁটিলেন। তাঁহার মনে যে ভয় হইয়াছিল, ক্রমে তাহা অপসারিত হইল। তিনি কঠোর ঘৃণাসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন, “সুন্দরি! যদিও বা তোমার উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত হইতেছিল, কিন্তু এখন হইতে তাহা চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল। তোমার ধৃষ্টতার ফলে, আজই বৃদ্ধ কিরণরায় অবরুদ্ধ হইয়া রাজমহলের অন্ধতমসাবৃত কারাগার আশ্রয় করিবে। আর তাহাকে পৃথিবীর আলোক দেখিতে হইবে না। তোমার এ বেয়াদবির জন্য সেই নির্জ্জন কারাকক্ষ তাহার হৃদয়ের শোণিতে আর্দ্র হইবে। এ দুনিয়ায় যাহারা সম্রাট্-পুত্রের বাসনার পথে অন্তরায় হয়, তাহাদের এই দশাই হইয়া থাকে।” এই কথা বলিতে বলিতে তিনি পুনরায় প্রভাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সবেগে তাহার নিকটস্থ হইলেন।

“তবে দেখ্ কাপুরুষ! হিন্দুরমণী কিরূপে আপনার সতীত্ব-গৌরব

অক্ষুণ্ণ রাখে, কিরূপে তাহার কুমারী-ধর্ম্ম রক্ষা করে!” এই কথা বলিয়া, প্রভা নিজ বক্ষমধ্যস্থ গুপ্তস্থান হইতে এক সুতীক্ষ্ণ শাণিত ছুরিকা বাহির করিল। দীপালোকে সেই ছুরিকা চক্‌মক্ করিয়া উঠিল এবং সাহ সুজা দ্বারের নিকট ফিরিতে না ফিরিতে, তাহা সবেগে তাঁহার স্কন্ধদেশে বিদ্ধ হইল।

সুলতান ভূতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। রক্তস্রাবে গৃহ ভাসিয়া গেল। প্রচুর শোণিতস্রাবে, তিনি সেই মছলন্দের সুকোমল শয্যার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই সুকোমল শয্যা, তাঁহার দেহোৎসারিত শোণিতে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

* * * *

এই শোচনীয় ঘটনার পর তিন দিন অতীত হইয়াছে। সাহজাদা অন্তঃপুরস্থ এক সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে রুগ্নশয্যায় শায়িত। প্রধানা বেগম পিয়ারিবানু, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন ও তাঁহার ক্ষত-স্থানে প্রলেপ লাগাইয়া দিতেছেন।

সাহসুজা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন। ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমি কোথায়?”

আজ তাঁহার প্রথম চেতনা হইয়াছে। পতিপ্রাণা পিয়ারা, তৎ-ক্ষণাৎ কাতরভাবে বলিলেন,—“যুবরাজ! জাঁহাপনা! কথা কহিবেন না। চিকিৎসকের নিষেধ। ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকুন। পরে সবই শুনিবেন।”

“না—না—আমি এখনই শুনিতে চাই। আমার সকল কথা মনে পড়িতেছে। কোথায় সেই দুরাত্মা কিরণরায়ের পাপিষ্ঠা কন্যা? তাহার পিতার শোণিতে কি এখনও ধরাতল সুলোহিত হয় নাই! ডাকো—পিয়ারে, এখনিই খোজাকে ডাকো। আমি সেই বৃদ্ধের

ছিন্নমস্তক দেখিতে চাই। তাহার সেই শয়তানী কন্যাকে, বাঁদীর বাঁদী করিতে চাই।"

সুজা আর বলিতে পারিলেন না—উত্তেজনাবশে তিনি পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পিয়ারা, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে একটী উত্তেজক ঔষধ দিলেন, তাহাতে আবার চেতনা ফিরিয়া আসিল। সুজা আবার নয়ন উন্মীলন করিলেন। ধীরে ধীরে আবেগভরে বলিলেন—"প্রিয়তমে! প্রভাবতি! তুমি কোথায়? একবার এ হৃদয়ে এস। এ দগ্ধ হৃদয়ের যাতনা লাঘব করিয়া দাও। না—না প্রভা! তুই পিশাচী! তুই শয়তানী!!"

পিয়ারীবানু, সম্রাট্‌পুত্রের কুঞ্চিত কেশগুলি তাঁহার চম্পকাঙ্গুলি দ্বারা প্রসারিত করিয়া দিয়া, ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন "যুবরাজ! সে সত্যসত্যই পিশাচী! সে সত্যসত্যই শয়তানী! রোশন-বেগম তাহার পলায়নের সময় পথরোধ করিতে গিয়াছিল, সে তাহাকেও সাংঘাতিক আঘাত করিয়া পলাইয়াছে! যুবরাজ! সে পাষাণীর—সে হতভাগিনীর নাম, আর মুখে আনিবেন না।"

সুজা ধীরে ধীরে নয়ন মুদিত করিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর সজোরে বহিয়া গেল। তারপর তাহা সেই রত্নমণ্ডিত কক্ষের ভিত্তিতে প্রতিহত হইয়া আবার সেই কক্ষমধ্যে ঘুরিতে লাগিল। সাহসুজা কাতরভাবে অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"হায় হায়! আমার আনন্দের উৎসব যে "রুধিরোৎসবে" পরিণত হইল!"

ইহার পর সুজা, বহুকষ্টে আরোগ্যলাভ করিলেন। কিন্তু যতদিন জীবিত ছিলেন, এই "রুধিরোৎসবের" ভীষণ স্মৃতি তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় নাই।

লাল বারদোয়ারী।

লাল বারদোয়ারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে, আজ বিরাট মহোৎসব। "কুমারী-ব্রত" উদ্যাপনাভিলাষিণী, যত রাজপুত বালিকা, প্রাতঃকাল হইতে এই লোক-বিশ্রুত মন্দিরমধ্যে, দলে দলে উপস্থিত হইয়াছে।

দীন, দরিদ্র, সম্ভ্রান্ত-মধ্যবিত্ত, রাজা-প্রজা—সকলেরই কন্যাগণের নিকট, আজ দেব-মন্দিরের দ্বার সমানভাবে উন্মুক্ত। সমাজের ও ঐশ্বর্য্যের পার্থক্য, যেন সকলে আজ দেব-মন্দিরের বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছে।

ফল, ফুল, বিল্বপত্র, অর্ঘ্য, অগুরু ও চন্দনাদিতে রাজপুতের কুলদেবতা একলিঙ্গের মূর্ত্তি সমাচ্ছন্ন। লিঙ্গমূর্ত্তির চারিদিকে, সুবর্ণ-বেষ্টনী—আর তাহার চারিপাশে বসিয়া অনাঘ্রাত মল্লিকাকুসুমসদৃশী, বয়ঃপ্রাপ্তা বালিকা ও কিশোরীগণ, মুখে পবিত্র সরলতা তেজস্বিতা ও মধুরিমা মাখিয়া, একাগ্রচিত্তে একলিঙ্গের উপাসনা করিতেছে।

ব্রতের উদ্দেশ্য—মনোমত পতিলাভ। যাহার ব্রত সমাপ্ত হইতেছে, সে পুরোহিতের দক্ষিণা দিয়া, মন্দির হইতে চলিয়া যাইতেছে। যাহার শিবিকা আছে, সে গিয়া সওয়ার হইতেছে।

যাহার নাই, সে পদব্রজেই চলিয়াছে। যাহারা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, তাহারা মন্দিরের চতুঃপার্শ্বস্থ চত্বরের উপর দরী বিছাইয়া বিশ্রাম করিতেছে।

কোথাও বা পক্ককেশ অশীতিপর বৃদ্ধ চারণদেব, মহোৎসাহে বজ্র-নাদী ভাষায়, রাজপুতের অতীত কীর্ত্তিকাহিনীগুলি গান করিতেছেন। কুমারি ও কিশোরীরা দলবদ্ধ হইয়া তাহাই শুনিতেছে। কোথাও বা কোনও সন্ন্যাসী, জলদনিঃস্বনে ভৈরবকণ্ঠে দেবাদিদেব মহাকালের ভজন গাহিতেছে। আর জনতার একাংশ তাহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া একমনে তাহাই শুনিতেছে।

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল। মধ্যাহ্ন তপন-কিরণ, আরাবল্লীর সমুচ্চ শীর্ষে স্বর্ণ বৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যাহ্ন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই পূজা সাঙ্গ করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিল। কিন্তু একটী রাজপুতকিশোরী, তখনও তন্ময়চিত্তে পূজায় সন্নিবিষ্টমনা।

কিশোরী—পবিত্র শিশোদিয়-বংশীয়া। সে অপূর্ব্ব তেজোময়ী। তাহার মুখে প্রতিভা, দীপ্তি ও সরলতা, একাধারে বিরাজ করিতেছে। তাহার সম্মুখে পুষ্পপাত্র, সুকোমল শুভ্র হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ, চক্ষু স্থির ও মুদিত। সুগ্রথিত মনোহর নাগকেশর-মালা, সেই আলুলায়িত ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাজির উপর দিয়া কমনীয় কম্বুগ্রীবার পশ্চাৎদেশ স্পর্শ করিয়া, পবিত্রোরস দেশে বিলম্বমান। কিশোরী, যেন পাষাণ-রাজ-কন্যা গৌরীর ন্যায়, নিমীলিতনেত্রে ধ্যাননিমগ্না। পূজা সমাপ্ত হইলে, সেই কিশোরী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, করপুটমধ্যস্থ শ্বেত সেফালিগুলি দেবতার চরণে অর্পণ করিল।

মন্দির-রক্ষক এক শৈব-সন্ন্যাসী, স্থিরদৃষ্টিতে এই কিশোরীর পূজা দেখিতেছিলেন। পূজা সাঙ্গ হইল দেখিয়া, তিনি তাহাকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন—"মা! ভোগের সময় হইয়াছে, মন্দিরতল মার্জ্জনা করিয়া দাও।" সেই কিশোরী ভগবান্ মহাকালকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও সন্ন্যাসীর আজ্ঞাপালন করিয়া মন্দির-প্রকোষ্ঠ হইতে মরালগতিতে বাহিরে চলিয়া গেল। সেকালের প্রথা ছিল—ভোগের পূর্ব্বে, পবিত্র বংশোদ্ভূতা কুমারীগণই মন্দিরতল মার্জ্জনা করিতেন।

সেই তন্বঙ্গী কিশোরী, ত্বরিতপদে মন্দিরের সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল—তাহার শিবিকাখানি রহিয়াছে, কিন্তু বাহকেরা তথায় নাই। বাহকেরা শিবিকাধিকারিণীর প্রত্যাগমনে অত্যধিক বিলম্ব দেখিয়া, নিকটস্থ বাজারে জলযোগ করিতে গিয়াছিল। কেবলমাত্র একজন সেই শিবিকার কাছে বসিয়াছিল, বাহকদের ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইবে শুনিয়া, সেই শিশোদিয়া-রমণী ধীর-গতিতে মন্দিরসংলগ্ন স্নিগ্ধছায়াময় পলাশ-কাননে প্রবিষ্ট হইল।

"পলাশ-কানন" একলিঙ্গের মন্দিরসংলগ্ন উদ্যান। উদ্যানে পলাশ বৃক্ষের ভাগ বেশী ছিল বলিয়া, ইহার নাম "পলাশ-কানন" হইয়াছিল। কাননের মধ্যস্থলে, কাকচক্ষু-বিনিন্দিত সুবিমল সলিলরাজিপূর্ণ সুবিস্তৃত সরোবর। সরোবরের চারিদিকে দশটী দেবমন্দির। দেবমন্দির ব্যবধানে, নানাবিধ ফলপুষ্পপরিপূর্ণ বৃক্ষরাজি। বালিকা একে একে সেই সরোবর-পার্শ্বস্থ দেবমন্দিরগুলি দেখিতে লাগিল।

প্রথমটী—গণেশমূর্ত্তি, দ্বিতীয়টী-মকরবাহিনী শ্বেতমর্ম্মরময়ী গঙ্গামূর্ত্তি, তৃতীয়টী মহেশ্বরের সংহারমূর্ত্তি। বালিকা এইগুলিকে দেখিয়া যেমন চতুর্থটীর সম্মুখে আসিবে, অমনি বৃক্ষান্তরাল হইতে এক শ্বেতবস্ত্রা-চ্ছাদিত, শুভ্র উষ্ণীষধারী যুবক, তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথে চলিতে চলিতে সম্মুখে সহসা কৃষ্ণকায় বিষধর দেখিতে পাইলে, পথিক যেরূপ চমকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, সেই নির্জ্জন

কাননমধ্যে, সহসা এক শুভ্রবসনধারী যুবা-পুরুষকে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া, সেই প্রফুল্লমুখী কিশোরী যেন একটু ভয়চকিতা হইয়া উঠিল। সে দৃঢ়স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"দুর্জ্জয়সিংহ! এখানে আসিয়াছ কেন?"

সেই রাজপুত যুবক, স্নেহময়স্বরে বলিল—"অনুস্থয়ে! আসিলাম কেন, জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি যেমন ভাবিতেছ, আমি কেন এখানে—আমিও সেইরূপ ভাবিতেছি, তোমার এই কোমল-হৃদয়ে পুরুষসুলভ এত কাঠিন্য কোথা হইতে আসিল!"

রমণী তিরস্কারপূর্ণ-স্বরে বলিল—"দুর্জ্জয় সিংহ! কুলকন্যার সহিত এ প্রকার স্থলে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ, নিতান্ত নির্দ্দোষ ব্যাপার নয়। তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। লোকে দেখিলে কি মনে করিবে বল দেখি? একলিঙ্গের পবিত্র ক্রীড়া-কানন নিভৃত প্রেমালাপের স্থান নয়।"

এই তীব্রশ্লেষময় তিরস্কারব্যথিত সেই রাজপুত যুবক, কম্পিতস্বরে বলিল—"অনুস্থয়ে! তুমি বড় নিষ্ঠুর! তাহা না হইলে আমায় চলিয়া যাইতে বলিবে কেন? আর কতদিন হৃদয়ে এক দারুণ জ্বালা পোষণ করিয়া অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিব? বহুদিন ধরিয়া তোমায় একবার দেখিবার ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সুযোগই হয় নাই। তোমার সুন্দর মুখখানি একবার দেখিলে, আমার হৃদয় যে আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে! আমি এ জ্বালাময় পৃথিবী ছাড়িয়া স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করি। একবার তোমার মুখের দুটী মিষ্ট কথা শুনিলে, আমি সপ্তমস্বর্গের সুখসম্ভোগ করি। তোমাদের বাটীতে আমার প্রবেশ নিষেধ। আমি সেইজন্য এখানে চোরের মত দেখা করিতে আসিয়াছি। আজ ভগবান একলিঙ্গের কৃপায় যদি সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তবে কেন এ জ্বালাময় হৃদয়ের চিরসঞ্চিত আশা কথঞ্চিৎ পরিপূর্ণ করিব না?"

একথা শুনিয়া, অনুসূয়ার সেই নীলোৎপল-নিন্দিত নেত্রদ্বয় জলিয়া উঠিল। ক্রোধে তাহার গণ্ডদেশের স্বাভাবিক রক্তরাগ আরও পরিবর্দ্ধিত হইল। সে আত্ম-সম্বরণ করিয়া কঠোরস্বরে বলিল,—"দুর্জ্জয়সিংহ! আমি কুলকন্যা, আমার সহিত নির্জ্জনে এরূপ ভাবে স্বাধীনতা লইয়া কথাবার্ত্তা কহা, তোমার সম্পূর্ণ অনুচিত। তুমি পথ ছাড়িয়া দাও—আমি চলিয়া যাই।"

সেই যুবক এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"চলিয়া যাইবে! যাও অনুসূয়ে—যাও। এ দগ্ধহৃদয়কে আরও মরুময় করিয়া দিয়া যাও। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিও—আমি তোমার জন্য কি না সহ্য করিয়াছি? পিতামাতার স্নেহময় আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছি, মাতৃভূমি রাজপুতানা ত্যাগ করিয়াছি, রাঠোরের স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া, মুসলমান বাদসাহের অধীনতা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছি। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া, তরবারি সহায়তায় সামান্য সৈনিকের ব্যবসায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছি। অনুসূয়ে! এতেও কি তোমার দয়া হইবে না? আমি কি চিরকালই নিরাশ-হৃদয়ে এই যন্ত্রণা লইয়া নির্জ্জনে দগ্ধ হইব!"

অনুসূয়া স্থিরভাবে দুর্জ্জয়সিংহের এই মর্ম্মভেদী কথাগুলি শুনিল। তৎপরে দৃঢ়স্বরে বলিল—"দুর্জ্জয়সিংহ! সে সব কথা আলোচনার উপযুক্ত স্থান ইহা নয়। অপর কেহ যদি এই অবস্থায় আমাদের দেখে, কি মনে করিবে বল দেখি?"

দুর্জ্জয়সিংহ এ কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"বলিবে আর কি? সকলে ভাবিবে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহার ভাবী পত্নীর সহিত নির্জ্জনে কথোপকথন করিতেছে।"

এ তীব্র অপমান, কুলগৌরব-দীপ্তা, দর্পিতা অনুসূয়ার সহ্য হইল না।

তাহার শতদল-লাঞ্ছিত-সুন্দর মুখখানি,ক্রোধে আরও রক্তিমভাব ধারণ করিল। সে কঠোরস্বরে বলিল—"রাঠোর-কুলকলঙ্ক! দূর হও তুমি। যখন নিজের স্বার্থের জন্য, ভগিনীকে মোগলের হস্তে সমর্পণ করিয়াছ, তখন এক কুলকন্যাকে নিঃসহায় অবস্থায় পাইয়া কাপুরুষের ন্যায় এরূপে অপমানিত করা তোমার পক্ষে অতি সামান্য কার্য্য। তুমি যদি সহজে এ স্থান হইতে চলিয়া না যাও, তবে চীৎকার করিয়া লোক ডাকিব।"

এই মর্ম্মভেদী ভৎর্সনায়, দুর্জ্জয়ের মুখ, মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় মলিন হইয়া উঠিল। এ দারুণ অপমানে তাহার বদনে ভীষণ ভ্রূকুটি রেখা দেখা দিল। তাহার কঠোর হস্ত, দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইল। সে রূঢ়স্বরে বলিল—"অনুসূয়ে! রাঠোরবীর কখনও নীরবে এরূপ তীব্র অপমান সহ্য করে না। ইহার প্রতিশোধ—যদি স্ত্রীলোক না হইতে, এখনই পাইতে। কিন্তু এ অপমানের প্রতিশোধ একদিন নিজহস্তে লইব। তোমায় যদি মুসলমানের অঙ্কলক্ষ্মী না করিতে পারি, যদি তোমার এই প্রচণ্ড অহঙ্কার চূর্ণ করিতে না পারি, তবে দুর্জ্জয়ের নাম এই দুনিয়া হইতে জন্মের মত অন্তর্হিত হইবে। আজ হইতে আমার অনুরাগ ঘোর বিরাগে পরিবর্ত্তিত হইল। ভালবাসা—প্রতিহিংসার পথে ধাবিত হইল, এ অপমানের, এ ধৃষ্টতার ফল তোমায় শীঘ্র ভোগ করিতে হইবে। তখন বুঝিবে—রাঠোরের প্রতিহিংসা...কতদূর ভয়ানক।" দুর্জ্জয়সিংহ আর কিছু না বলিয়া অতি ক্রুদ্ধভাবে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

অনুসূয়া দুর্জ্জয়সিংহকে চিনিত। সুতরাং তাহার এই ভয়ানক প্রতিজ্ঞা-বাক্য তাহার চিন্তাহীন মনে ভবিষ্যতের একটা অশুভছায়া আনিয়া দিল। সে অন্যমনস্কভাবে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে, মন্দিরসংলগ্ন সেই উদ্যানমধ্য হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

অনুসূয়া, শিশোদিয়-বংশোদ্ভব রাজা অরিসিংহের একমাত্র কন্যা। রাজস্থানের গৌরবস্বরূপ মহারাণা প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর, শিশোদিয়-বংশের এক শাখা, কোন কারণে মিবারের পার্ব্বত্য-প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া, আগ্রার অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বসবাস করিতে লাগিলেন। উল্লিখিত নূতন দুর্গাধিপতি যশোসিংহ, প্রতাপের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া "হলদীঘাটের" স্মরণীয় যুদ্ধে, সৈন্য-চালনা করিয়াছিলেন। স্বয়ং কুমার সেলিম, যশোসিংহের ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি চালনার অসীম প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। পিতার নিকট ভবিষ্যতে হলদীঘাটের যুদ্ধবর্ণনা করিবার সময়—তিনি প্রতাপ-সহচর, যশোসিংহের বীরত্বের কথা উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। উদার-হৃদয় আকবর, বীরের সম্মান রাখিতে জানিতেন। প্রতাপ-সিংহের উপর অত্যাচারের জন্য, ইতিহাসকারেরা তাঁহাকে কলঙ্ক-মণ্ডিত করিয়াছেন, কিন্তু যশোসিংহের প্রতি উদারতা দেখাইতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

যশোসিংহের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, তিনি তাঁহাকে মহারাজ মান-সিংহের অধীনস্থ সৈন্যপুঞ্জের একাংশের, পরিচালন-ভার দিতে চাহিয়া-ছিলেন। কিন্তু গর্ব্বিত যশোসিংহ, বাদসাহের সে অনুগ্রহ, বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে তাঁহার পুত্র অরিসিংহ দুর্দ্ধর্ষ জ্ঞাতিগণের বিরুদ্ধচারিতায় অনন্যোপায় হইয়া, জাহাঙ্গীর বাদসাহের অধীনে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগে, যে সমস্ত রাজপুত-সামন্ত

মন্সবদারী লাভ করিয়াছিলেন, রাজা অরিসিংহ তাঁহাদের মধ্যে একজন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর, সাহজাহান সম্রাট্ হইলেন। তিনি হিন্দু-ওমরাহদের উপর বড় একটা শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। এইজন্য অরিসিংহকে প্রথম প্রথম বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু সাহজাহানের প্রিয় ওমরাহ ও প্রধান সেনাপতি আমীর-উদ্দৌলা মুক্তিয়ার খাঁর সহায়তায়, দরবারমধ্যে অরিসিংহের যশ ও প্রতিপত্তি অন্যান্য হিন্দু ওমরাহদিগের অপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিল।

এরূপ সহায়তা, উষ্ণ-রক্ত শিশোদিয়ের পক্ষে নিতান্ত প্রার্থনীয় না হইলেও, নানা কারণে, অবস্থার বৈগুণ্যে, জ্ঞাতির শক্রতায় বাধ্য হইয়া—অরিসিংহ মুক্তিয়ারের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বন্ধুতা নানা কারণে অতিশয় দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়াছিল। ধরিতে গেলে, মুক্তিয়ারের জন্যই বাদসাহ-সরকারে তাঁহার যশ ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তাহা হইলেও, তিনি জন্মভূমি রাজপুতানাকে ভোলেন নাই। সময় ও সুযোগ পাইলেই আরাবল্লী বক্ষস্থিত, প্রাচীন পৈত্রিক দুর্গে আসিয়া, দুই এক মাস থাকিয়া যাইতেন। শিব-চতুর্দ্দশীতে রাজপুত-কুমারীগণ পতিকামনায় একলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন। এজন্য একটা মহোৎসব হয়। কুমারী কন্যা অনুসূয়ার প্রার্থনা অনুসারে, এই জন্যই তিনি রাজপুতানায় আসিয়াছিলেন। মহাকাল-মন্দিরেই অনুসূয়ার সহিত দুর্জ্জয়ের সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে পাঠক তাহা জানেন।

অরিসিংহ রাজপুতানা হইতে ফিরিয়া আসা অবধি, মুক্তিয়ার খাঁর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। একদিন মুক্তিয়ার সান্ধ্যবায়ু সেবন করিতে করিতে, অরিসিংহের আবাসভবনের খুব কাছাকাছি

আসিয়া পড়িলেন। এত কাছে আসিয়া বন্ধুর সহিত দেখা না করিয়া যাওয়াটা ভাল দেখায় না বলিয়া, তিনি তাঁহার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরীর বহিঃপ্রকোষ্ঠে তাঁহার অবারিত দ্বার। তিনি বরাবর উপরের "বারদোয়ারি" গৃহের সম্মুখস্থ হইলেন।

দেখিলেন—এক বিচিত্র অজিনাসনের উপর বসিয়া, অরিসিংহ নিমগ্নচিত্তে একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন—আর এক স্থিরা-বিদ্যুল্লতা-তুল্যা, হৈম-মৃণালিনী-সদৃশী, জ্যোতির্ম্ময়ী যৌবনোন্মুখী কিশোরী, তাঁহার কাছে বসিয়া এক মনে তাহা শুনিতেছে।

গ্রন্থখানি, চাঁদকবির তেজ-তরঙ্গিত, উচ্ছ্বাসময় সমরগীতি। অরিসিংহ প্রত্যহ পুরাণাদির ন্যায়, এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতেন। পড়িতে পড়িতে, তাঁহার বীরহৃদয় স্ফীত হইয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিত। অতীতকালের চৌহান ও শিশোদিয় বীরগণের কীর্ত্তিকাহিনী, তাঁহাকে মাঝে মাঝে উন্মত্তের মত করিয়া তুলিত। অরিসিংহ "চাঁদবর্দ্দি" পড়িতেন, আর কাছে বসিয়া শুনিত—তাঁহার সুন্দরী কন্যা অনুসূয়া।

মুক্তিয়ার, ইতিপূর্ব্বে অরিসিংহের কন্যার সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়াছিলেন। আজ তাঁহার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিল। তিনি মুগ্ধচিত্তে সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-শোভিতা, ভুবন-বিমোহিনী যৌবনোন্মুখী কিশোরী দেবীপ্রতিমা দেখিয়া হৃদয় হারাইলেন। তিনি দেখিলেন, চন্দ্র-কিরণের উজ্জ্বলতা, পুষ্পের কোমলতা, নবনীতের স্নিগ্ধতা, মথিত করিয়া, খোদা যেন নির্জ্জনে সেই অপ্সরীমূর্ত্তি গড়িয়াছেন।

মুক্তিয়ার উন্মুক্ত দ্বার-পথে, কতবার সেই মোহনকান্তি দেখিলেন—তথাপি তাঁহার দর্শনতৃষ্ণা মিটিল না। যত দেখেন—আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়। দর্শনে আকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষায় আসক্তি! মুক্তিয়ারের পাষাণ বীরহৃদয়, শেষে আসক্তির মধুর উচ্ছাসে ভরিয়া উঠিল।

চৌরের ন্যায় এপ্রকার ভাবে ভয়ে ভয়ে, সে লাবণ্যময়ী সোণার প্রতিমা দেখায় কোন ফল নাই দেখিয়া, তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"অরিসিংহ !"

অরিসিংহ দেখিলেন—তাহার দোস্ত মুক্তিয়ার খাঁ কক্ষমধ্যে উপস্থিত। তিনি পুস্তক বন্ধ করিয়া উঠিয়া, বন্ধুর সংবর্দ্ধনা করিলেন। আর সেই বিদ্যুদ্দামতুল্যা, স্থির কটাক্ষশালিনী, উজ্জল-প্রভাময়ী অনুসূয়া—অলক্ষ্যভাবে একটী বীরহৃদয় দলিত করিয়া,সৌন্দর্য্যের বিজলীধারা বর্ষণ করিতে করিতে, মরালগতিতে সে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

মুক্তিয়ারের চমক ভাঙ্গিল। তিনি কম্পিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অরিসিংহ! এই কি তোমার রূপসী কন্যা?"

"কেন, তুমি কি ইহাকে দেখ নাই?"

"না—আজ প্রথম দেখিলাম। দেখিয়া বড় তৃপ্তি হইল। তোমার প্রাণের দোস্ত আমি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মেয়ে এত বড় করিয়া রাখিয়াছ—বিবাহের চেষ্টা দেখিতেছ না যে?"

"ভাই! জান ত আমরা জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, এই তিনটীকে ঈশ্বরাধীন বলিয়া ভাবি। এক চৌহান রাজকুমারের সহিত এখন কথাবার্ত্তা চলিতেছে, কতদূর কি হয় বলা যায় না।"

মুক্তিয়ার স্থিরচিত্তে কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন—"অরিসিংহ! একটী কথা বলিব কি?"

"স্বচ্ছন্দে বল,।"

"তুমি কি আমার অনুরোধ রাখিবে?"

"রাখিবার হয় রাখিব—আমি তোমার কাছে নানা উপকারের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ।"

অরিসিংহ "চাঁদবর্দ্দে" পড়িতেন, আর কাছে বসিয়া শুনিত
তাঁহার সুন্দরী কন্যা অনুসূয়া।—১৯৬ পৃঃ।

The Emerald Ptg. Works.

"ওকথা ছাড়িয়া দাও। যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত বা বিস্মিত হইবে না ত।"

অরিসিংহ এইরূপ অদ্ভুত ভূমিকা দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, বলিলেন—এত ভূমিকার আবশ্যক কি? বলিয়া যাও।"

মুক্তিয়ার গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন,—"অরিসিংহ! আমি তোমার কন্যার রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছি—আমি তাহাকে বিবাহ করিব।"

অরিসিংহ বসিয়াছিলেন, সহসা বিষধর-দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রোধে, তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সদম্ভে, দৃপ্তসিংহের ন্যায় মহাগর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"মুক্তিয়ার! এখনি এ পুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। শিশোদিয়-বংশে আজ পর্য্যন্তও এমন কুলাঙ্গার কেহ জন্মে নাই, যে কন্যা-বিক্রয়ে কৃতজ্ঞতা-ঋণ প্রতিশোধ করে।"

অরিসিংহ আর কিছু না বলিয়া, মুক্তিয়ার খাঁর উপর ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

নবাব মুক্তিয়ার খাঁ অপমানিত হইয়া, রোষভরে সবেগে সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সীমাবর্ত্তী। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন—"শয়তান্! শীঘ্রই এ অপমানের প্রতিফল পাইবি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

কৃষ্ণবসনমণ্ডিতা, গভীরা নিশীথিনী সমগ্র বিশ্ব গ্রাস করিয়াছে। চারিদিকে ঘোর তমিস্ররাশি। রাজপথ একাবারে জনশূন্য। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। চারিদিকে বিরাট্ নিস্তব্ধভাব। পথি-পার্শ্বস্থ আলোকগুলি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু অন্ধকার দূর করিতে পারিতেছে না। অদূরে এক সরাই। এই সরাইখানা পার হইলেই আগরা সহর।

মুক্তিয়ার বীরপুরুষ ও মদ-গর্ব্বিত। মোগলের উষ্ণ রক্ত, তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। তিনি সাহজাহানের দক্ষিণ হস্ত। প্রত্যাখ্যাত হইয়া—ক্রোধে, অপমানে মুক্তিয়ার দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতেছেন আর মনে মনে বলিতেছেন—"অরিসিংহ! নির্ব্বোধ অরিসিংহ! ক্ষমতায় ও শক্তিতে তুমি মুক্তিয়ার খাঁর তুলনায়, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম। মুক্তিয়ার—তোমার মত শত শত রাজপুত-ওমরাহকে নিজের স্বার্থের মুখে, কীট-পতঙ্গের ন্যায় চরণ-দলিত করিতে পারে। তুমি দাম্ভিকতায় ভুলিয়া, আজ তাহার অপমান করিয়াছ। তোমার পতন অনিবার্য্য।"

মুক্তিয়ার অস্ফুটস্বরে এই প্রকার বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতে-ছেন, এমন সময়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ সহসা কোন অপরিচিত-হস্তের স্পর্শানুভব করিল। মুক্তিয়ার চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, পরুষ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে তুমি?

"আমি আপনার হিতকারী।"

"তুমি মুসলমান ?"

"না—হিন্দু—রাজপুত।"

"রাজপুত! অসম্ভব! তোমার উদ্দেশ্য কি শীঘ্র বল? নচেৎ, তোমার মুণ্ড, এখনি এই তীক্ষ্ণকৃপাণের শক্তি অনুভব করিবে।"

"আপনাকে বোধ হয়, অতটা কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। আপনি ত ওমরাহ অরিসিংহের বাটী হইতে আসিতেছেন ?"

"হাঁ—তোমার তাহাতে কি প্রয়োজন ?"

"আছে। এইমাত্র আপনি অপমানিত হইয়া প্রতিহিংসা কল্পনা করিতেছিলেন। অরিসিংহকে আপনি চিনেন না। তাহার কন্যার হস্ত প্রার্থনা করা আপনার উচিত হয় নাই।"

মুক্তিয়ার স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না—কে এই অন্ধকার-বেষ্টিত দীর্ঘকায় অপরিচিত পুরুষ। তিনি সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন—

"তুমি এ সব সংবাদ জানিলে কিরূপে ?"

"সে কথায় এখন প্রয়োজন নাই—আমি আপনার সংকল্পে সহায়তা করিতে আসিয়াছি। সব খুলিয়া না বলিলে, আপনি বিশ্বাস করিবেন কি ?"

"তোমার নাম ?"

"এখন বলিব না—আগে বলুন, আপনি আমার সাহায্য লইবেন কি না? আমি অরিসিংহের শত্রু!"

"ভাল, তাহাই হইবে—মুসাফের-খানায় চল। তোমার সহিত নির্জ্জনে কথা কহিব।

"না—আজ আর আমি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিব না। কল্য মধ্য-রাত্রে, দুর্গমধ্যে আপনার আবাসে গিয়া দেখা করিব।"

"অত রাত্রে তোমায় দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবে কেন ?"

"আপনি নিদর্শন দিন। তাহা হইলে কেহই আপত্তি করিবে না।"

মুক্তিয়ার চিত্তের দারুণ উত্তেজনাবশে, বিনা সন্দেহে, অঙ্গুলি হইতে এক অঙ্গুরীয়ক মোচন করিয়া, সেই অন্ধকার-বেষ্টিত অপরিচিত ব্যক্তিকে দিয়া বলিলেন—"এই অঙ্গুরী রাখিয়া দাও। দুর্গপ্রবেশে তোমার কোন বাধাই ঘটিবে না।"

সেই অন্ধকার-বেষ্টিত দীর্ঘকায় ব্যক্তি দৃঢ়স্বরে বলিল—"বুঝিতেছি, আপনি আমার সহায়তা লইতে প্রস্তুত। কিন্তু এ সহায়তার পণ শুনিবেন কি?"

"আমি তোমাকে এক হাজার আসরফি পারিতোষিক দিব।"

"মুদ্রা আমি অতি তুচ্ছ বিবেচনা করি—ইচ্ছা করেন ত, উহার দ্বিগুণ মুদ্রা আপনাকে দিতে পারি।"

"তবে তুমি চাও কি?"

মুক্তিয়ারের কাণে কাণে সেই অপরিচিত ব্যক্তি দুই চারিটী কথা বলিল। মুক্তিয়ার ইহাতে চমকিয়া উঠিল। পরে কি ভাবিয়া বলিল—"রাজপথে এ সব কথা হইতে পারে না। কাল দুর্গে যাইও, তোমার প্রস্তাব উত্তমরূপে ভাবিয়া দেখিব।"

অভিবাদনপূর্ব্বক আগন্তুককে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া, মুক্তিয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি?"

"এ অধীনের নাম মন্সবদার দুর্জ্জয়সিংহ।"

নাম শুনিয়া মুক্তিয়ার খাঁ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। যদি সেই সময়ে স্বর্গ হইতে হুরীগণ আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিত, তাহা হইলেও তিনি অতদূর বিস্মিত হইতেন না।

দুর্জ্জয়সিংহ পবিত্র রাঠোর-কুলোদ্ভব। সে একজন পঞ্চশতী মন্সবদার। দুর্জ্জয়সিংহের সহিত তাঁহার পরিচয়ও আছে। এই রাঠোর-

বংশীয় এক রাজকুমারী, সম্রাটের রঙ্গমহলে অবস্থান করিতেছে তাহাও সে জানিত। মুক্তিয়ার কাজেই একটা মহা সমস্যার মধ্যে পড়িল। তাহার সমস্যার বিষয়—এ ব্যক্তি ত একজন শক্তিসম্পন্ন রাজপুত। তবে এ তাহার সহায়তা চায় কেন? রাজপুত হইয়া রাজপুতের সর্ব্বনাশ করিতে চায় কেন? এ সমস্যার মীমাংসা করিতে না পারিয়া মুক্তিয়ার খাঁ চিন্তাপূর্ণ-হৃদয়ে স্বীয় আবাসস্থানে উপস্থিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০—

বলা বাহুল্য, সেই রাত্রের ঘটনার পর—বাদসাহের সরকারে রাজা অরিসিংহের দিন দিন প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। প্রথম প্রথম তিনি প্রায়ই আমখাসে হাজিরা দিতেন—কিন্তু নানাপ্রকারে অপমান ও অনাদর ঘটাতে, দরবারে যাতায়াত একপ্রকার বন্ধ করিলেন। ইহার মধ্যে একদিন আমখাসের সভা-ভঙ্গের পর, বাদসাহ তাঁহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন—"রাজপুত ওমরাহ! মুক্তিয়ারের হস্তে তোমার কন্যাকে সমর্পণ করায় আপত্তি কি?"

অরিসিংহ নম্রভাবে উত্তর করিলেন—"জাঁহাপনা! অন্য কেহ হইলে, হয়ত এ আপত্তি ব্যক্ত করিতে স্বীকৃত হইতাম না। কিন্তু যখন আপনি আদেশ করিতেছেন, তখন বলিতে বাধা কি? পবিত্র শিশোদিয়-কুলসম্ভূত হইয়া আমি এই মুক্তিয়ারকে কন্যাদান করিতে পারিব না। দিল্লীর বাদসাহগণকে এই শিশোদিয়ারা এ পর্য্যন্ত কন্যাদান করেন নাই। মুক্তিয়ার-খাঁ, দিল্লীশ্বরের তুলনায় অতি নগণ্য।

সাহজাহান দাম্ভিক ছিলেন বটে, কিন্তু একবারে ন্যায়বর্জ্জিত ছিলেন না। সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া তিনি শেষে বলিলেন—"তোমার যাহা বিবেচনায় হয়, তাহা করিও, আমি এ বিষয়ে কোন অনুরোধ করিতে চাহি না।"

এই ঘটনার পর, কেহ কখন অরিসিংহকে আর আমখাসে দেখে নাই।

ইহার অব্যবহিতপূর্ব্বেই, অনসূয়ার জন্য এক পাত্র স্থির হইয়াছিল। অরিসিংহ ভাবিলেন, বিবাহ দিয়া ফেলিলেই সকল আপদ চুকিয়া যায়—সুতরাং তিনি শুভদিন দেখিয়া কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

জনরব, যখন দুর্জ্জয়সিংহের কাণে এই বিবাহ-সম্বন্ধের কথা তুলিল, তখন সেই উষ্ণমস্তিষ্ক রাঠোর—বিষধর-দষ্ট পান্থের ন্যায় জ্বালাময় হইয়া উঠিল। ক্রোধে ওষ্ঠাধর দন্তমর্দ্দিত করিয়া, তখনই সে মুক্তিয়ারের আবাসবাটীর দিকে ছুটিল। তাঁহাদের গুপ্ত-মন্ত্রণার শোচনীয় ফল পাঠক পর-পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের দুই দিন মাত্র বাকী। অরিসিংহের অন্তঃপুর—আত্মীয় কুটুম্বগণের আগমনে কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই আনন্দোৎসব করিতে আসিয়াছে। কিন্তু কে জানিত, ভবিষ্যৎ এ বিবাহের পরিণাম অতি শোচনীয় করিয়া তুলিবে।

যাহার বিবাহে বাটীতে আনন্দ ধরে না, সে একটী নির্জ্জন কক্ষে একখানি উন্মুক্ত পত্রের দিকে স্থিরদৃষ্টি হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখে ঘোর দুশ্চিন্তা! সেই প্রফুল্ল প্রভাতকমলবৎ—সেই প্রাতঃশিশিরমণ্ডিত—শুভ্র মল্লিকা ফুলের ন্যায় সুন্দর মুখখানি, বিষণ্ণতার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে।

পত্র পড়িতে পড়িতে অনস্থয়ার চক্ষে দুই এক বিন্দু অশ্রু আসিয়া দেখা দিল। সে ভাবিল—"আমিই ত যত অনর্থের মূল। আমা হইতেই পিতার অবনতি, শত্রুবৃদ্ধি, মনের অশান্তি আর এত নির্য্যাতন। আজ যদি আমি মরি, তাহা হইলে কি এ সব দুর্নিমিত্ত থামিয়া যায় না? পিতা আবার বিপদ্ মুক্ত হন না?"

এমন সময়ে অরিসিংহ কন্যার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি অনস্থয়ার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "অনু! মা! তুই কাঁদিতেছিস্ কেন?"

"না—বাবা—" বলিয়া সেই স্নেহমুগ্ধা কন্যা, একখানি পত্র অরিসিংহের হস্তে দিল।

পত্রখানি পড়িবার সময়, রাজপুতবীরের মুখমণ্ডল মলিনভাব ধারণ করিল। তিনি সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অনস্থয়ে! এ পত্র কোথা পাইলে?"

"এই বিছানার উপর!"

"এই ঘরে? এই বিছানার উপর!! কি আশ্চর্য্য! অন্তঃপুরমধ্যেও শত্রু নিঃশঙ্কভাবে আসিতেছে!"

অরিসিংহ দ্রুতপদে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। পত্রখানিতে এইরূপ লেখা ছিল—

"অনস্থয়ে! সাবধান! অদ্য মধ্যরাত্রে তোমাদের ভয়ানক বিপদ

ঘটিবে। তোমার পিতাকে লইয়া সন্ধ্যার সময় দুর্গ ত্যাগ করিও—”
আশ্চর্য্যের বিষয় পত্রে কাহারও স্বাক্ষর নাই!

* * * * *

পত্র যাহার লেখা হউক না কেন—অরিসিংহের মনে দৃঢ়বিশ্বাস দাঁড়াইল, নিশ্চয়ই এসব কোন নীচমনা শত্রুর প্রতারণা ও ভয়প্রদর্শন। তাই তিনি কন্যাকে বলিয়াছিলেন—“অন্তঃপুরের মধ্যেও শত্রুর যাতা-য়াত আরম্ভ হইয়াছে।”

কিন্তু তিনি এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। আর একবার তাঁহার নিজের নামে, এই প্রকার একখানি পত্র আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর কোন প্রকার গোলযোগ ঘটে নাই বলিয়া, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও সতর্ক হইলেন না।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। প্রকৃতি ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। অরিসিংহের বিস্তৃত অট্টালিকার মধ্যে সকলেই সুখনিদ্রায় মগ্ন। নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার পাশাপাশি হইয়া, সেই গভীর নিশীথে পূর্ণরাজত্ব করিতেছিল।

এই অন্ধকারের মধ্যে—প্রচ্ছন্নভাবে শরীর ঢাকিয়া, পঞ্চাশৎ মোগল সৈন্য, নিঃশব্দে অরিসিংহের প্রাসাদ-পার্শ্বস্থ আম্রকাননে প্রবেশ করিল। তাহারা অতি ধীরগতিতে আসিয়া এক স্থানে দাঁড়াইল,—যেন কাহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। এমন সময়ে তাহাদের মধ্যে একজন অস্ফুটস্বরে বলিল—“দুর্জ্জয়সিংহ! তুমি এই প্রাচীর-পার্শ্বে অপেক্ষা কর, আমি প্রবেশ-দ্বারের চাবি সংগ্রহ করিয়া আনি।”

দুর্জ্জয়সিংহ অস্ফুটস্বরে বলিল—“চোরের ন্যায় এ কার্য্য করিতে আমি প্রস্তুত নই। রাঠোর-বীর দস্যু নহে। আপনি থাকুন—আমি ঢুকিলাম।”

প্রথম বক্তা বলিল—"এখন রাগ করিলে চলিবে না। আচ্ছা তুমি সম্মুখ হইতে আক্রমণ কর—আমার যাহা ইচ্ছা তাই করি।"

দুর্জ্জয়সিংহ এইবার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল। বৃথা অভিমান ও ক্রোধের বশে এক ভীষণ কার্য্যে সহায়তা করিতে আসিয়া, সে যে কতদূর অন্যায় কাজ করিয়াছে, এতক্ষণ পরে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। পূর্ব্বকৃত অপমান ও লাঞ্ছনার পরও, সে অনসূয়াকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। কিন্তু সহজে তাঁহার প্রাণের বাসনাপূর্ণ হইবে না ভাবিয়া, মুক্তিয়ারের সহিত সে এই ঘৃণাস্পদ সখ্যভাবে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং পরক্ষণেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, অনসূয়াকে একখানি পত্র লিখিয়া সাবধান করিয়া দেয়। মুক্তিয়ারের সহায়তারূপ পাপপথ ত্যাগ করিয়া, কৃতজ্ঞতাসূত্রে অনসূয়া ও তাহার পিতাকে বাধ্য করাই শ্রেয়ঃ, এই ভাবিয়াই সে সেই সাবধান-পত্র লেখে। অরিসিংহের অনুগ্রহলাভের ইচ্ছা, এখন দুর্জ্জয়সিংহের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সে অভিপ্রায় পূর্ণ হইল না। সে দেখিল, তাঁহার সেই সাবধান-পত্র লেখা বৃথা হইয়াছে। অরিসিংহ কন্যাকে লইয়া পলায়ন করেন নাই। দুর্জ্জয়সিংহ, দারুণ মর্ম্মযাতনায় ও অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। এখন অনসূয়াকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য দাঁড়াইল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মুক্তিয়ার—দুর্জ্জয়সিংহের মনোভাব মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিয়া লইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার পার্শ্বস্থ রক্ষীগণকে আদেশ করিলেন—"এই বিশ্বাসঘাতক শয়তানকে বন্দী কর।" দুর্জ্জয়সিংহ আত্মরক্ষার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই, মোগল-সেনার হস্তে বন্দী হইল। মুক্তিয়ার, সৈন্য লইয়া ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া, পুরী প্রবেশ করিলেন। ত্রিশজন সৈনিক, মহাশব্দে জয়নাদ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল।

অরিসিংহ, সেই গভীর কোলাহলের মধ্যে জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন—তাঁহার সৈন্যেরাও জাগরিত হইয়া দ্বিতলের মধ্যে অরাতির প্রবেশ-সঞ্চার রহিত করিবার জন্য, প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। তিনি দ্রুতপদে কন্যার গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। অনসূয়াও এই সব গোলমালে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

অরিসিংহ কন্যাকে দৃঢ়হস্তে ধরিয়া, সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনসূয়ার কক্ষের পরেই তাঁহার নিজকক্ষ, তারপর "লাল বার-দোয়ারি" বা বাহিরের বৈঠকখানা। তখনও সেখানে শত্রুদল আসে নাই।

অরিসিংহ কন্যাকে লইয়া, সেই শত্রু-সমাগম-শূন্য বার-দোয়ারির উত্তর দ্বার দিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলেন। অনসূয়া, এতক্ষণ স্থিরভাবে পিতার সঙ্গে আসিতেছিল—কিন্তু সহসা তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তন হইল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"পিতঃ! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি একটী অতি প্রয়োজনীয় জিনিস আনিতে ভুলিয়াছি।"

অরিসিংহ কোন উত্তর না করিতে করিতে, অনসূয়া নিজের কক্ষের দিকে ছুটিল। সে তাহার মৃতা জননীর আলেখ্যখানি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

অৰ্দ্ধপথ না যাইতে যাইতে, মুক্তিয়ার খাঁ সদলে অনসূয়ার পথ-রোধ করিলেন। অনুচরদের আদেশ করিলেন—"ইহাকে নজর-বন্দী করিয়া রাখ। সাবধান! যেন কেহ ইহার অঙ্গে হস্তস্পর্শ না করে।"

অরিসিংহ কন্যার বিলম্ব দেখিয়া, তাহার কক্ষের দিকে ছুটিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। মুক্তিয়ারও অরিসিংহকে দেখিবামাত্র সবেগে তাঁহার দিকে ধাবমান হইলেন।

অরিসিংহ দৃঢ়হস্তে তরবারি ধরিয়া, অব্যর্থ লক্ষ্যে, চার পাঁচজন মোগল-সেনানীকে সেইখানে ধরাশায়ী করিলেন। তাঁহার উন্মত্ত-ভাব ও সিংহের ন্যায় ভীম পরাক্রম দেখিয়া, শত্রুসৈন্য সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল।

পথ পরিষ্কার পাইয়া অরিসিংহ দ্রুতবেগে কন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। কন্যা তখন কাতরকণ্ঠে নিরুপায়ভাবে বলিল,—"পিতঃ! রক্ষা করুন।"

অরিসিংহ মুহূর্ত্তকাল কন্যার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন, এবং পরক্ষণেই ঘোর উন্মাদের ন্যায় হাস্য করিয়া, সেই অরাতি-রুধির-প্লাবিত, তীক্ষ্ণ খড়্গ—প্রাণসম দুহিতার বক্ষে আমূল প্রোথিত করিয়া উন্মাদের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—"বৎসে! তাহাই হউক, এস তোমাকে রক্ষা করি! আর তোমার কোন ভয়ই নাই।" কোমলতাময়ী নিষ্কলঙ্ক পুষ্পপ্রতিমা সেই নিদারুণ আঘাতে ছিন্ন-লতিকার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল।

মুক্তিয়ার এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া দশ হস্ত দূরে পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সৈন্যগণও নির্ব্বাক্ হইয়া ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল প্রয়োজন ঘটিলে, রাজপুত যে স্বহস্তে স্নেহময়ী কন্যাকেও বধ করিতে পারে, এ দৃশ্য তাহাদের নিকট অতি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইল! অরিসিংহ বিষণ্ণমুখে রুধির-প্লাবিত কন্যার দেহটীকে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে লাল-বার-দোয়ারিতে পৌঁছিলেন।

মুক্তিয়ার সেই স্থানে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টে এই ভীষণ

কাণ্ড দেখিতেছেন, এমন সময়ে সহসা পশ্চাৎদিক হইতে একটী তীক্ষ্ণধার বর্শা আসিয়া তাঁহার গ্রীবাদেশ বিদ্ধ করিল। নবাব মুক্তিয়ার খাঁ পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, উন্মত্ত দুর্জ্জয়সিংহ এক হস্তে তরবারি ও একহস্তে বর্শা লইয়া মোগল-সেনা নিপাত করিতেছেন। মুক্তিয়ার, দুর্জ্জয়সিংহের হস্তনিক্ষিপ্ত বর্ষার সেই প্রচণ্ড আঘাতে বিগতপ্রাণ হইয়া, কক্ষতলে পড়িয়া গেলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ শত্রুসৈন্য মথিত করিয়া, অনসূয়ার অনুসন্ধানে ছুটিল। লাল-বারদোয়ারিতে প্রবেশ করিয়াই দেখিল—সেই শোণিতধারা-প্লাবিত দেহলতিকা, ছিন্নবৃন্ত কুসুমের ন্যায় ভূতলে লুটাইতেছে। দুর্জ্জয়সিংহ এ দৃশ্যে বড়ই মর্ম্মাহত হইল। সে কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল—"অনসূয়ে! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

কোথায় অনসূয়া! কে তাহার এ অকুল প্রশ্নের উত্তর করিবে। সেই ছিন্নবল্লরীবৎ সুকোমল দেহ হইতে প্রাণ বহুক্ষণ পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ। উন্মাদবৎ স্থিরদৃষ্টিতে সে সেই রুধির-প্লাবিত দেহযষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। একবার সে রাজপুত-ধর্ম্ম-পরায়ণ উগ্রতেজ অরিসিংহের মুখের দিকে চাহিল। তাহার পাষাণ প্রাণ শতধা চূর্ণ হইল।

তৎপরে সে শূন্যদৃষ্টিতে কঠোর স্বরে বলিল—"অনসূয়ে! প্রাণাধিকে! এই রাঠোরকুলকলঙ্ক দুর্জ্জয়সিংহ তোমার উপর যে দারুণ অত্যাচার করিয়াছে—মুক্তিয়ারের শোণিতে তাহার কতক প্রায়শ্চিত্ত হইল। যদি তোমাকে জীবিত পাইতাম, যদি তোমার মুখে দুটা তিরস্কারের কথাও শুনিতাম, তাহা হইলেও বুঝি বা তদপেক্ষা কঠোর প্রায়শ্চিত্তের দিকে আমার নিরাশ চিত্ত ধাবিত হইত না।" এই কথা

বলিয়াই দুর্জ্জয়সিংহ মুহূর্ত্তমধ্যে কটিদেশ হইতে এক অতি তীক্ষ্ণধার, সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ, ছুরিকা বাহির করিয়া স্বীয় নিজ বক্ষঃস্থলে বসাইয়া দিল।

আর অরিসিংহ!! কন্যা-বিয়োগ-বিধুর হতভাগ্য অরিসিংহ—যাহা করিলেন, পাঠক পরে তাহার পরিচয় পাইবেন।

* * * * *

সন্ধ্যা হইয়াছে—আকাশে দুই চারিটী তারকা, অনন্ত নীলবর্ণের মধ্যে উজ্জ্বলতা বিকীরণ করিয়া, যমুনার নীলবক্ষে আপনাদের জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতেছে—এমন সময়ে রাজপথে ঘোরতর বাদ্য-কোলাহল উঠিল। চারিদিকে মশালের আলো, মৃদু-গম্ভীর বাদ্য-ধ্বনি। তাহার মধ্যে জনসংঘ—আনন্দ-কোলাহল তুলিয়া বলিতেছে,—"ঐ বর আসিতেছে!"

অরিসিংহের তোরণদ্বার-সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া, এই শোভাযাত্রা স্থির-ভাবে দাঁড়াইল। আশপাশের লোক—যাহারা পথিমধ্যে বরের সঙ্গে জুটিয়াছিল—দুর্গাধিপতির প্রাসাদের দিকে বরকে যাইতে দেখিয়া, তাহারা মধ্যপথে সরিয়া পড়িল। দুর্গ-দ্বারের নিকট আসিয়াই বাদ্যোদ্যম বন্ধ হইল। নহবৎ থামিল। মশালের আলো নিবিয়া গেল।

বর—সকলকে বাহিরে রাখিয়া, বিস্ময়ান্বিত চিত্তে, কম্পিত-হৃদয়ে, পুরী প্রবেশ করিলেন।

পূর্ব্ব রাত্রে যে ভীষণ ঘটনা ঘটিয়াছে, তিনি তাহার কিছুই জানেন না। বিবাহ-বাড়ীতে আলো নাই, আনন্দ-কোলাহল নাই, নহবৎ নাই, বিবাহ-সভা নাই দেখিয়া, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

বর, ভয়চকিতচিত্তে ত্রস্তপদে দ্বিতলে উঠিলেন। বাটীর এক পুরাতন ভৃত্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু সে কোন কথা না বলিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে অন্যদিকে চলিয়া গেল।

সহসা অরিসিংহ আসিয়া সেই স্থানে দেখা দিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় কোটরমগ্ন, মুখে ঘোর বিভীষিকা—বদনমণ্ডল শবের ন্যায় মলিন। বরকে দেখিয়া, তিনি উন্মাদের ন্যায় মর্ম্মভেদী কঠোর হাস্য করিয়া উঠিলেন। দৃঢ়ভাবে চৌহান-রাজকুমারের হস্ত ধরিয়া, তাহাকে সেই "লাল-বারদোয়ারিতে" লইয়া গেলেন।

চৌহানকুমার দেখিলেন—বারদোয়ারি গৃহটী সম্পূর্ণরূপে উজ্জ্বলিত। দর্পণে দর্পণে, ঝাড়ের স্ফটিক দলে, সেই সমুজ্জ্বল আলোকমালা প্রতিফলিত হইতেছে। চারিদিকে কেবল ফুলের মালা। হর্ম্ম্যতলে রাশীকৃত ফুল—স্তম্ভের উপরে ফুলের হার। যেন আজ ফুলশয্যার দিন। আর এই ফুলরাশির মধ্যে, বহুমূল্য কারুকার্য্যময় স্বর্ণখচিত মখমল আস্তরণে আবৃত কোন পদার্থ রহিয়াছে।

অরিসিংহ বক্রদৃষ্টি করিয়া, সেই মখমলের আবরণ ধীরে ধীরে উঠাইলেন। চৌহানকুমার সেই বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখিয়া, দশহস্ত দূরে পিছাইয়া আসিলেন, তাঁহার মুখ সহসা শবের ন্যায় রক্তহীন হইয়া গেল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! একি ভয়ানক ব্যাপার!"

অরিসিংহ বলিলেন—"বৎস! ইহাই হইতেছে, দাম্ভিক রাজপুতের কন্যার বিবাহ। ইহাই রাজপুতের চিরোজ্জ্বলিত নারী-সম্মান। অনসূয়া ইহলোকে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না। পরলোকে তোমার সহিত মিলিবে বলিয়া, এ শোণিত-যজ্ঞের শোচনীয় আয়োজন!"

বর, স্থিরভাবে অনসূয়ার মৃত্যুচ্ছায়া-কলঙ্কিত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"সত্যই ইহা রাজপুতের বিবাহ। এ বিবাহ ধন্য হউক! আজীবন আমি এই সাক্ষাৎ সতীরূপিণী অনসূয়ার ধ্যানে জীবন কাটাইব। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমি পরলোকে ইহার সহিত মিলিব। যে মিলনে বিচ্ছেদ নাই—যে মিলনে অব্যবচ্ছিন্ন অনাবিল সুখ—যে মিলনে অশ্রুজল নাই—আমি সেই ইপ্সিত মিলন-সুখেই চিরসুখী হইব।"

এই কথা বলিয়া চৌহান-রাজকুমার, অশ্রুপূর্ণনেত্রে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

অরিসিংহ অশ্রুপূর্ণনেত্রে, স্নেহোচ্ছলিত-হৃদয়ে, অনসূয়ার পুষ্পাচ্ছাদিত, বিচিত্র কৌষেয়-মণ্ডিত সেই শবদেহ চুম্বন করিলেন—পরে বিকট হাস্য করিয়া, সেই লাল-বারদোয়ারি হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার সহোদর অনসূয়ার শেষকৃত্য করিলেন।

জনপ্রবাদ—উন্মাদ দুর্গাধিপতি অরিসিংহকে সেই অবধি সেই দুর্গে আর কেহ কখনও দেখে নাই।

কল্যাণী-মন্দির ।

কল্যাণী-মন্দির।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কি আশ্চর্য্য! কা'ল চন্দ্রপতির স্ত্রীকে কে হত্যা করিয়া গিয়াছে!"

"দুদিন না যেতে যেতে, আবার এই হত্যাকাণ্ড!! সে দিন ত সুখলালের স্ত্রীকে—একজন সৈনিক, জোর করিয়া পাকড়াও করিয়া লইয়া গেল!"

"ওহে! এ কথা শোন নি! তার তিন দিন পূর্ব্বে আবার আমাদের বৃদ্ধ শিউলালকে কোন শয়তান নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া, গাছের ডালে বাঁধিয়া দিয়াছিল। তাই ত—ভাই! কেমন করিয়া আর স্ত্রীপুত্র লইয়া এদেশে থাকা হয়? এখানে জন্মিয়াছি, এখানে মানুষ হইয়াছি—এখানে জমীজারাত করিয়াছি। এখন যাই কোথায় বল দেখি? জন্মভূমির মায়া, দেশের মায়া কাটান ত সহজ কথা নয়।"

উল্লিখিত ভাবে কথোপকথন করিতে করিতে, আট দশ জন নাগরিক ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেরই হস্ত দৃঢ়মুষ্টিসম্বদ্ধ হইল, অনেকেই কোষস্থ তরবারিতে উত্তেজিতভাবে হস্ত প্রদান করিল। কেহ বা সম্মুখস্থ বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া, একটু বীরত্ব প্রকাশ করিল।

যাহারা সেই উষার প্রারম্ভকালে, মঙ্গলা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া

এই ভাবে আস্ফালন ও গোলমাল করিতেছিল, তাহাদের সকলেই পূর্ব্বতন "ভূমি-আওয়ৎ" রাজা সুজনসিংহের প্রজা।

মঙ্গলা নদী, ক্ষীণোর্ম্মিমালা হৃদয়ে ধরিয়া, যশল্মীরের বক্ষ প্লাবিত করিয়া, ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। অদূরে নূতন দুর্গাধিকারীর প্রকাণ্ড পার্ব্বত্য-দুর্গ অনন্ত-নীলিমাকোলে তাঁহার বিজয়-নিশান-স্বরূপ—স্কন্ধ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে রাজপুতেরা—এক এক শক্তিশালী সামন্তের অধীনে প্রজাস্বরূপে বসবাস করিত। এই সামন্ত-রাজাই তাহাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন।

তখন ভূমির দখলী-স্বত্বের সম্বন্ধে, কোন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। জমীর উপর উত্তরাধিকারিত্বক্রমে, কোন সামন্তের কোন স্থায়ী স্বত্ব ছিল না। যাঁহার বাহু-বল অধিক হইত—তিনিই "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এই আবহমান-কাল-প্রচলিত নীতি অনুসারে, অপর সামন্তের জমী বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া পূর্ব্বাধিকারীকে তাড়াইয়া দিতেন।

এবারেও তাই ঘটিয়াছে। এই ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্যের পূর্ব্বাধিকারী রাজা সুজনসিংহ, সর্দ্দার দুর্জ্জনসিংহ নামধারী এক ক্রূরপ্রকৃতি রাঠোরের বাহুবলে তাঁহার পঞ্চবিংশতি বর্ষের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। যিনি পূর্ব্বদিনে এই ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, আজ তিনি পথের ভিখারী হইয়াছেন।

দুর্জ্জনসিংহ—অতি দুর্দ্দান্ত সামন্ত। তাঁহার হঠকারিতায় অনেকে তাঁহার অবাধ্য হইল। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত তাহার কার্য্যগুণে অসন্তুষ্ট। অতি কঠোর নীতির অনুসারী হইয়াও তিনি এখনও প্রজা বশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দাম্ভিকতায় ও

উৎপীড়নে, প্রজারা সকলেই অসন্তুষ্ট। এমন কি, প্রাচীনেরাও বলিতেন—এমন নিষ্ঠুর ও দুর্দ্দান্ত "ভূমি-আওয়ৎ" তাঁহারা আর কখনও দেখেন নাই।

একে দুর্জ্জনসিংহের ভীষণ অত্যাচার ও লুটপাট, তাহার উপর অনাবৃষ্টির জন্য শস্যক্ষয়—কাজেই এই ক্ষুদ্র-রাজ্যমধ্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দিল। নিষ্ঠুর দুর্জ্জনসিংহ, অন্নাভাব-ক্লিষ্ট প্রজার মুখের দিকে চাহিলেন না। কে কোথায় অনাহারে পড়িয়া রহিল—কে সপরিবারে উপবাস করিয়া অন্নাভাবে মরিতে লাগিল, সে সব না দেখিয়া, তিনি কেবল রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতে ও নিজের সুখেই ব্যস্ত রহিলেন।

মর্ম্মবেদনা জানাইবার জন্য, এই দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট প্রজার দল, একদিন দুর্গাধিপতি দুর্জ্জনসিংহের নিকট দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। নীচাশয় দুর্জ্জনসিংহ, তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিবামাত্রই, প্রহরীদের দুর্গদ্বার আবদ্ধ করিতে হুকুম দিলেন। সেই দিন হইতে অধীনস্থ "ভূমিয়ারা" বিদ্রোহীর মত হইল।

ইহার উপর আবার দুর্জ্জনের সৈন্যগণের পাশবিক অত্যাচার, জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিল। তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ সেনারা, কখনও বা কাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া যায়, কোথাও বা কোন সম্ভ্রান্ত নাগরিকের কুলাঙ্গনাদের নারী-ধর্ম্মের অবমাননা করে, কখনও বা খাজনা আদায়ের অছিলায়, ধনী প্রজার ধন-ভাণ্ডার লুঠ করে—এই প্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচার আরম্ভ হইল।

যাহাদের উপর দুর্জ্জনসিংহ প্রজা-রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, তাহাদের অবস্থা ত এইরূপ। ইহাদের নামে কেহ নালিশ করিতে গেলে দুর্গাধিপতি, অভিযোগকারীদের আরও লাঞ্ছনা করেন। ক্রমশঃ

এই প্রকার অত্যাচার অসম্ভবভাবে বৃদ্ধি হওয়ায়, লোকে স্ত্রীপুত্র লইয়া নগরে বাস করা ভার বোধ করিল। সামন্তরাজের নিকট নালিশ করিয়াও যখন ইহার কোন প্রতিকার হইল না—তখন প্রজারা মরিয়া হইয়া আত্ম-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। আর এ প্রকার ঘটনায়, দুই এক স্থলে দুর্জ্জনসিংহের দলের দুই চারিটা লোকও খুন হইল।

শেষ এই কথাটা দুর্গাধিপতির কাণে উঠিল। তিনি এ ব্যাপারে সৈনিকদের দোষের বিশেষ প্রমাণ পাইয়াও নির্দ্দোষী প্রজাদিগকে কারাগারে দিলেন। প্রজারা আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। ইহার উপর আবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ। প্রজারা মরে মরুক, স্বার্থপর হৃদয়হীন দুর্জ্জন, তাঁহার সৈনিকদিগের জন্য চড়া দামে গ্রামের সমস্ত শস্য ক্রয় করিয়া, দুর্গমধ্যে সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। যে সব মহাজন শস্য বিক্রয় করিতে সম্মত হইল না, তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল।

যতদিন ঘরে শস্য ছিল, ততদিন প্রজারা দুবেলা দু'মুঠা খাইয়াছিল। ভাণ্ডারে টান পড়িলে, এক বেলা খাইল। যাহাদের অবস্থা তখনও ভাল ছিল, তাহারা লুকাইয়া লুকাইয়া দু'বেলা খাইত। নিম্নশ্রেণীর লোকের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার, একবারে বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, গোধূম, বজরা, মকাই, জওরা প্রভৃতি শস্যাভাবে বনের শাক কচু তুলিয়া, সিদ্ধ করিয়া খায়। কোন দিন বা নিরম্বু উপবাস করে, কোন দিন বা নিষ্ঠুর পিশাচের মত দুর্ব্বলের অন্ন কাড়িয়া খায়। কেহ বা অপরে খাইতেছে দেখিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে—কেহ বা স্ত্রীপুত্রের কঠোর ক্ষুধার যাতনা দেখিয়া আত্মহারা হইয়া পাগলের মত ছুটিয়া বেড়ায়, আর সকলেই একবাক্যে নিষ্ঠুর দুর্গাধিপতি দুর্জ্জনসিংহকে কঠোর অভিশাপ প্রদান করে।

আর একদিন এই বুভুক্ষু, আশ্রয়হীন, অভিভাবকহীন, প্রজার দল, ক্ষীণ-শরীর-ভার অতি কষ্টে বহন করিয়া, দুর্গাধিপতিকে দুর্ভিক্ষের সংবাদ, তাহাদের অনাহারের সংবাদ জানাইতে গিয়াছিল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জনসিংহ, স্বীয় ভৃত্যদিগকে কতকগুলা ভুক্তপাত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন, আস্তাকুড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হুকুম দিলেন। বলিয়া দিলেন—"ক্ষুধিত কুকুরগুলাকে এই সুপাচ্য উচ্ছিষ্ট অন্নের কণামাত্রও গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে দাও।" দুর্জ্জনসিংহের এই হৃদয়হীন ব্যবহারে দুর্ভাগ্য প্রজাগণ, সেই দিন হইতে এ অত্যাচারের প্রতিকার-ভার, ভগবানের উপর সমর্পণ করিল। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। ইহার উপর আবার নিত্যই খুনজখম। তাই কতকগুলি প্রজা একত্র হইয়া, মঙ্গলাতীরে এত গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপ মহা দুর্ভিক্ষের সময়ে, এক সুন্দরকান্তি পঞ্চবিংশবর্ষীয় যুবক, তাহার পীড়িত মাতার জন্য বহুকষ্টে অর্দ্ধ পোয়া গোধূমচূর্ণ সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে দুইখানি রুটী প্রস্তুত করিল। অনাহার-ক্লিষ্টা বৃদ্ধা মাতার নিকটে আসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"চেয়ে দেখ মা! আজ তোমার জন্য কি আনিয়াছি?"

বৃদ্ধা বলিল—"কি আনিয়াছিস্ বাবা! এ দুর্দ্দিনে রুটী দুখানি কোথায় পাইলি? বাবা! তুই যে দুই দিন পেট ভরিয়া খাইতে পা'স্ নাই। আমার তিলমাত্র ক্ষুধা নাই—তুই ঐগুলি খা।"

"আমি বজরায় রোটি খাইয়াছি, এখানি তোমার। মা! তোমার যে একমাসকাল রোগের পথ্য জুটে নাই।"

যুবক কিরণসিংহ, রুটী দুখানি চারি খণ্ড করিয়া, তাহার তিন ভাগ মাতার জন্য রাখিল। এক ভাগ তাঁহাকে তখনই খাওয়াইল। আর এক ভাগ লইয়া সে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মাতাকে বলিল—"এ ভাগটী কার বল দেখি মা?"

"তা ত জানি না—বাবা! কার বল দেখি?"

"কেন—মা, যে তোমাকে নিজের শরীরের রক্ত দিয়া এতদিন পোষণ করিতেছে—যে তোমাকে এই ভীষণ রোগে, এই অকাল মম্বন্তরের দিনেও আহার দিয়া জীবিত রাখিয়াছে—যাহার জন্য আজও আমি তোমার সেবা করিতে পাইতেছি, মা বলিয়া ডাকিতে পারিতেছি, এখানি তাহাকেই দিব।"

কুঞ্চিত সুকৃষ্ণ কেশগুলি দোলাইতে দোলাইতে, দুই মুঠার ভিতর সেই টুকরা রুটীখানি সযত্নে লইয়া, কিশোর-যৌবন-সন্ধিগত—কিরণ-সিংহ, প্রাঙ্গণের এক দিকে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। কয়েক হস্ত দূরে, এক ক্ষুদ্র মৃৎ-কুটীরের আগড় ঠেলিবামাত্র তাহার মধ্য হইতে করুণস্বরে কোন জীব ডাকিয়া উঠিল—"মা—মা"।

যুবক বলিল—"হাঁরে কল্যাণি! আমি কি তোর মা!"

সেই বাক্‌হীন পশু যেন সে কথা বুঝিতে পারিয়া, মহানন্দে লাফাইয়া উঠিল। কিরণ তাহার বদ্ধমুষ্টি সেই বাক্‌হীন পশুর মুখের কাছে, ভূমির উপর মুক্ত করিয়া দিল। আর সেই বন্যছাগী, মহানন্দে লাফাইতে লাফাইতে, মাথা নাড়িতে নাড়িতে, একটু একটু করিয়া সেই রুটীর টুকরাটুকু শেষ করিল। কিরণসিংহ একটী মৃৎপাত্রে স্বল্প পরিমাণ জল লইয়া তাহার সম্মুখে ধরিল। তৃষ্ণার্ত অবোধ জীব—

তাহা এক নিশ্বাসে পান করিয়া, কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া, আবার একবার অস্ফুটস্বরে আনন্দধ্বনি করিল। কিরণ, কুটীরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, স্নেহ-বিপ্লুত-স্বরে বলিল—

"কল্যাণি! আজ তুই এই ভাবেই থাক্, কাল জোটে ত খাইবি। দেশে ঘাস নাই, কূয়ায় জল নাই। তোকে প্রাণ ভরিয়া ঘাস জল খাওয়াইতে পারিলাম না—এই বড় কষ্ট। কিন্তু কাল তুই আমায় একটু বেশী দুধ দিস্। মার জন্য এক টুক্‌রা রুটি রাখিয়াছি। তাঁহাকে দুধ-রুটী খাওয়াইব।" সরল-হৃদয় কিরণ ভাবিয়াছিল, দুধ দেওয়াটা কল্যাণীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সবে মাত্র আগড়টী বন্ধ করিয়া, কিরণসিংহ উঠানে নামিয়াছে, এমন সময়ে বাহিরে অস্ত্র-ঝঞ্চনা ও বাহিরের দ্বারের কাছে চার পাঁচ জন লোকের পদধ্বনি হইল। সেই জীর্ণ-দেহ, কাষ্ঠময় দ্বারের উপর দমাদম্ ঘা পড়িতে লাগিল। বাহির হইতে একজন পরুষকণ্ঠে বলিল—"কিরণসিংহ! দোয়ার খোল!"

কিরণসিংহ ধীরে ধীরে দ্বারের নিকট আসিল। দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল, বাহিরে দুর্জ্জনসিংহের দুর্দ্দান্ত সিপাহীগণ। সে বুঝিতেই পারিল না—দুর্গাধিপতির সিপাহীরা তাহার দ্বার ভাঙ্গিবার চেষ্টা

করিতেছে কেন? কিরণ ধীরে ধীরে বলিল—"স্থির হও ভাই! দ্বার খুলিতেছি। দ্বারটা খামকা যে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে! কে হে তোমরা?"

"তোমার যম! খোল, শীঘ্র দ্বার খোল।" ইহার পর দরজায় আবার দমাদম্ ঘা পড়িতে লাগিল।

যুবক কিরণসিংহ ত্বরিতগতিতে দ্বার খুলিয়া দিল। দিবামাত্রই একজন সৈনিক কঠোরভাবে তাহার সঙ্গীকে বলিল—"কই! কে তোমার কিরণসিংহ—আমাকে দেখাইয়া দাও।"

কিরণসিংহ দেখিল, তাহার সন্দেহ অমূলক নহে। সেনাদের সকলেই দুর্গাধিপতি দুর্জ্জনসিংহের লোক। কেবল একজন তাহার প্রতিবেশী। সে দুর্জ্জনসিংহের অধীনস্থ একজন নব-নিযুক্ত তহশীল-দার। সেই দেখাইয়া দিল—"এই সেই নরপিশাচ কিরণসিংহ।"

একজন রক্ষী পরুষস্বরে বলিল—"কিরণ! তুমি আমাদের বন্দী।"

"বন্দী? কেন আমি কি করিয়াছি? কি অপরাধে আমি বন্দী হইতেছি?"

"তোমার নিকট আমরা তাহার কৈফিয়ৎ দিতে চাহি না। দুর্গাধিপতির আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, তুমি রাজ-বিদ্রোহী হইয়াছ। এরূপ বিদ্রোহের পরিণাম জীবন-নাশ। দুর্গাধিপতি দুর্জ্জনসিংহের নিকট তোমার অপরাধের বিচার হইবে।"

অপরাধটা যে কি—কিরণ তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। অথচ শুনিল, তাহার অপরাধটা অতি গুরুতর। তাহার মত সুশীল, মাতৃভক্ত, পবিত্রচেতা যুবক, দুষ্কর্ম্ম কাহাকে বলে, এ পর্য্যন্ত তাহা জানিত না। সেই কিশোরবয়সে "বিদ্রোহ" কথাটা, সে অভিধানের বহিতেই কেবলমাত্র দেখিয়াছিল।

কিরণ মনে মনে ভাবিল—ইহারা হয়ত আমায় ভ্রমক্রমে

ধরিয়াছে। দুর্গাধিপতির সম্মুখে সে নিশ্চয়ই তাহাদের ভ্রমভঞ্জন করিয়া দিবে। এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া, সে, নীরস হাস্যের সহিত, সেই প্রহরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"বেশ কথা! আমি স্বেচ্ছায় তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একবার আমার পীড়িতা জননীকে, দুটা কথা বলিয়া আসিতে দাও।"

সেই সৈনিক পরুষকণ্ঠে বলিল,—"ও সব আবদার এখন চলিতেছে না। এখনই বিনা বাক্যব্যয়ে, আমাদের সঙ্গে এস"। এই কথা বলিয়া ধাক্কা দিয়া, সেই নিষ্ঠুর সৈনিকগণ কিরণসিংহকে দুর্গের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—*—

কিরণসিংহের এই ব্যাপারে, তখনই পল্লীব্যাপী একটা মহান্দোলন উপস্থিত হইল। সকলেরই মুখে এক কথা—"কালে কালে হইল কি?" সকলেই শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া বলিতে লাগিল—"হা কিরণসিংহ! হা মাতৃভক্ত সন্তান! তোমার অদৃষ্টেও এত লাঞ্ছনা।"

বিনা বিচারে, হতভাগ্য যুবক কিরণসিংহ, দুর্গাধিপতি দুর্জ্জনসিংহের অন্ধতমসাবৃত কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত হইল? এ কি অত্যাচার! কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা! কিরণ উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া বলিল—"ভগবন্! দয়াময়! আমার নিজের জন্য, আমি তিলমাত্র কাতর নই। কিন্তু যে রুগ্নমাতা, আমা বই জানে না, যে একদণ্ড আমার অদর্শন-

কষ্ট সহিতে পারে না, যে রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া কণ্ঠাগতপ্রাণা, সে যে আজ সমস্ত রাত ধরিয়া ছট্‌ফট্‌ করিবে। ভগবন্‌! আজ রাত্রের মত তুমিই তাহাকে দেখিও।”

পরদিন প্রভাতে—দুর্গাধিপতি দুর্জ্জনসিংহ বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলেন। দলে দলে, স্বপক্ষ ও বিপক্ষ ভূমিয়ারা, দুর্গাধিপতির বিচার দেখিতে আসিয়াছে। অপরাধও অজ্ঞাত, অপরাধীও দেবচরিত্র। বিচারটা কি হয়, দেখিবার জন্য অনেকেই একটা অতিরিক্ত ঔৎসুক্য-বশে সেই প্রস্তর-প্রাকার-বেষ্টিত দুর্গের অপ্রশস্ত দালানে আসিয়া জমিয়াছে।

দুর্গাধিপতির সম্মুখে, কিরণসিংহ অবনতমুখে বন্দীভাবে দণ্ডায়মান।

দুর্গের নিকটস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, বধমঞ্চের উচ্চ শিখরোপরি মৃত্যুচিহ্নস্বরূপ এক কৃষ্ণ-পতাকা, মৃদুবায়ুভরে উড্ডীয়মান। উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে—কিরণ একবার মাত্র সেই বধমঞ্চের দিকে দৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেই তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিয়াছে। সে নিজের জন্য তত চিন্তিত নহে। সে মরিলে তাহার আশ্রয়হীনা, রক্ষকহীনা অভাগিনী জননীর কি হইবে, তাই ভাবিয়া সে আকুল।

দুর্গাধিপতি—সভার নিস্তব্ধ অবস্থা নিজেই ভাঙ্গিয়া দিলেন। তিনি গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—“যুবক! তোমারই নাম কিরণসিংহ?”

“হাঁ—মহারাজ!”

“জান—তুমি রাজদ্বারে গুরুতর অপরাধে অপরাধী!”

“তাহাই ত শুনিতেছি রাজা!”

“তোমার অপরাধ কি তা জান?”

“আগে জানিতাম না—সম্প্রতি কারারক্ষকের নিকটে জানিয়াছি।”

“তুমি আমার ঘোষণা অমান্য করিয়াছ। রাজাদেশ লঙ্ঘনে,

বিদ্রোহ—বিদ্রোহীর পরিণাম—প্রাণদণ্ড। দাম্ভিক যুবক! তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।" ঐ দেখ তোমার জন্য বধমঞ্চ প্রস্তুত। ঐ কৃষ্ণ-পতাকা-শোভিত বধমঞ্চই, তোমার পরলোকগমনে সহায়তা করিবে।"

"এ কল্পিত অপরাধের পরিণাম যদি মৃত্যুই হয়, তাহা হইলে আমি, তজ্জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু আমার মা—"

যুবক আর বলিতে পারিল না। তাহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। সেই অশ্রুধারায়, তাহার শুভ্র গাত্রবস্ত্র ও বিশাল-বক্ষ প্লাবিত হইল।

দুর্গাধিপতি বলিলেন—"তোমার মার কি হইয়াছে?"

কিরণ অশ্রুপ্লুত-নেত্রে বলিল—"আমার মা কঠোর রোগে পীড়িতা। এক মাস ধরিয়া পথ্যাভাবে, দুর্ব্বল ও অনাহারে জর্জ্জরিতা; তাঁহাকে কে দেখিবে মহারাজ!"

দুর্গাধিপ কঠোর-স্বরে বলিলেন—"কিন্তু তাহা বলিয়া তোমার অপরাধ মার্জ্জনা হইতে পারে না। তুমি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ। এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ-সময়ে, যে রুটি মানুষে না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইতেছে, যাহার মুখ আমি নিজে অনেক সময় দেখিতে পাই না, সেই বহুমূল্য গোধূম-পিষ্টক তুমি কি না—একটা সামান্য ছাগীকে খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত হইলে?"

যুবক রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"দুর্গাধিপতি! আমার নিজের জীবনের অপেক্ষাও যে সেই অবোধ পশু আমার প্রিয়! সেই ছাগী; দুগ্ধ দিয়া যে এ পর্য্যন্ত আমার রুগ্না ও বিশীর্ণকায়া জননীর জীবন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। সে না থাকিলে, অনাহারে আমার মা হয়ত এতদিনে মরিয়া যাইতেন। দেশ জ্বলিয়া গিয়াছে—মাঠে ঘাস নাই, ইন্দারায় জল নাই,—কিন্তু এই কৃতজ্ঞ জ্ঞানহীন পশু, ঘাস জল না খাইয়াও

আমার মাকে দুধ যোগাইয়াছে। মাতৃসেবার প্রধান সহায় ভাবিয়া, আমি তাহাকে সামান্য একখণ্ড রুটী দিয়াছি, ইহা কি এতই গুরুতর অপরাধ? নিজের উদর-সেবায় নষ্ট না করিয়া তাহা তাহাকে কৃতজ্ঞতার ও দয়ার উপহাররূপে দিয়াছি। রাজা! এ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা এ ধর্ম্মাচরণ, কি রাজ-বিদ্রোহিতা!"

দুর্জ্জনসিংহ বলিল—"যুবক! আমি পাষাণ নহি। সদ্‌গুণের আদর করিতে আমি জানি, কিন্তু আমার আদেশের একটুও এঁদিক ওদিক করিতে জানি না। জানি আমি—তুমি স্বেচ্ছায় এ আদেশ লঙ্ঘন কর নাই। কিন্তু কি করিব, তোমায় আমি মার্জ্জনা করিতে পারি না। আমি আইনের দাস। আমার নিজের আদেশ যদি আমি নিজেই না বলবৎ রাখি, তাহা হইলে আমার অধীনস্থগণ কি মনে করিবে? যুবক! আমার আদেশে তোমার প্রাণদণ্ড—"

কথাটা শেষ হইল না। দুর্গদ্বারে তখনই একটা ভয়ানক কোলাহল জাগিয়া উঠিল। ভিড় ঠেলিয়া, জন কতক লোক, সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল। ধরাধরি করিয়া তাহারা কি একটা রক্তাপ্লুত জিনিস সেই সভার মাঝখানে, দমাস্ করিয়া ফেলিয়া দিল।

সকলে সভয়ে, বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—একটী ছিন্নশির বৃহদাকার ছাগী-দেহ। কিন্তু কেহই এ নৃশংস ব্যাপারের অর্থ কিছুই বুঝিল না। আর কিরণসিংহ, ইহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সহসা একবার চীৎকার করিয়া থামিয়া গেল। নীরবে তাহার নেত্র দিয়া, দরদর-বেগে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। সে শোকমুগ্ধ হইয়া নির্ব্বাক্ রহিল।

দুর্গাধিপতি বুঝিলেন, তাঁহার সিপাহীদের হস্তে কিরণসিংহেরই ছাগী নিহত হইয়াছে। তিনি রহস্য করিয়া তাহাকে কি বলিতে যাইতেছেন—এই সময় বাহিরে পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতর আরও একটা

কোলাহল জাগিয়া উঠিল। সেই কোলাহলের মধ্যে "জয় মহারাজ সুজনসিংহ কি জয়" এই কথা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুর্গাধিপতি চমকিয়া উঠিয়া, সিংহাসন ছাড়িয়া, বাতায়নপথে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন—পূর্ব্ব-দুর্গাধিপতি সুজনসিংহের নেতৃত্বে, বিপক্ষ সেনাদল দলে দলে, দুর্গে প্রবেশ করিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুজনসিংহের কতক সৈন্য তখন দুর্গপ্রবেশ করিয়াছে। উপায়-বিহীন দুর্জ্জনসিংহ, ত্বরিতগতিতে দুর্গের জল-প্রণালী উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, বাহিরের সৈন্যসমাগম বন্ধ করিয়া দিলেন।

সুজনসিংহ, অসমসাহসে ভর করিয়া সসৈন্যে সন্তরণ দিয়া দুর্গপ্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু পরিখা-পার্শ্ব হইতে দুর্জ্জনের সৈন্যগণ তাঁহাদের উপর অস্ত্র চালাইতে লাগিল। সুজন-সিংহের অনেক সৈন্য আহত হইয়া ভূমিশায়ী হইল।

সুজনসিংহ, এই ব্যাপারে মহাপ্রমাদ গণিলেন। সহসা উন্মত্তভাবে অসি সঞ্চালন করিতে করিতে, যুবক কিরণসিংহ বজ্রনির্ঘোষে কহিল, "অগ্রসর হও—ফিরিলেই এখনি মৃত্যু!"

এইবার দুর্জ্জনের সৈন্যদিগের মধ্যে একটা আতঙ্ক পড়িয়া গেল, তাহাদের কেহ কেহ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সহসা স্তম্ভিতভাবে রহিল—কেহ বা অস্ত্র ধরিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। অবসর পাইয়া সুজনসিংহ, পরপারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ ও বিশ্বাসী সৈন্যগণের

অনেকে উপরে উঠিয়া দুর্জ্জনসিংহের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। সুজনসিংহ, দুর্জ্জনসিংহের অন্বেষণে ধাবিত হইলেন।

কিরণসিংহ, অস্ত্র চালাইতে চালাইতে তাঁহার সহগামীগণকে ভীমস্বরে বলিলেন—"ক্ষুধাতুর! জীর্ণ শীর্ণ পীড়িত প্রজাদল! তোমরা এ দুর্গ দখল কর, আবার বল—"সুজনসিংহের জয়।"

সুজনের প্রভুভক্ত সেনারা, নবোৎসাহে সানন্দে হুঙ্কার করিল—"জয় সুজনসিংহের জয়।"

আরও এক আশ্চর্য্য ঘটনা! দেখিতে দেখিতে দুর্জ্জনের সমস্ত সেনা সুজনের পক্ষ গ্রহণ করিল। এই অসম্ভব ঘটনায়, দুর্জ্জন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। কিরণসিংহের সাহায্যে, দুর্গ পুনরায় পূর্ব্ব-দুর্গাধিকারী সুজনসিংহের অধিকারগত হইল।

দুর্জ্জনসিংহ যদি অত্যাচারী না হইত, তাহা হইলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্গাধিপতি রাজা সুজনসিংহ, এত সহজে তাঁহার কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতেন না। দুর্জ্জনের সেনারা, প্রভুর নিমক খাইত বটে, কিন্তু তাহার রূঢ়-ব্যবহারে, তাহারা মনে মনে তাহার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট ছিল। দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রকোপের সময়, দুর্জ্জনসিংহ তাহাদিগকে বেতনস্বরূপ একটী পয়সাও দেয় নাই। তাহারা দুর্গাধিপের সামান্য প্রজা। তাহাদেরও স্ত্রীপুত্র ঘরসংসার ছিল, একপক্ষে এদিকে যেমন বেতন নাই, আবার বাজারে শস্যও নাই। কারণ অর্থগৃধ্নু দুরাচার দুর্জ্জনসিংহ, বাজারের সমস্ত শস্য কিনিয়া লইয়া, উচ্চমূল্যে প্রজাদেরই বিক্রয় করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতেছিল। গোলায় বা গঞ্জে শস্য-কণামাত্র ছিল না। এজন্য সাধারণ প্রজারও যেরূপ অনাহারে মৃত্যু, রাজার নফর হইয়া তাহাদেরও তাই!

তাহা ছাড়া—তাহাদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে পূর্ব্ব-দুর্গাধি-

কারী সুজনসিংহের অনুরাগী ছিল। সুজনসিংহের সদয় ব্যবহার, পুত্রোপম অনাবিল স্নেহ, নির্ম্মৎসরতা, সরলতা, অমায়িকতা, তাহারা ভুলে নাই। কেবল পেটের দায়ে, আর দুর্জ্জনের শাসনের ভয়ে, তাহারা এই নরপশু দুর্গাধিপতির চাকরী স্বীকার করিয়াছিল। যখন তাহারা দেখিল, অত্যাচারী পাষণ্ডের দারুণ অত্যাচারে সমস্ত গ্রাম্য-প্রজাদল বিদ্রোহী হইয়াছে—পূর্ব্ব-দুর্গাধিপতি সুজনসিংহের সূর্য্যচিহ্নিত পতাকার অনুসারী হইয়া দুর্গ জয় করিতে আসিয়াছে, তখন তাহারাও পূর্ব্ব-প্রভুর সহায়তায় মনস্থির করিল। তাই কিরণসিংহ অত সহজে দুর্গ জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

কিরণসিংহ ও সুজনসিংহ উভয়েই যখন দেখিলেন—সেনারা নূতন দুর্গাধিপতির অন্নে শরীর পুষ্ট করিয়াও, পরিখার পরপারে কোনরূপ বিশেষ বাধা দিতেছে না, বা ততটা মন দিয়া যুদ্ধ করিতেছে না—তখন তাঁহারা অতি সহজেই বুঝিলেন—ব্যাপারটা তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্পূর্ণ অনুকূল। কাজেই বিনা বাধায়, অতি সহজে তাঁহারা অগভীর জলপ্লাবিত দুর্গপরিখা পার হইলেন।

পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনসিংহ যখন দেখিল—তাহার সেনারা যুদ্ধকার্য্যে আর তত উৎসাহী নহে, সম্মুখে শত্রু পাইয়াও তাহাদের কৃপাণ কোষ-বিমুক্ত করে নাই, তখন সে মরিয়া হইয়া উঠিল। তাহার সেনাবৃন্দ, বিশ্বাসঘাতক ও নিমকের অমর্য্যাদাকারী বুঝিয়া, পাপিষ্ঠ যুদ্ধ না করিয়া আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইল। সে বুঝিল, এ ক্ষেত্রে পলায়নই শ্রেয়ঃ! অতি অত্যাচারী—যে, সে প্রায়ই অতি কাপুরুষ হয়। হতভাগ্য দুর্জ্জনসিংহ পলাইতে গিয়াও পলাইতে পারিল না।

দুর্জ্জনসিংহ যখন দেখিল, অসংখ্য অরাতিসৈন্য সলিল-স্রোতঃপ্লাবিত পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া, দুর্গমধ্যস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সমাগত হইয়াছে,

তখন সে উন্মাদের ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দুর্গের গুপ্তগৃহে যাহা কিছু বহুমূল্য মণিমুক্তাদি ছিল, তাহা সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে পাপিষ্ঠ যেমন অগ্রসর হইতেছে—অমনি দেখিল, সম্মুখে দেবীনিন্দিত এক অপ্সরকান্তি স্বর্ণপ্রতিমা!

দুর্জ্জনসিংহ কাতরকণ্ঠে বলিল—"মদালসা! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত। তোমার উপর, এই ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর, আমার মুখপ্রেক্ষী প্রজাপুঞ্জের উপর, আমি এতদিন যে অত্যাচার করিয়াছি, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তোমার পিতা—আর সেই কিরণসিংহ, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। অদ্য প্রভাতে এ দুর্গ আমার ছিল—কিন্তু এই মধ্যাহ্নে তাহা আমার হস্তচ্যুত হইয়াছে।"

সেই দেবীপ্রতিমা—দুর্জ্জনসিংহের এ কাতরোক্তিতে একটুও টলিল না। স্থিরভাবে বলিল—"দুর্জ্জন! এতদিন তুমি বুঝিতে পার নাই, মানুষের শক্তি কিছু নয়। উপরে এক মহাশক্তিমান আছেন, তাঁহার বিরাটশক্তির তুলনায়—মানুষ তৃণবৎ লঘু। লোভ, উচ্চাশা, পরশ্রীকাতরতা, আর পাপপ্রবৃত্তি, আজ তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটাইল। অযথা অনুষ্ঠিত পাপ-কার্য্যসমূহ হইতে, তোমার অধঃপতন হইল। আমায় তুমি কতই না কষ্ট দিয়াছ? কিন্তু তবুও আমি তোমার বিপদ দেখিয়া মার্জ্জনা করিতেছি। কিন্তু জানিও, পলায়ন করিলেও তোমার নিস্তার নাই। আমার পিতা তোমায় মার্জ্জনা করিতে পারেন, কিন্তু তোমার বিদ্রোহী-প্রজাগণ তোমাকে ক্ষমা করিবে না"।

সহসা বিজয়ী সেনাগণের "জয় মহারাজা সুজনসিংহের জয়"—এই ভীষণনাদ, বজ্রনির্ঘোষবৎ পলায়ন-পরায়ণ কাপুরুষ দুর্গাধিপতি দুর্জ্জনসিংহের কর্ণে প্রবেশ করিল। সে পাপিষ্ঠ, এই বজ্রনাদী

জয়-কোলাহলে মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল। সে কাতরকণ্ঠে বলিল— "মদালসা! তোমার জন্যই আমার এ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তোমায় যদি মহেশ্বর-মন্দিরে না দেখিতাম, তাহা হইলে আজ আমাকে এ দুর্গ ত্যাগ করিতে হইত না। যখন আমি তোমার হস্তপ্রার্থীরূপে ছয় মাস পূর্ব্বে, এই প্রাসাদের মধ্যে তোমার পিতার নিকট উপস্থিত হই, তখন তিনি আমায় "মেষপালকের পুত্রের সঙ্গে, ভূমিয়াদিগের অধীশ্বর; রাজা সুজনসিংহের কন্যার বিবাহ হইতে পারে না" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সেই অপমানে উত্তেজিত হইয়াই, আমি সেনা-সংগ্রহ করিয়া প্রতিহিংসাবশে এই দুর্গ দখল করি। ছয়মাস তোমায় অবরুদ্ধ রাখিয়াছি, কিন্তু সত্য বল দেখি—মদালসা! আমি তোমায় বন্দী করিয়াও রাজরানণীর মত আদরে ও স্বাধীনতায় রাখিয়াছি কি না?"

মদালসা কোন উত্তর করিল না। নতমুখে কি ভাবিতে লাগিল।

দুর্জ্জনসিংহ বলিল—"আর সময় নাই। আমি এখন পলায়ন করিতেছি। গুপ্তপথে আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য অশ্ব সজ্জিত রাখিয়াছে। তুমি আমার সঙ্গে এস।"

মদালসা মরালগ্রীবা উন্নত করিয়া বলিল—"পাপিষ্ঠ! পাপমুখে একথা বলিতেও তোমার সাহস হইল! তোমার সম্মুখে মৃত্যু—তবুও তুমি দারুণ পাপে অগ্রসর! ভগবান্! এখনও তোমার সুমতি দিন। তুমি স্বেচ্ছায় নরকপথে নামিও না।"

দুর্জ্জনের আর বিলম্ব সহে না। বহিঃপ্রাঙ্গণের সেনা-কোলাহল ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। দুর্জ্জনসিংহ চরিত্রবান্ ছিল না, বিবাহও করে নাই। তাহার অন্তঃপুরে অন্তঃপুরিকারূপিণী বিলাসদাসীরূপে যাহারা এতদিন রাজত্ব করিতেছিল, তাহারা ইতিপূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে। সেই অন্তঃপুরে কেবল মদালসা ও দুর্জ্জনসিংহ একা।

পাপিষ্ঠের মনে, মদালসার সেই উন্নত-গ্রীবাভঙ্গী, আরক্তিম-গণ্ডরাগ, সংসর্পিত, এলায়িত, পৃষ্ঠ-বিলম্বিত, সুকৃষ্ণ কেশরাশি, উজ্জল কৃষ্ণ-তারকাময় বিশাল নেত্র, সে সময়েও ঘোর বিলাস-বাসনা আনিয়া দিল।

দুর্জ্জনসিংহ মনে মনে ভাবিল—এইবার জীবনের শেষ পাপ করিব—যাহার জন্য এত কাণ্ড করিলাম, যাহার অপ্সরোপম সৌন্দর্য্য আমার হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর অধিকার করিয়া আছে—তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। সব যাক্—কিছুই চাহি না। চাই—এই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা—মদালসা। কিন্তু এতো সহজে যাইবে না। সুতরাং ইহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাওয়াই একমাত্র উপায়। অনুনয়ে বিনয়ে, এ গর্ব্বিতা পাষাণী রমণীর করুণালাভ অসম্ভব। যদি ইহার এ তেজ, এ দর্পচূর্ণ করিতে পারি—তাহা হইলে আমার প্রতিহিংসা-বৃত্তি কতক চরিতার্থ হইতে পারে। দেবশক্তি আমার নাই, সুতরাং শয়তানের শক্তিতে ইহাকে আয়ত্ত করিব।

দুর্জ্জন, ভীমমূর্ত্তিতে মদালসার পুষ্পকোমল হস্তধারণ করিল। সেই অপবিত্র স্পর্শে, তাহার সমগ্র দেহবল্লরী শিহরিয়া উঠিল। সুন্দরী মদালসা, সবলে হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া, দুর্জ্জনকে পদাঘাত করিলেন।

পাপিষ্ঠ নরকুলকলঙ্ক দুর্জ্জনসিংহ, ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতান্তের ন্যায়, পিশাচের ন্যায়, মদালসার কুঞ্চিত কেশরাশি ধরিল। নির্ম্মম রাক্ষসের ন্যায় তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সে তখন আকাঙ্ক্ষার উত্তেজনায়, অপমানে, মনস্তাপে উন্মাদবৎ হইয়াছে। তাহার নেত্রদ্বয়ে নিষ্ফল-শিকার ব্যাঘ্রের ন্যায় আগুন জ্বলিতেছে—নিশ্বাস হইতে বজ্র-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে!

দশানন অনেক পাপ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার শেষ পাপ

লক্ষ্মীরূপিণী সীতাহরণ। ইহাতেই তাহার দশাননত্ব-লোপ। দুর্জ্জন-সিংহও অনেক পাপ করিয়াছিল; কিন্তু মদালসার পবিত্র অঙ্গে হস্তার্পণই তাহার শেষ পাপ, আর তাহাতেই তাহার সর্ব্বনাশ হইল। সতীর অঙ্গস্পর্শে যে ভীষণ কালানল জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে সে পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হইল।

আত্ম-রক্ষার জন্য মদালসা, তাহার বক্ষ-বস্ত্র মধ্যে সর্ব্বদা এক-খানি ক্ষুদ্র শাণিত ছুরিকা লুকাইয়া রাখিত। সেই শক্তিময়ী রাজপুত-বালার শরীরে, মহাশক্তির তেজোরাশি সঞ্চারিত হইল। মদালসা সবলে দুর্জ্জনসিংহের কবল হইতে মুক্ত হইয়া বক্ষমধ্য হইতে সেই ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল—"সাবধান শয়তান! এক পা অগ্রসর হইবি—ত এই ছুরিকা দ্বারা তোর ঐ পাপহৃদয় ভেদ করিব।"

মদালসা, তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎবেগে নিকটস্থ এক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা অর্গলাবদ্ধ করিল। দুর্জ্জনসিংহ যখন দেখিল, যে শিকার তাহার হাত ছাড়া হইয়াছে, তখন সে যেন উন্মাদের মত হইল। সবলে সেই কক্ষদ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল।

মহাশক্তিরূপিণী জগদম্বিকে মা ভবানী, তখন মদালসার উপর সদয় হইলেন। কার সাধ্য সতীর অঙ্গ স্পর্শ করে?

সহসা বাহিরের সৈনিকদের, দ্রুতবেগে অন্তঃপুর-প্রবেশ-পদশব্দ শ্রুত হইল। সাত আট জন সেনানী, উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে আসিয়া, সেই দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। দুর্জ্জনসিংহের আর পলাইবার পথ রহিল না। এই ক্ষুদ্র সেনাদলের অধিনায়ক কিরণসিংহ।

কিরণসিংহ—ঘৃণার সহিত দুর্জ্জনকে বলিলেন—"নরাধম! শয়তান! তোকে জীবন ফিরাইয়া দিতেছি—বল! দুর্গাধিপতির কন্যা কোথায়। কোন্ কক্ষে তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিস্?

পাপিষ্ঠ অম্লানবদনে বিকটহাস্য করিয়া বলিল—"হা! হা! মদালসা! সে ত মরিয়াছে। আমি তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছি।"

"বটে রে শয়তান! এত পাপের উপর আবার নারীহত্যা! মৃত্যু তোর সম্মুখে! আত্মরক্ষা কর্"—এই বলিয়া কিরণসিংহ তীব্র-বেগে দুর্জ্জনসিংহের গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া তাহাকে ভূপাতিত করিলেন। এই সময়ে তাহার অনুগামী সৈন্যগণ সেই পাপিষ্ঠকে বন্দী করিল।

কিরণসিংহ, দুর্গাধিপতি সুজনসিংহের রূপসী কন্যা, মদালসাকে কখনও চক্ষেও দেখেন নাই। সম্ভাবনাও ছিল না। মদালসা রাজ-অন্তঃপুরে, সুখের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা। কিরণ—দীন দরিদ্র। মদালসার পিতা সুজনসিংহ কেবল তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন—"বৎস! আমার কন্যাকে উদ্ধার করিও। সে অন্তঃপুরের মধ্যে, শয়তান দুর্জ্জনসিংহের বন্দী। আমি এ দুর্গের ও রাজ্যের পরিবর্ত্তে, আমার স্নেহময়ী-কন্যাকে ফিরিয়া পাইলেই সুখী হইব।"

মদালসা—গৃহমধ্য হইতে সমস্ত ঘটনাই দেখিতেছিল। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, সে ধীরগতিতে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

কিরণসিংহ সবিস্ময়ে দেখিলেন—যেন সেই গৃহকক্ষ হইতে কোন উজ্জ্বলমূর্ত্তি অপ্সরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছে। কিরণ নম্রভাবে বলিলেন—"দেবি! আমরা যাঁহাকে খুঁজিতেছি, আপনি কি সেই মদালসা! দুর্গাধিপতির প্রিয়তমা কন্যা!"

মদালসা, সানন্দে বলিল—"ভদ্র! আপনার অনুমান সত্য।"

মদালসা কিরণসিংহের সারল্যমণ্ডিত দেবোপম সুন্দর কান্তি, সরলতাপূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া, মনে মনে ভাবিল—"হায়! সৃষ্টিকর্ত্তা ত

একই! তবে তাঁহার সৃষ্ট মানব—কেহবা পশু, কেহবা মানুষ হয় কেন? কেহবা দেবতা, কেহবা পিশাচ হয় কেন? কেহবা সুরূপ, কেহবা কুরূপ হয় কেন? হায়! কেন এ যুবকের রূপরাশি দেখিলাম? ছয় মাস এই পাপিষ্ঠের বন্দী হইয়া আছি, কিন্তু একদিনও ত সেই নরাধমের মুখের দিকে চাহিয়া দেখি নাই।”

কিরণসিংহের বিলম্ব দেখিয়া, সুজনসিংহ দুর্গান্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। মদালসা ছুটিয়া আসিয়া, পিতার বক্ষলগ্না হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সুজনসিংহ তাঁহার একমাত্র মাতৃহীনা কন্যাকে দীর্ঘকাল পরে কোলে পাইয়া, সকল জ্বালা ভুলিলেন। সস্নেহে বলিলেন—“মা আমার! আমি আজ ছয় মাস কাল কেবল তোমার উদ্ধারের জন্য সেনা-সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছি। এ পাপিষ্ঠকে দুর্গাধিকার হইতে বিচ্যুত না করিলেও আমার ক্ষোভের কারণ হইত না। তোমায় ফিরিয়া পাইলে আমি পর্ণকুটীরে বাস করিয়াও সুখী হইতাম।”

আর সুজনসিংহ কেবল দুর্গ নহে—তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা মদালসাকে ফিরিয়া পাইয়া বড়ই প্রহর্ষচিত্ত। সবই ত এই কিরণ-সিংহের বাহুবলে হইল! দুর্গাধিপতি কিরণসিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“বৎস! তোমার ঋণ আমি শোধ করিতে পারিব না। বর্ত্তমানে আমার কতকগুলি গভীর কর্ত্তব্য আছে।”

এই কথা বলিয়া দুর্জ্জনসিংহ যে সব নিরীহ প্রজাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, সুজনসিংহ কারাগার খুলিয়া স্বহস্তে তাহাদের মুক্তিদান করিলেন। কন্যা মদালসা, বহুদিন হইতে দুর্জ্জনসিংহের অন্তঃপুরে বন্দিনী। অবস্থাবৈগুণ্যে, সুজনসিংহ এতদিন কন্যার উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। তবে মদালসা যে কিছুতেই দুর্জ্জনসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিবে না, তাহা তাঁহার

বিশ্বাস ছিল। এজন্য ব্যস্ত হইয়া, তিনি কিরণসিংহকে সর্ব্বাগ্রে মদালসার উদ্ধারের জন্য দুর্গমধ্যে পাঠাইয়া দেন।

সুজনসিংহ কিরণকে দেখাইয়া মদালসাকে বলিলেন—"এই সাহসী রাজপুত যুবক আজ তোমার উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন। কেবল আমি নয় মা! তুমিও কিরণসিংহের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। কিরণের উপর এই পাপিষ্ঠ অত্যাচার না করিলে, প্রজারা বোধ হয় এত শীঘ্র বিদ্রোহী হইত না। আবার কিরণসিংহ আমার সহায় না হইলে, আজ এ দুর্গজয় ও তোমাকে ফিরিয়া পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।"

বন্দীভূত দুর্জ্জনসিংহ, এই সব ব্যাপার দেখিয়া মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য বিষধরের ন্যায়, ক্রোধে গর্জ্জন করিতেছিল।

সুজনসিংহ, দুর্জ্জনসিংহের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"শয়তান! এখনি এই তরবারির রুধিরপিপাসা, তোর হৃদয়ের শোণিতে চরিতার্থ করিতাম। কিন্তু তাহা না করিয়া কৃপাবশে আমি তোর পূর্ব্বকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম। কিন্তু আমার কন্যার উপর যে অত্যাচার করিয়াছিস্, এই ছয় মাস কাল আমার কন্যাকে অবরুদ্ধ রাখিয়া, তাহার সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া যে পাপ করিয়াছিস্, তাহার বিচার এই কিরণসিংহ করিবেন। আজ তুই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কুকুরের মত কারাগারে থাক্। যে দরবারে বসিয়া, তুই আজ প্রভাতে এই কিরণসিংহের বিচার করিয়াছিলি, সেই দরবারে কল্য প্রাতে সহস্র সহস্র ভূমিয়ার সম্মুখে, কিরণসিংহই তোর অপরাধের দণ্ডবিধান করিবেন।"

তখন সন্ধ্যার কালচ্ছায়া, সমস্ত পৃথিবীকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছে। দুর্জ্জনসিংহ দেখিল—তাহার অদৃষ্ট যেন এ অন্ধকারের

অপেক্ষাও অতি ভীষণ। সে বুঝিল—পরদিন প্রভাতে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু। কিরণসিংহ মার্জ্জনা করিলে, মুক্তিদান করিলেও—প্রজারা তাহাকে দেখিতে পাইলেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। পাপিষ্ঠ, ভয়ে শরপত্রবৎ কাঁপিতে লাগিল। পরিণাম-চিন্তায়, তাহার মুখ শবের ন্যায় মলিন হইল। সে কৃপাভিক্ষার উদ্দেশ্যে, মদালসার মুখের দিকে চাহিল।

মদালসা—সে পাপিষ্ঠের মনোভাব বুঝিল। পিতার পায়ে ধরিয়া তাহার প্রাণ-ভিক্ষা চাহিয়া লইল।

মদালসার অনুরোধে, সুজনসিংহ—জনকয়েক সিপাহী-পাহারা সঙ্গে দিয়া, গভীর রাত্রে তাহাকে—রাজ্যের সীমার বাহির করিয়া দিলেন। উত্তেজিত বিদ্রোহী ভূমিয়ারা জানিতেও পারিল না যে, তাহাদের শিকার, পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনসিংহ কখন কোন্ দিক্ দিয়া গুপ্তভাবে পলায়ন করিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিরণসিংহের মাতার সংবাদ আমরা অনেকক্ষণ লই নাই। যে দিন দুর্গ বিজিত হয়, তাহার পরদিন মধ্যাহ্নসময়ে, এক শিবিকা আসিয়া কিরণসিংহের কুটীর-দ্বারে থামিল। শিবিকার অগ্রপশ্চাতে দশজন অস্ত্রধারী রক্ষক; তন্মধ্য হইতে এক অনিন্দ্যসুন্দরী বাহির হইয়া, ধীরে ধীরে সেই কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল।

সেই সুন্দরীর পশ্চাতে এক সুন্দরকান্তি যুবক। পাঠক! ইহাদের

চিনিয়াছেন কি? এই রমণী আমাদের মদালসা। আর যুবক আমাদের মাতৃভক্ত কিরণসিংহ।

বাটীর প্রাঙ্গণ মধ্যে দাঁড়াইয়া, কিরণসিংহ—কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন "মা! মা! তুমি কেমন আছ?"

সম্মুখস্থ গৃহ হইতে এক বৃদ্ধা অতি ক্ষীণস্বরে বলিল—"বাবা! কিরণ! তুই কেমন আছিস্ বাপ্? ভগবান্ কি তোকে রক্ষা করিয়াছেন! আয়, আবার আমার বুকে আয়!"

কিরণ, মাতার শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিল। তাঁহার শীর্ণ গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল। এক প্রতিবেশিনী—সম্পর্কে কিরণের মাতৃস্বসা, বৃদ্ধার সেবা করিতেছিল। কিরণ, মা'র গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"কেমন আছ মা?"

বৃদ্ধা স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন—"হয়ত আর কিছুক্ষণ তোমায় দেখিতে না পাইলে মরিয়া যাইতাম। বৎস! তোমায় আবার ফিরিয়া পাইয়া—বোধ হইতেছে, যেন আরও কিছুদিন বাঁচিব।"

কিরণ সেই রুগ্নার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সকল ঘটনা বলিল। কিন্তু একটা কথা বলিতে তাহার বড় লজ্জা করিতেছিল। তবুও সে মুখ নত করিয়া বলিল—"তোমার সেবার জন্য একজন দাসী আনিয়াছি—চেয়ে দেখ মা!"

"কোথায় বাবা?"

"ঐই যে ওখানে দাঁড়াইয়া আছে!"

বৃদ্ধার দৃষ্টি, এতক্ষণ দ্বারের দিকে পড়ে নাই। কিরণের ইঙ্গিতে সেই নবাগতা সুন্দরী, মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া নিকটে আসিয়া ভক্তি-ভরে সেই বৃদ্ধার পদবন্দনা করিল।

কিরণের মাতা বলিলেন—"এ যে রাজরাজেশ্বরী বাবা! আ মরি! এত রূপ!"

কিরণের মাতৃস্বসা যিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন—"দিদি! বুঝিতে পারিতেছ না? কিরণ বিয়ে ক'রে বৌ ঘরে নিয়ে এসেছে। আহা! ঠিক যেন স্বর্ণপ্রতিমা দিদি!"

কিরণের মা বলিলেন—"কোথায় এ রত্ন কুড়াইয়া পাইলি কিরণ?"

কিরণ লজ্জারক্তিম-বদনে বলিল—"মা! দুর্গাধিপতি সুজনসিংহ আমায় এই কন্যা দান করিয়াছেন।"

কিরণের মা—সেই অনাহারক্লিষ্ট ক্ষীণশরীরে, যেন এক নূতন জীবনীশক্তি পাইলেন। সেই শক্তিতে বৃদ্ধা, কিরণের সাহায্য ব্যতীত, শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

কিরণ বলিল—"মা! আর শুনিয়াছ, সুজনসিংহ এই বিবাহের যৌতুকস্বরূপ, তাঁহার দুর্গ ও জমীদারী আমাকে দান করিয়াছেন।"

বৃদ্ধা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, ঊর্দ্ধনেত্রে একবার আকাশের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে যা না বুঝা যাইত, সেই বিশীর্ণ-গণ্ডপ্রবাহী অশ্রুজল—যেন তাহা অতি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিল। বৃদ্ধা অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"হায়! আজ যদি তিনি থাকিতেন? কিরণের বিবাহ দিয়া বৌ দেখিবেন, এ সাধ তাঁর বরাবরই ছিল!"

কিরণ বুঝিল, এই আনন্দের দিনে তাহার স্বর্গীয় পিতার কথা ভাবিয়া, সেই শীর্ণা বিধবা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।

সান্ত্বনার স্বরে কিরণ বলিল—"মা! তুমি ত বল, মরিলেও হিন্দু স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক লোপ হয় না। আমরা প্রতিদিন কি করি বা

মা করি, পিতা ত তাহা দিব্যলোকে বসিয়া দেখেন। এ ঘটনাও ত পিতা দেখিতেছেন।"

এ প্রবোধে, বৃদ্ধার হৃদয়ে অপার সান্ত্বনা আসিল। বৃদ্ধা, বধূকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন—"মা লক্ষ্মী আমার! তুমি রাজকন্যা হইয়া দরিদ্রের এ পর্ণ-কুটীরে কি করিয়া থাকিবে মা? তোমার মত অমূল্য রত্ন ত দরিদ্রের কুটীর শোভার জন্য নয় মা।"

মদালসা এ কথায় বড়ই লজ্জিতা হইয়া বলিল "মা—মা, আমি যে তোমার মেয়ে। তোমার দাসী-রূপে এ সংসারে আসিয়াছি।" সে লজ্জায় আর বলিতে পারিল না।

কিরণ প্রবুদ্ধস্বরে বলিল—"কেন ভাবিতেছ মা! তোমার পুত্র-বধূ—তুমি যেখানে যে অবস্থায় রাখিতে পার, তাহাই করিও। কিন্তু আমাদের অধিক দিন আর এ দীনাবস্থায় থাকিতে হইবে না। তোমায় লইয়া যাইবার জন্য পাল্কী ও সোয়ার আসিতেছে। রাজা সুজনসিংহ এখনই আসিয়া তোমায় লইয়া যাইবেন।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"যে দুর্গে যাইতেছ, কিরণ! সেইখানে তোমার জন্ম হয়। তোমার পিতা, সুজনসিংহের অধীনে প্রধান সেনানী ছিলেন। তিনি যুদ্ধে নিহত হইবার পর—আমি চক্রান্তকারী শত্রুদের অত্যাচারে, মনোদুঃখে দুর্গ ত্যাগ করিয়া এই সুদূর স্থানে—নিভৃতে বাস করি। সুজনসিংহ অনেক চেষ্টা করিয়াও আমায় দুর্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু আবার ঘটনাক্রমে, ভবিতব্যবশে, সুখের দিনের সেই চির-পরিচিত দুর্গে, আমাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।"

মাতাপুত্রে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সুজন-সিংহ সেই কুটীরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"কিরণসিংহ! ইনিই

তোমার মা? রোগে ইনি এত জীর্ণ হইয়াছেন, যে চিনিতে পারা যায় না।”

কিরণসিংহের মাতা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া বলিলেন— “মহারাজ! আজ আমি ধন্যা হইলাম।” তিনি বেশী আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

সুজনসিংহ প্রফুল্লমুখে বলিলেন—“ভদ্রে! কিরণসিংহকে তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছ—কিন্তু তাহা হইলেও এই যুবক আজ হইতে আমার সন্তান। তোমার স্বামী আমার যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি ভুলি নাই। আর তোমার কিরণও যাহা করিয়াছে—তাহার ঋণ অপরিশোধ্য। আমি কোন আপত্তিই শুনিতে চাহি না। দুর্গ ও এ ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য আমি আমার কন্যা-জামাতাকে দিয়াছি। তোমার সন্তানের বাহুবলার্জ্জিত দুর্গে যাইতে, এখন আর বোধ হয় তোমার কোন আপত্তি নাই।

বৃদ্ধা—কয়েক বিন্দু কৃতজ্ঞতার অশ্রুবর্ষণে, সুজনসিংহের কথার উত্তর দিল। সুজনসিংহ সানন্দমনে—জামাতা, কন্যা ও বৈবাহিকাকে সঙ্গে লইয়া—দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পুত্রবধূ মদালসার শুশ্রূষায় ও সহসা অদৃষ্ট-পরিবর্ত্তন-জনিত উল্লাস সুখে, বৃদ্ধা আবার স্বাস্থ্য ও বল পাইলেন। কিরণের দুঃখের সংসার, রাজার সংসার হইল।

একদিন শুভবাসরে, শুভদিনে, এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে, সেই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যদুর্গ—প্রকোষ্ঠগুলি আলোকমালায় উজ্জ্বলিত হইল। জ্ঞাতি কুটুম্বগণের কোলাহল-সম্পূরিত হইয়া, মিষ্টান্ন ও পুষ্পগন্ধের মিশ্র গন্ধ-সম্ভারে আকুলিত হইয়া, তাহা মদালসা ও কিরণের পরিণয়োৎসব-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। বিবাহান্তে কয়েক মাস দুর্গমধ্যে কন্যা-জামাতা

লইয়া মনের আনন্দে কাটাইয়া, রাজা সুজনসিংহ প্রকাশ্য রাজসভায়, কিরণকে দুর্গাধিপত্য প্রদান করিয়া, বারাণসী যাত্রা করিলেন।

* * * *

আর একদিনের কথা আমরা বলিব। সে দিনে রাত্রে দুর্গের এক বারদোয়ারির মর্ম্মর-ভিত্তির উপর বসিয়া—কিরণসিংহ ও মদালসা বহিপ্রকৃতির, জ্যোৎস্নাপ্লুত মাধুরীময় শোভা দেখিতেছিলেন। বৃক্ষশীর্ষে রাশীকৃত শ্যামল-পত্রের উপর জ্যোৎস্না! পার্শ্বে-প্রবাহিতা নদীবক্ষে জ্যোৎস্না! নিশাবিহারী উড্ডীয়মান পাখীগুলির, উন্মুক্ত পাখার উপর জ্যোৎস্না। দুর্গের পাষাণ-শরীরের উপরও জ্যোৎস্না! আর সেই জ্যোৎস্না-স্রোত ঘুরিয়া—ফিরিয়া, মলয়ের শীতল হাওয়া মাখিয়া, মদালসার সুন্দর মুখমণ্ডল স্পর্শ করিতেও ছাড়ে নাই।

কিরণসিংহ উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে, সেই আলুলায়িত, সুকৃষ্ণ, কুঞ্চিত-কেশগুচ্ছ পরিবেষ্টিত, সেই প্রভাময় অপ্সর-কান্তিময়, সুন্দর মুখের সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন। সেই কৃষ্ণতারকাময় সুন্দর নয়নে কেমন করিয়া পবিত্র ও শুচিশুদ্ধ-প্রেমোচ্ছ্বাস উঠিয়া, অতিশুভ্র জ্যোৎস্নার সহিত মিশিতেছিল, প্রেমবিহ্বলচিত্তে তাহাই দেখিতেছিলেন।

সম্মুখে এক ক্ষুদ্র বীণা পড়িয়াছিল। মদালসা সেই বীণা লইয়া তাহাতে সুর বাঁধিলেন। সেই উজ্জ্বল পূর্ণিমার রাত্রে, সেই রজত-দীপ্তির রাজ্যে—তাহার কণ্ঠনিঃসৃত সুরতরঙ্গমধ্যে, যেন একটা নূতন সম্মোহিনী-শক্তি জাগিয়া উঠিল।

মদালসা হাস্যমুখে বলিল—“একদিন তোমায় গান শুনাইব বলিয়াছিলাম—রাজা! আজ সেই সুখের দিন।”

কিরণসিংহ বলিলেন—“মদালসা! আমার চিত্তও বিরাটবিশ্বের এ অনন্ত-সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়াছে। কেন জানি না, আজ এই

চন্দ্রালোকিত নিশিতে তোমার ও সুন্দর কান্তি, আমার প্রাণে এক নূতন সঙ্গীতঝঙ্কার তুলিতেছে।"

মদালসা—হাসিয়া বলিল—"ছি! একাবারে অতটা ভাল নয়। অমি কি এত সুন্দর! তোমার ভুল হইয়াছে রাজা। একবার মুক্ত-প্রকৃতির দিকে দেখ দেখি! কেমন অনন্ত নীলাকাশ! নদীবক্ষে তরঙ্গরাজির উপর কেমন বিস্ফুরিত, নর্ত্তনশীল, চন্দ্রালোক! শ্যামল বিটপীর শাখান্তরালে, খদ্যোতের হীরকজ্যোতির উপর, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার কেমন শুভ্র জ্যোতিঃ! এই সুন্দর পার্ব্বত্য-প্রকৃতি কেমন শুভ্র, পবিত্র চন্দ্রালোক-সমুজ্জ্বল! যেন কত শান্তিময়। ভাবিয়া দেখ রাজা! কত সুন্দর তিনি—যিনি এ সুন্দর জ্যোৎস্নার ও চিরসুন্দরী প্রকৃতি-রাণীর সৃষ্টি করিয়াছেন!"

কিরণসিংহের মন, সেই বিশ্বপাতার অনন্তসুন্দর বিরাট-সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া উঠিল। সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে, মদালসার সৌন্দর্য্য ডুবিয়া গেল! সেই বিরাট সৌন্দর্য্যের অব্যাহত কল্পনার মধ্যে, প্রকৃতির সুন্দর শোভাও ডুবিল।

মদালসা, বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া, সুরের সহিত কণ্ঠ মিলাইলেন। সেই জ্যোৎস্না-তরঙ্গের সহিত সুরলহরী অঙ্গে অঙ্গ মিশাইল। তাহার সুকণ্ঠের সুর-তরঙ্গে—সেই জ্যোৎস্না-প্লাবিতা, সুপ্তা প্রকৃতি যেন আরও উজ্জ্বলরূপে হাসিয়া উঠিল। মদালসা প্রকৃতির বাহ্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া গাহিতে লাগিল,—

চিরসুন্দর তুমি, আঁখি সদা, তোমারে হেরিতে চায়।
না জানি কি এক, আকুল পিয়াসা, মিলন আশা,
লইয়ে এ অন্তর, তোমাতে ধায়।

দেখি পলে পলে, তবু মিটে না আশ,
সদাই বিরহে—করি হা হুতাশ,
এই কাছে পাই, আবার হারাই, মিলনের আশা মেটে না হায়!
সাধ হয়, হৃদিমাঝারে রাখিয়া,
যুগ যুগ হেরি, সদা লুকাইয়া,
সে আশা মেটে না, পুরে না কামনা, ছায়াসম কোথা ভাসিয়ে যায়।
একবার যদি পাই হে তোমায়,
রাখিব লুকায়ে নিভৃতে হিয়ায়,
আর কাঁদিব না, আর ডাকিব না, বিকাইব তব—ও রাঙ্গা পায়।

বীণার কোমল সুর, ক্রমশঃ নৈশবায়ুস্তরে বিলীন হইল। সে শুকণ্ঠ বিরাম গ্রহণ করিল। বীণা থামিল, কিন্তু সুর গেল না। তখনও যেন—সেই সেই রজত-সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির বুকের উপর, মলয়ার দোলায় চড়িয়া, সুর বিশ্বরাজ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। কিরণসিংহ এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান-বিহীন হইয়া, সঙ্গীত-তরঙ্গে ভাসিতে-ছিলেন। চিত্রার্পিত নয়নে—সেই চূর্ণ-কুন্তলা, অতুল-সৌন্দর্য্যশালিনী, মদালসার মুখজ্যোতিঃ দেখিতেছিলেন,—এখন তাঁহার সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি মদালসার চিবুক ধরিয়া সাদরে বলিলেন—"প্রিয়ে! যে করুণাময় বিধাতা আজ আমায় সামান্য অবস্থা হইতে রাজ্যেশ্বর করিয়াছেন, তোমার ন্যায় দেবদুর্ল্লভ রত্ন আমায় মিলাইয়া দিয়াছেন—তাঁহাকে আমি যুগ্ম করপুটে বার বার নমস্কার করি।" এই জ্যোৎস্না-প্লাবিত, মলয়-চুম্বিত, স্থিরগম্ভীর সৌন্দর্য্যময়ী বিরাট প্রকৃতি—তাঁহার চিরসুন্দর রূপের একাংশের গাম্ভীর্য্যময় বিকাশ মাত্র। এ বিরাট

ভাব চিন্তা করিলে আত্মহারা হইতে হয়—আমরা যে অতি-ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তাহা অনুভব করিয়া তাঁহার কাছে বার বার মস্তক নত করিতে হয়। সত্য বলিয়াছ প্রিয়ে! প্রকৃতির এ অতি সুন্দর, বিরাট সৌন্দর্য্যে যে ডুবিয়াছে, সেই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপাসক।"

"আমি এ ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা—তুমি আমার হৃদয়ের রাণী। আর এই প্রজাগণ আমাদের স্নেহের—আদরের জিনিস। কাহাকেও ভ্রাতৃরূপে, কাহাকেও পুত্ররূপে, কাহাকেও পিতৃমাতৃরূপে, যথোপযুক্ত স্নেহ ও সম্মান বিতরণ করিয়া, আমরা এই রাজ্যের মধ্যে এক পুণ্য-কানন প্রতিষ্ঠা করিব।"

মদালসা—তাহার দেবচরিত্র স্বামীর মনের কথা বুঝিল। ভক্তি-ভরে, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, তাঁহার চরণবন্দনা করিল। কিরণসিংহ, তাহাকে পবিত্র আলিঙ্গন-নিপীড়িত করিয়া—নীচে নামিয়া আসিলেন।

উপসংহার।

বস্তুতঃ কিরণসিংহ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আজীবন পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন-সময়ে, সেই ক্ষুদ্ররাজ্য ক্রমশঃ আয়তনে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাঁহার শাসনকালে দেশে সুখ শান্তি—প্রজার মনে আনন্দ এবং দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় আদৌ ছিল না। তখন দিল্লীশ্বর গৌরবান্বিত আকবর সাহ,

দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজমান। তিনি মহারাজ মানসিংহের মুখে—এই যুবক সামন্তরাজের সদাশয়তার ও উচ্চ-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া - কিরণসিংহকে "মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন ও প্রচুর জাইগীর দিয়া, সরকারের অধীনে পঞ্চশতী মন্সবদারের পদ প্রদান করেন। মদালসাও সকল কার্য্যে স্বামীর সহায়তা করিয়া, প্রজাদের পুত্রবৎ পালন পূর্ব্বক কর্ম্মময় জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। কিরণসিংহের মাতাও, পুত্র পুত্রবধূ লইয়া আরও কিছুদিন এ সংসারে মনের আনন্দে দিন কাটাইয়া রাজমাতার ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন।

যশল্মীয়ারের এক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য উপত্যকার বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে, দুর্দ্দিনের সহায় সেই বন্যছাগী কল্যাণীর স্মরণার্থে কিরণসিংহ কৃতজ্ঞতাবশে—এক মন্দির ও তৎসংলগ্ন এক অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আজও যশল্মীয়ারের—নিভৃত কেন্দ্রে অবস্থিত, মঙ্গলা নদীর প্রান্তসীমাস্থ পর্ব্বতের উপর, "কল্যাণী-মন্দিরের" ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিম্বদন্তী আজও সেই নিভৃত-কাননে, এক করুণ-রসাত্মক কাহিনীর স্মৃতির ছায়া অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

ভবিতব্য।

ভবিতব্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্মরণীয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ। পশ্চিমে তখন সিপাহীর ভয়ানক হাঙ্গামা। ঘোর অরাজকতা। চারিদিকে কেবল গুলির সন্ সন্ শব্দ, আর বন্দুকের দুম্ দাম্। সেই সময়ে আমি কানপুরে কমিশেরিয়েটে চাকরি করিতাম। এই সাতান্ন সালের পর, যে সকল বাঙ্গালী পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বাঙ্গালার শস্য-শ্যামল ভূমি দেখিতে পাইয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন।

কমিশেরিয়েটের চাকুরী শুনিতে ভাল, কিন্তু এ চাকুরীর হাঙ্গাম ঢের। লোকে বলে—কমিশেরিয়েট লুটের ভাণ্ডার। কিন্তু লড়াই বাধিলে যদি কাঁচা মাথাটা লুট না হয়, তাহা হইলেই রক্ষা। লড়াই বাধিলে একদিকে যেমন লাভের পথ খোলা, তেমনি অন্যদিকে আবার দুষ্‌মনের অব্যর্থ গুলিতে প্রাণটা যাইবার পথও খুব প্রশস্ত। এ কথাটা যে দিবালোকের ন্যায় সত্য, তাহা একদিন বেশ টের পাইলাম।

কমিশেরিয়েটের বড় বাবু আমি, সুতরাং অনেক পদস্থ মিলিটারি সাহেবের সঙ্গে আমার খুব বনিয়া গিয়াছিল। অধিক কি, আমার মনিব, আমাকে অনেক সময় বন্ধুর ন্যায় ভাবিতেন। অত বড় পদস্থ

সৈনিক-পুরুষ, তথাপি তিলমাত্র দাম্ভিক ভাব দেখাইতেন না। আমি তাঁহার বাড়ী যাইতাম, তাঁহার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করিতাম, তাঁহার গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত করিয়া দিতাম, মেম-সাহেবের অনেক ফায়ফরমাস্ শুনিতাম। এজন্য তাঁহার অনুকম্পায়, শীঘ্র শীঘ্র আমার যথেষ্ট পদোন্নতিও হইয়াছিল।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন লক্ষ্ণৌ-প্রদেশে, সিপাহী-বিদ্রোহের তীব্র স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়াছে। মফঃস্বলের কথা দূরে থাক্, নিজ সহরের মধ্যে হুলস্থুল কাণ্ড! অতবড় সহরটার দোকানপাট প্রায় সবই বন্ধ, রাস্তাঘাট পান্থ চলাচল-শূন্য। গৃহ পরিজন-শূন্য, শকট আরোহিশূন্য ও নগর শান্তিশূন্য হইয়াছে। ইংরাজের আর সহরের রাস্তায় বাহির হইবার উপায় নাই। একক ইংরাজ দেখিলেই, সিপাহীর অলক্ষ্য গুলি আসিয়া তাহার মাথা উড়াইয়া দেয়।

আমি জেনারেল নিকল্‌সনের অধীনে বড় বাবু ছিলাম। এই ভয়ানক সময়ে, একদিন মেম-সাহেবের ঘরে বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি। কথাবার্ত্তাটা বিদ্রোহী সিপাহীদের সম্বন্ধেই হইতেছিল। এমন সময়ে জেনারেল সাহেব আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। আমায় দেখিয়া বলিলেন—"বাবু তুমি আসিয়াছ—ভালই হইয়াছে। তোমাকে বড়ই দরকার। তুমি না আসিলে হয়ত এখনই তোমার কাছে আরদালী পাঠাইতাম। এই দেখ, কমিশনার সাহেবের—হুকুম।"

আমি কমিশনার স্যর্ হেন্‌রি লরেন্সের হুকুম পড়িলাম। আমার মনিব পাঁচশত গোরা-সৈন্য লইয়া, সীতাপুর যাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। সীতাপুরে গিয়া বিদ্রোহী সিপাহীদের গতিরোধ করিতে হইবে। আবার সেখানকার কাজ সারিয়া হোসেনগঞ্জের প্রান্তভাগে

দরিয়াপুরে ছাউনি গাড়িয়া, মফঃস্বলের বিদ্রোহীদের বাধা দিতে হইবে। হুকুম বড়ই জরুরি।

সাহেব বলিলেন—"বাবু! দেখিলে ত, পরশ্ব ভোরে আমাদের কুচ্ করিতে হইবে। তোমাকে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব কালই আমার স্ত্রী পুত্রদের, লক্ষ্ণৌ-রেসিডেন্সিতে কমিশনার সাহেবের বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও।"

আমি সাহেবের আদেশমত সব কাজ শেষ করিলাম, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে যাইতে এবার বড় ভয় হইতে লাগিল। কোথায় বিঘোরে প্রাণ যাইবে, কোথায় সিপাহীর গুলি খাইয়া মাঠের মধ্যে পড়িয়া থাকিব—এই ভাবনাই প্রবল হইল। কোথায় কলিকাতা! কোথায় কানপুর! কোথায় আমি—কোথায় বা আমার স্ত্রী পুত্র? এই প্রকার নানা দুশ্চিন্তায় রাত্রিটা কাটাইলাম। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই সাহেবের ছাউনীতে গিয়া মেম্-সাহেবের রেসিডেন্সী গমনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম।

সাহেব, হৃষ্টমনে প্রাতরাশ খাইতেছেন। তিনি ত মাথাটা আগে বিক্রী করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, ভারতবর্ষে সেনা-বিভাগে চাকরি করিতে আসিয়াছেন। তিনি আজন্ম সৈনিকপুরুষ—সমরেই তাঁহার আনন্দ। সুতরাং তিনি এ ঘটনায় স্বভাবতঃই প্রফুল্ল।

সাহেব আমার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বলিলেন—"বাবু! ভয় কি? চিন্তা কি? তুমি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকিবে।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, "তোমার সঙ্গে থাকিলে মৃত্যুর সহিত আমার বড় দূরসম্পর্ক হইবে না। তোমার টুপীওয়ালা-চিহ্নিত মাথাটী, সিপাহীর গুলির নিশ্চিত শীকার বই ত নয়?"

সেই দিন দু'চার ঘণ্টা পরে, আমরা কানপুর ছাড়িয়া লক্ষ্ণৌএর দিকে চলিলাম। আমার জিম্মায় রসদ। আবশ্যকীয় কাজ সারিতে আট দশ দিন লাগিল। তারপর আমরা দরিয়াপুরের দিকে ফিরিলাম। ঘটনাবশে এখানকার কাজ আগে সারিতে হইল। দরিয়াপুরের ভিরধুনার মাঠে আমাদের ছাউনী হইল। আমাদের দলে গোরাই বেশী। তদ্ভিন্ন শিখ ও একদল গুরখা সিপাহীও ছিল। ইহারা তখনও ইংরাজের নিমক মানিয়া চলিতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমাদের সিপাহীরা একদিন প্রাতে বেলা দশটার সময়, পাকাদি করিতেছে—এমন সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক ও বালিকা সন্নিকটস্থ এক মাঠের দিক হইতে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। যুদ্ধক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের দল দেখিয়া, সিপাহীরা রন্ধন ছাড়িয়া ব্যাপারটা কি দেখিতে ছুটিল। তাহাদের চুলায় চাপান অর্দ্ধসিদ্ধ ডাল, থালির উপর আধপেষা আটা—আর ভিজা কাঠে ফুৎকারের চেষ্টা, একটা নূতন কৌতুহলের মধ্যে ঢাকা পড়িল।

আগন্তুকদের মধ্যে একটী বৃদ্ধা—তিনটী প্রৌঢ়া ও একটী বালিকা। সিপাহীরা তাহাদের কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা কোন কথারই উত্তর দেয় না, কেবল চুপ করিয়া থাকে। তাহাদের বেশ ভূষা অতি মলিন, জাতিতে বেদিয়া বলিয়াই বোধ হইল। প্রশ্ন করিলে কোন উত্তর দেয় না দেখিয়া, সিপাহীরা তাহাদিগকে দুষমনের গোয়েন্দা বলিয়া আটক করিল।

একজন সিপাহীর ধাক্কা খাইয়া, বুড়ীটা সর্ব্বাগ্রে ডাক ছাড়িয়া

কাঁদিয়া উঠিল। ওঃ! তাহার কি ভীষণ কর্কশ চীৎকার!! আজও তাহা আমার মনে আছে। বৃদ্ধার চীৎকারে, সকলেই সমস্বরে চেঁচাইতে লাগিল। সিপাহীরা যত ধমক দেয়, বুড়ীও সুরের মাত্রা তত বেশী করিয়া চড়াইয়া দেয়। দেখিতে দেখিতে, ক্রমে একটা মস্ত হট্টগোল হইয়া পড়িল।

এ প্রকার অবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিয়া আমি তাঁবু হইতে বাহির হইয়া সেইস্থানে গেলাম। সিপাহীদের বলিলাম, "ইহাদের ছাড়িয়া দাও, কেন বৃথা গোল বাড়াইতেছ?"

সিপাহীদের মধ্যে যে সর্দ্দার, সে বলিল—"বাবুসাহেব! ও হুকুম করিবেন না, এ বেটীরা শত্রুর চর! ছাড়িয়া দিলে কাহারও আর মাথা থাকিবে না।"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা! এক কাজ কর—তোমরা ইহাদের বড় সাহেবের কাছে লইয়া চল। আমিও সঙ্গে যাইতেছি, বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, সাহেবই করিবেন। তোমরা আর ইহাদের বৃথা তাড়না করিও না। এস আমার সঙ্গে এস।"

সিপাহীরা আমার কথা অমান্য করিল না। আমার হাতে তাহাদের ডাল-রুটির বন্দোবস্ত, না শুনিয়াই বা করে কি? আমি আগে আগে চলিলাম, স্ত্রীলোকেরা আমার পশ্চাতে চলিল। সর্ব্বপশ্চাতে জনকয়েক সিপাহী। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহাদের সঙ্গে একটী দশম-বর্ষীয়া বালিকা ছিল। বালিকাটী মলিন বস্ত্রাচ্ছাদিত হইলেও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় দেখাইতেছিল। তাহার সেই মলিনতার মধ্যেও যেন রূপের তীক্ষ্ণ-জ্যোতিঃ ক্ষীণচ্ছটায় বাহির হইতেছিল। তাহার মুখে একটা উজ্জ্বল প্রশান্তভাব। চক্ষুদ্বয় পূর্ণোৎফুল্ল, কেশভার কুঞ্চিত, আলুলায়িত ও আগুল্‌ফলম্বিত। মুখখানি কুজ্ঝটিকাসমাবৃত

কমলিনীর ন্যায়। সে নিস্তব্ধভাবে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতে করিতে, পিছু পিছু আসিতেছিল!

আমি তাহাকে এতক্ষণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, এক্ষণে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার বাড়ী কোথায় বেটী? তুমি এখানে কেন আসিয়াছিলে?"

সে প্রথমে কোন উত্তর করিল না। আমি আরও মিষ্টস্বরে পুনরায় প্রশ্ন করিলে, বালিকা তখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় উত্তর দিল—"আমাদের ঘর দোর নাই, আমরা ভিক্ষা করিয়া খাই। সিপাহীদের কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিলাম—তাহারা আমাদের ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।"

এই কাঠখোট্টার দেশে, শ্রুতিকঠোর হিন্দুস্থানী ভাষাময় মুলুকের মধ্যে, এক অজানিত বালিকার মুখে বাঙ্গালা শুনিয়া, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম—এদেশ হইতে বেদিয়ারা বাঙ্গালা দেশে গিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ধরিয়া আনে। এ বালিকা কি তাই হইবে? আমার মনে বড় একটা কৌতূহল হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওরা তোমার কে?"

বালিকা বলিল—"উহারা আমার আত্মীয়।"

"তুমি উহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন?"

"না ঘুরিয়াই বা করিব কি? আমার ত আলাদা ঘরবাড়ী নাই, থাকিব কোথায়? আর, লোকে আমায় দেখিলে যেন দয়া করিয়া কিছু বেশী ভিক্ষা দেয়। ভিক্ষা ছাড়া আমি হাত গুণিতেও পারি, তাহ দু'চার পয়সা বেশী আয়ও হয়। অদৃষ্টের কথা বলিতে পারি বলিয়া, উহারা আমাকে সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখে, ও লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়।"

আমি বলিলাম—"তুমি আমার হাত গণিয়া দিতে পার? আচ্ছা! হাতগণা এখন থাক্, বল দেখি বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে আমাদের কবে লড়াই বাধিবে?"

একটা দশ বৎসরের বালিকা অদৃষ্ট-গণনা করিবে শুনিয়া, আমার বড় হাসি পাইতেছিল। বালিকা, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"১৪ই তারিখে বিদ্রোহীরা তোমাদের আক্রমণ করিবে, তোমাদের অনেক লোক মরিবে। তুমি বাঁচিবে এবং এই যুদ্ধে তোমার খুব সম্মান বাড়িবে।"

এপ্রকার গণনায়, আমি যেন একটা আমোদ পাইলাম। কিন্তু সাহেবকে এ মজাটা দেখাইবার বড়ই ইচ্ছা হইল।

আমি বলিলাম—"আচ্ছা বেশ! জাঁদরেল সাহেবের কাছে চল, সেখানে আমি তোমাকে ঘি, আটা ও চিনি দিব—নগদ পয়সাও দিব।"

—*—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বালিকা অগত্যা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাহার প্রকৃত পরিচয় লইবার এত চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই তাহা জানা গেল না।

বড় সাহেবের কাছে পৌঁছিলাম। তিনি তখন তাঁবুর মধ্যে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি লিখিতেছিলেন।

আমাদের সঙ্গে একদল লোক দেখিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"বাবু! ব্যাপার কি?"

আমি সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম—যুদ্ধ-সম্বন্ধে বালিকার গণনার কথাও বলিলাম।

সাহেব আমার কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—“বালিকাকে ভিতরে লইয়া আইস।”

বালিকা তাঁবুর ভিতরে গেলে, সাহেব তাহাকে হিন্দীতে বলিলেন—“পরশু যুদ্ধ হইবে—এ কথা তুমি কেমন করিয়া জানিলে? সত্য কথা বল, তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে প্রচুর এনাম দিব।”

বালিকা বলিল—“আমি গণনা দ্বারা জানিয়াছি।”

সাহেব বলিলেন—“That's all humbug!”

আমার সাহেবের পাশে তাঁহার সহকারী, কাপ্তেন হরণ বসিয়াছিলেন, তিনি হাসিতে হাসিতে বালিকার কাছে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন,—“আমার অদৃষ্টে কি আছে বল দেখি? ঠিক বলিতে পারিলে, টাকা পুরস্কার দিব।”

হরণ্ সাহেব ঠাট্টা করিতেছিলেন, কিন্তু বালিকা তাঁহার হাত দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল,—“পরশুকার যুদ্ধে তুমি নিশ্চয়ই মরিবে!”

সাহসী সৈনিকের কাছে মৃত্যু ও প্রণয়সঙ্গীত একই জিনিস। প্রণয়-গীতির ন্যায়, মৃত্যুর কথাও তাহাদের পক্ষে অতৃপ্তির বিষয় নয়। হরণ্ সাহেব এ কথা শুনিয়া একচোট হাসিয়া লইলেন, তৎপরে বালিকার সম্মুখে হাত রাখিয়া বলিলেন,—“বল দেখি, আমি মরিব কিসে?”

“বুকের ভিতর বন্দুকের গুলি গিয়া তোমায় সাংঘাতিক ভাবে আহত করিবে—আহত হইবার দেড় ঘণ্টা পরে তোমায় মৃত্যু!! ঐ সময়ে যদি কেহ তোমার সেবা করে ত তুমি বাঁচিতে পার। কিন্তু তোমার সেবা হইবে না, ১৪ই তারিখে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়!”

হরণ্ সাহেব মনে মনে কি ভাবিলেন—পরে পকেট হইতে

হরণ্ সাহেব বালিকার সম্মুখে হাত রাখিয়া বলিলেন,—

"বল দেখি, আমি মরিব কিসে?"—২৫৬ পৃঃ।

The Emerald Ptg. Works.

একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বালিকাকে দিতে গেলেন। কিন্তু সে তাহা লইল না।

বড় সাহেব বলিলেন,—"তুমি আমার হাত দেখ দেখি।"

বালিকা হাতখানি ধীরে ধীরে ধরিল, পরে মৃদুবেগে তাহা ছুড়িয়া দিল।

সাহেব বলিলেন—"কি দেখিলে?"

"আমি বলিব না।"

"না বলিবে ত দেখিলে কেন? কোন ভয় নাই, যাহা দেখিয়াছ, তাহাই বল।"

"সে কথা শুনিলে আপনি রাগ করিবেন!"

"না আমি রাগ করিব না। আমোদের জন্য হাত গণাইতেছি, রাগ করিব কেন? তুমি যা দেখিলে, ঠিক্ তাই বল—মিথ্যা বলিলে বরঞ্চ রাগ করিব।"

"বলিব! ঠিকই বলিব—আপনারও ১৪ই তারিখে মৃত্যু হইবে।"

"কোন্ ১৪ই?"

"তা বলিতে পারি না—গণনায় তাহা দেখিতে পাইতেছি না।"

"আচ্ছা কিসে আমার মৃত্যু হইবে?"

"আঘাত—অপঘাত ও রক্তোচ্ছ্বাসের মধ্যে!!"

জেনারেল একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা দেখা যাইবে। বাবু! ইহারা যা চায়, তাই দিয়া বিদায় করিয়া দাও, ইহারা শত্রুর গুপ্তচর নয়।"

এই হুকুমে আমার সঙ্গের সিপাহীরা কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইল। তাহাদের ইচ্ছা এই কয়েকটা স্ত্রীলোককে একেবারে হাতকড়ি দিয়া চালান দেয়।

হুকুম দিয়া সাহেব আবার লিখিতে বসিলেন। আমি বালিকাকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া, পুনরায় সাহেবের ঘরে গেলাম। দেখিলাম হরণ্ সাহেব যেন কিছু বিমর্ষ ও গম্ভীর।

বড় সাহেব বলিলেন,—"হরণ্! তুমি একটা বালিকার গণনায় ভয় পেলে নাকি? চুপ ক'রে বসে কেন?"

হরণ্ কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ ভয় পাইয়াছিই বটে!! একটা বালিকার কথায় ভয় পাইব ত তরবারি ধরিয়াছি কেন? তবে এই ভাব্ছি, পরশু যুদ্ধ হইবে, এ মেয়েটা কি করিয়া সে কথা জানিল? বোধ হয় ইহারা গুপ্তচর! God bless my soul!! উহাদের ছাড়িয়া দেওয়া ভাল কাজ হয় নাই।" এমন সময়ে সাহেবের খানা আসিল, আমি নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৩ই কাটিল। ১৪ইএর প্রভাত হইল। আমার মনে কেবল সেই বালিকার কথা জাগিতেছে। ভাবিলাম, আজ ত ১৪ই, দেখি না কি হয়!

সাহেবেরা মধ্যাহ্ন হইতেই সতর্ক। সকল সেনাই প্রভাত হইতে সশস্ত্র। শত্রুর গতিবিধি জানিবার জন্য কয়েকজন চরও পাঠান হইয়াছে। সে দিন অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—সৈনিকের গভীর পদবিক্ষেপ, যুদ্ধানন্দজাত অশ্বের হ্রেষারব ও ইংরাজ-গোরার "হিপ্-হিপ্-হুর্রে" চারিদিক সমাকুলিত করিতেছিল!

বেলা একটার সময় একজন চর ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল,

হজরতগঞ্জের মাঠে দলে দলে বিদ্রোহী সিপাহী আসিয়া জমিতেছে। সমস্ত দিন ধরিয়া এইরূপে জমিতে পাইলে, তাহারা আমাদের ধূলিগুঁড়ি করিয়া দিবে।"

সাহেব এই সংবাদ পাইয়া তখনই কূচ্ করিবার হুকুম দিলেন। আমাদের সৈন্যেরা একেবারে বিদ্রোহীদের উপর গিয়া পড়িল। সমস্ত দিনই গুড়ুম—গড়াম্ চলিল। সন্ধ্যার সময় আমাদের সৈন্যেরা বিদ্রোহীদের তাড়াইয়া দিয়া জয়োল্লাসের সহিত ছাউনীতে ফিরিল।

সাহেব ঘোড়া হইতে নামিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ, এই সমর-জয়োল্লাসেও বিষণ্ণ। অঙ্গে সমর-ক্লান্তিজনিত স্বেদচিহ্ন। দুই এক স্থানে সামান্য রক্তের দাগ। আমার মনে বালিকার ভবিষ্যৎ কথা জাগিতেছিল। আমি সাহেবকে অক্ষত-শরীরে ফিরিতে দেখিয়া, বড়ই পুলকিত হইলাম।

আমি বলিলাম—"কাপ্তেন হরণ্ কোথায়? তিনি ত ছাউনীতে ফিরিলেন না?"

সাহেব চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"তাইত ভাবিতেছি! তাহার ত কোন সন্ধান পাইতেছি না। হায়! তাহার সম্বন্ধে সেই বালিকার ভবিষ্যৎবাণী বুঝি বা সত্য হইয়া পড়িল!"

আমি, বড় সাহেব ও চারিজন গোরা তখনই মশাল লইয়া, হরণ্ সাহেবকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। তখন সন্ধ্যার কালছায়ায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন, প্রান্তরবক্ষে পতিত, রাশীকৃত রক্তাপ্লুত—মৃত, অর্দ্ধ-মৃত, নরদেহ! আমরা দুই পায়ে সেই সব রক্তাপ্লুত মৃতদেহ দলিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

বড় সাহেব ইংরাজের শব দেখিলেই, তাহা আলো ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপে খুঁজিলাম, কিন্তু কাজের কিছুই হইল না।

নিরাশ হইয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় একটী মৃত অশ্বের পার্শ্বে একজন ইংরাজ, ক্ষীণকণ্ঠে চীৎকার করিল—"জল দাও!"

শব্দ বড় সাহেবের কাণে গেল। মশালধারীরা নিকটে আসিল। আহত ব্যক্তির শোণিতাক্ত মুখের উপর আলো পড়িলে, সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওঃ হরণ্! হরণ্! তোমার এই শোচনীয় দশা!! হা পরমেশ্বর!" সাহেব স্বহস্তে অনেক মৃত দেহ সরাইয়া হরণের আহত দেহ উন্মুক্তস্থানে আনিলেন।

এই সময়ে একটী আহত সিপাহী শায়িতাবস্থাতেই বন্দুকের ঘোড়া টিপিয়া, বড় সাহেবের উপর লক্ষ্য করিতেছিল। আমার হাতে তরবারি ছিল—আমি তরবারির বাঁটের বাড়ি সেই পিশাচের মস্তকে দারুণ আঘাত করিলাম! সে সেই আঘাতে বিকট চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল এবং তাহার নিক্ষিপ্ত গুলিতে সাহেবের পার্শ্বের একজন গোরা আহত হইল।

সাহেব সব দেখিলেন। সহাস্যে—সকৃতজ্ঞতায় বলিলেন, "বাবু! তুমি আজ আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ—এ কথা আমার চিরদিন মনে থাকিবে।"

হরণ সাহেবকে আমরা ধরাধরি করিয়া একটা তাঁবুতে আনিলাম। তাঁহার আহতস্থান ধৌত করিয়া, জল ও ব্রাণ্ডি খাইতে দিলাম। কিছু বল পাইয়া কাপ্তেন হরণ বলিতে লাগিলেন—"ভাই! যুদ্ধে প্রথমেই আমি আহত হইয়াছি। এই দেখ আমার বুকের ভিতর দিয়া গুলি গিয়াছে, আর আমার জীবনের আশা নাই, জল দাও বড় তৃষ্ণা!"

আমি জল দিলাম। হরণ বলিতে লাগিলেন—"জেনারেল!

প্রিয়তম ডিক্, তোমার নিকট শেষ বিদায়! কিন্তু আমার দুটী অনুরোধ। আমার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকাগুলি, বিলাতে আমার বৃদ্ধ মাতাকে পাঠাইয়া দিও। আর সেই বালিকা—সেই হতভাগিনী বালিকা! ওঃ! তাহাকে যদি দেখিতে পাও, তাহা হইলে দুই শত মুদ্রা পুরস্কার দিও। তার ভবিষ্যৎ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভাই! তুমিও সাবধানে থাকিও। আর একটু জল! প্রাণ যায়—বড় যাতনা!"

আমি কাপ্তেনকে জল ও ব্রাণ্ডি দিলাম। হরণ্ আবার বলিতে লাগিলেন—"ডিয়ার ডিক্! আমি তোমার একটী উপকার করিব। তোমার সেই শেষ দিন—সেই সাংঘাতিক ১৪ই মে, যে দিন আসিবে, সেই দিন আমার প্রেতাত্মা তোমায় সাবধান করিয়া দিবে। বালিকার কথা সব সত্য—অগ্রাহ্য করিও না।"

কাপ্তেন হরণ্, বড় সাহেবের কোলে ঢলিয়া পড়িলেন—মৃত্যু তাঁহার সকল যাতনা শেষ করিল। আমি ভাবিলাম, সেই বালিকা যাদুকরী না হইয়া যায় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর আট বৎসর কাটিয়া গেল। সিপাহীর হাঙ্গামা শেষ হইল। সাহেব খুব প্রশংসা লাভ করিলেন। তাঁহার পদোন্নতি হইল। বালিকা আমার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিল, তাহাও ফলিল। অর্থাৎ আমারও বেতন বৃদ্ধি হইল। কিন্তু বালিকা বড়-সাহেবের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিল, এই আট বৎসরে তাহা ফলিল না।

পরমেশ্বর করুন, তাহা যেন মিথ্যা হয়। কত ১৪ই মে কাটিল—এই তারিখ হইলেই সাহেব বিষণ্ণ হন। আমি ভাবিতাম, বালিকার কথা মিথ্যা হউক, আমার প্রভুর পরমায়ু বৃদ্ধি হউক!

সাহেব এক বৎসরের ছুটী লইয়াছেন—তিনিও বিলাতে যাইবেন। আমিও দেশে ফিরিব, সবই ঠিক্‌ঠাক্। আমরা তখন মিরাটে।

একদিন আমরা বৈকালে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি—এমন সময়ে সাহেব বলিলেন—"বাবু! আজ কোন্ তারিখ? ১৩ই মে না?"

আমি বলিলাম—"হাঁ জনাব! আজ ১৩ই মে।"

"ওঃ! কাল তবে ১৪ই।" এই কথা বলিয়া সাহেব একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। আমায় ধীরস্বরে বলিলেন, "বাবু! আট বৎসর পূর্ব্বে হজরতগঞ্জের লড়াইয়ের মাঠে, বালিকা যা বলিয়াছিল, মনে পড়ে কি? কাপ্তেন হরণের শোচনীয় মৃত্যুর কথা মনে পড়ে কি?"

আমি বলিলাম—"ও সব কথা ভাবিয়া কেন আপনি বৃথা কষ্ট পাইতেছেন? প্রতি বৎসরের ১৪ই মে তারিখেই ত আপনি এইরূপ বিষণ্ণ হন। কিন্তু কৈ কিছুই ত হয় না। পরমেশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। সে বালিকা মিথ্যাবাদিনী। হঠাৎ কাপ্তেনের সম্বন্ধে একটা কথা লাগিয়া গিয়াছে বলিয়া কি, সবই সত্য হইবে?"

সাহেব বলিলেন—"বাবু! তুমি বিশ্বাস কর বা নাই কর, আমি ত সে কথা ভুলিতে পারিতেছি না।" তখনিই এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া তিনি অন্য একটা কাজে উপরে গেলেন। আমি বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম।

১৪ই মে'র রজনী প্রভাত হইল। সমস্ত দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল। আকাশে চন্দ্র উঠিল। চন্দ্রের বিমল আলোকে

চারিদিক সুধা-ধবলিত হইল। আমরা সকলে বারাণ্ডায় বসিয়া বায়ু-সেবন করিতেছি। মেম-সাহেব স্বামীকে বলিলেন—"প্রিয়তম! পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। ১৪ই মে ত কাটিয়া গেল। যখন সন্ধ্যা হইয়াছে, তখন আর কিসের ভয়? সুখময় গৃহকেন্দ্র ত আর যুদ্ধক্ষেত্র নয়।"

আমি ঘাড় নাড়িয়া মেম-সাহেবের কথার সমর্থন করিলাম, কিন্তু আমি অদৃষ্টবাদী হিন্দু। মনে মনে বলিলাম, তোমার স্বামীর ভবিতব্য—যদি রক্তাপ্লুত শরীরে মৃত্যু লিখিয়া থাকে ত কেহই রাখিতে পারিবে না।

সাহেব বলিলেন—"প্রিয়তমে হেলেন!—এখনও আশ্বস্ত হইও না। যদি রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিরাপদে কাটে, তবে বুঝিব, এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। কত ১৪ই মে কাটিয়াছে, কিন্তু আজকের মত আমার মন কখনও এত কাতর হয় নাই।"

সাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতেই, ফটকের কাছে তাঁহার বিলাতী কুকুরটা ভয়ানক ডাকিয়া উঠিল। তাহার ডাক আর থামে না, সকলের চক্ষু সেই দিকে ফিরিল! কুকুরটা যেন কাহাকে তাড়াইয়া কামড়াইতে যাইতেছে, অথচ পারিতেছে না। কিন্তু লোক-জন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। সাহেবের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারের নিকট গেলেন। কুকুরটা তাঁহাদের দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিল।

তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেও কুকুরটা আবার ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ করিল। সাহেব আবার ফটকের নিকট গেলেন, কিন্তু তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার চেহারা দেখিয়া আমারও ভয় পাইল। একমুহূর্ত্তে তিনি যেন শবের ন্যায় মলিন হইয়া পড়িয়াছেন।

ঘটনাটা দেখিয়া, আমার মনে হরণ্ সাহেবের মৃত্যুকালীন কথাগুলি উদয় হইল।

সাহেব বিষণ্ণমুখে আমাদের বলিলেন,—"তোমরা যে যার ঘরে যাও, আমি একটু বিশ্রাম করি।"

তিনি নিজের শয্যায় গিয়া নিস্তব্ধভাবে শয়ন করিলেন, রাত্রি তখন সাড়ে এগারটা; আর আধঘণ্টা পরেই ১৪ই মে কাবার! সুতরাং আমরা রাত্রে কেহই সে বাঙ্গালা ত্যাগ করিলাম না। আধ ঘণ্টা নিরাপদে কাটিলেই বালিকার কথা মিথ্যা হইবে ভাবিয়া, আমি মনে মনে পুলকিত হইলাম। কিন্তু হায়! ভবিতব্যকে কে কোথায় ঠকাইতে পারিয়াছে!!

আমরা পার্শ্বের ঘরে বসিয়া আছি। আমরা—অর্থাৎ সাহেবের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র এবং আমি। এমন সময় জেনারেল সাহেব, আবার, বাহিরের ছাদের বারান্দায় আসিলেন। মেম-সাহেব তখন তাঁহার সঙ্গে আছেন। ঘরে বড় গরম, সাহেব বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসিয়া হাওয়া খাইতে লাগিলেন।

দুই প্রহর হইতে দশ মিনিট বাকী আছে, এমন সময় সহসা আস্তাবলের দিক হইতে একটা ভয়ানক গোলমাল উঠিল। আমরা সকলেই সবিস্ময়ে এক হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের কাতর ক্রন্দনের উচ্চ শব্দ শুনিলাম!

ক্রন্দনের শব্দ ক্রমে কাছে আসিতে লাগিল। সহসা এক স্ত্রীলোক রক্তাপ্লুত কলেবরে, কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া, সাহেবের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "খোদাবন্দ রক্ষা করুন, আমার স্বামি ছোরা লইয়া আমায় খুন করিতে আসিতেছে—ঐ দেখুন—ঐ?"

এ রমণীর নাম ফিরোজা। ফিরোজা সাহেবের বাবুর্চির স্ত্রী।